# নিমফুলের মধু

অমরে.   চক্রবর্তী

স্বর্নাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

# NIMPHULER MADHU

*A collection of short stories by Amarendra Chakravorty*


প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৮৬

দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৬

প্রচ্ছদ: যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

ISBN 81-86891-00-5

প্রকাশক: সর্বাণী চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

মুদ্রক: জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজ বন্ধু
শ্রী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রী প্রফুল্ল রায়কে

আমার মতো একে-অক্ষম-তায়-কুঁড়েকেও

যাঁরা গল্প লিখিয়ে ছেড়েছেন

# অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর অন্যান্য বই

## কবিতা

বিক্ষত অন্বেষণ

বিক্ষত অন্বেষণ, নিরন্তর

অন্ধকার শব্দকোষ

লেখা না-লেখা

কবিতাসংগ্রহ

নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে

## কবিতা আলোচনা

কবিতা-পরিচয় (সম্পাদিত)

## ছোটদের বই

হীরু ডাকাত

শাদা ঘোড়া

আমাজনের জঙ্গলে

গৌর যাযাবর

পাখির খাতা

হরিণের সঙ্গে খেলা

ভূতের বাঁশি

ছেঁড়াকাঁথার গল্প

তালগাছের ডোঙা

আমার বনবাস

টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী

**ভ্রমণ**

বন্ধুভরা বসুন্ধরা

# প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

৮ বছরে কোনোক্রমে ১৮টি গল্প লিখি, তা থেকে ১৬টি নিয়ে এই বই । গল্পগুলি প্রথম ছাপা হয় যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা, আজকাল ও অমৃতে ।

বই প্রকাশে প্ররোচনা দিয়েছেন পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী শঙ্খ ঘোষ ও শ্রী মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । এ-বই প্রকাশ করা দোষের হলে ওঁরাও তার অংশীদার । রচনার দোষ অবশ্য আমার । - অ. চ.

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বই প্রকাশের পরে লেখা 'মন্থরোর মা অথবা রাজধানীর গল্প' ও 'ভাঙন' এই সংস্করণে যুক্ত হল । প্রথমটি শারদীয় 'আজকাল'-এ ও দ্বিতীয়টি শারদীয় 'যুগান্তর'-এ প্রথম প্রকাশিত হয় ।

২-১-২০০৬



কলকাতা

# সূচি

# নিমফুলের মধু

নিমফুলে এ-বছর কম .মৌমাছি বসছে। লিচুগাছেও গতবারের চেয়ে কম। নকুল একটু এগিয়ে, ঝুঁকে তৃতীয় খুপরিটা দেখে নিয়ে পিঠ টান করল, দাও দিকি একটা বিড়ি।

শিবু অন্য সময়ে হলে বলে দিত, নেই রে, কিন্তু এখন তার নিজের দায়। ট্যাঁক থেকে আস্ত একটা বিড়ি নিয়ে নকুলের হাতে তুলে দিতে তার মনটা একটু খচ-খচ করে। যাক গে, অন্যভাবে সে এর পাঁচগুণ পুষিয়ে নেবে।

সে নিজেও একটা বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে, বড় দু-শিশি নেব, একটু সস্তা করে দিস।

নকুল হা-হা করে ওঠে, করো কী, করো কী! বাইরে চলো। ধোঁয়ার গন্ধে এক্ষুনি সব খেপে উঠবে!

রাস্তায় পা দিয়ে সে নিজের বিড়ি ধরায়, নিমের মধু দিতে পারব না। দেখলে না খুপরি খাঁ-খাঁ করছে!

—ওকথা বললে চলে! তোর ঘরে নেই?

নকুল চেপে যায়। ঘরে এক শিশি আছে। দত্তবাবু শনিবারদিন তিন টাকা দিয়ে বায়না করে গেছেন। নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করে বলল, গরিবের ঘরে মধু কি আর পড়ে থাকে!

—এক শিশি নাহয় দে। বৌদির বোনেরা এসেছে কলকাতা থেকে। বৌদি খুব গল্প করেছে তোর নিমের মধুর। আরেকটা মেয়েছেলে এসেছে মাইরি ওদের সঙ্গে, ওদের বন্ধু, তোর চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

নকুলের এখন এতো কথা শোনবার সময় নেই। একবার বাজারে যেতে হবে। তার আগে পদু সাহার বাড়ি গিয়ে টাকার তাগাদা দিতে হবে। হাত একদম ফাঁকা। সন্ধে হয়ে আসছে। চাল আর কেরাসিন না নিয়ে বাড়ি ফেরার উপায় নেই। বেড়ার গা থেকে সাইকেলটা টেনে নিয়ে বলল, নেবে তো টাকা বের করো। বাজারটা একবার ঘুরে এসে মধু বাড়িতে দিয়ে আসব।

—এক শিশি অন্তত নিমের দিবি তো? আরেকটা নাহয়—

—কলকাতার মেয়ে, আমের মধু নিমের মধু— অতো কি বুঝবে গো?

—বৌদি অতো করে বলে দিল!

নকুল গলা খাঁকরে শ্লেষ্মা ঝাড়ল, থাকলে দিতুম না? ফাল্গুন থেকেই আমের বউলে কীরম মৌমাছি লেগেছে দেখোনি?

সে বোঁ করে চলে যায়। ঝরঝরে সাইকেল। তার বিয়ের যৌতুক। সারা রাস্তা ঝনখট ঝনখট আওয়াজ করে।

সাইকেলের শব্দে আগে থেকেই পদু সাহার বউ বেরিয়ে আসে, কে, নকুল?

হ্যাঁরে, বাবুকে দেখলি রাস্তায়?

—বাবু তো ঘরে বসে সিগ্রেট খাচ্ছেন।

—দূর! দুপুরের ট্রেনে কলকাতা গেলেন। বলে গেলেন সন্ধের আগেই ফিরবেন। দোকানে হিসেব-টিসেব নিয়ে কী একটা দরকারি কাজ পড়েছে—

নকুলের বাঁ পায়ে একটা মশা, ঝুঁকে চটাস করে চাঁটি মেরে বলল, তবে তো আপনাদের ঘরে আগুন লেগেছে গো! জানলার ফাঁক দিয়ে যা ধোঁয়া বেরোচ্ছে!

—ওমা, তাই নাকি!

বউটা চলে যাচ্ছে, নকুল গলা তুলে বলল, আমার সাত টাকা নিয়ে আসবেন।

—আমার কাছে কি টাকা থাকে? দেখি যদি এক-আধ টাকা পাওয়া যায়।

কেরাসিন হল না, চাল আর তিরিশ পয়সায় অল্প একটু লটে মাছ নিয়ে নকুল বাড়ি ফিরছে, ঘোষেদের জানালায় তার চোখ আটকে গেল। ভেতরে টিভিতে নাচ হচ্ছে। নাচ শেষ হতে না হতেই ফাইটিং। জানলার বাইরে অনেকেই ভিড় করে দেখছে। নকুল একটা নারকেল গাছে বাঁ হাত রেখে সাইকেলে বসে বসেই পুরো সিনেমাটা দেখল।

বাড়ি পৌঁছে নকুলের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ছেলেমেয়েগুলো নিজেদের মধ্যে মারামারি লাগিয়েছে। পান্নার নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, চুনীর ইজের ছিঁড়ে ফালি-ফালি, তার হাতের মুঠোয় হীরের লম্বা একগোছা চুল উঠে এসেছে।

চাল আর মাছের ঠোঙা মাটিতে নামিয়ে রেখে নকুল ছেলেমেয়েদের এলোপাথাড়ি চড় ঘুষি লাথি কষাল। হীরে চুনী পান্না মার খেয়ে কে কোথায় সেঁধাল, সাড়া পাওয়া গেল না।

চণ্ডী পাশের ঘরে মাটিতে আঁচল বিছিয়ে ঘুমোচ্ছিল। মারামারিতে তার ঘুম ভাঙেনি। নকুলের চড়-ঘুষিও তার কানে যায়নি। সব যখন চুপচাপ, নকুল সন্ধেয় কেনা ছটা বিড়ির প্রথমটা সবে ধরিয়ে ওঘরে ঢুকেছে, চণ্ডী ধড়ফড় করে উঠে বসল। এক মুহূর্ত অদ্ভুত চোখে নকুলের দিকে চেয়ে থেকে তার ঘোর ভাঙল, বাব্বা! যা একখানা স্বপ্ন দেখছিলুম!

কে বলবে নকুল একটু আগেই নিজের ছেলেমেয়েদের মারধর করেছে, বিড়িতে ছোট একটা টান দিয়ে বলল, কী?

—দেখলুম ভাত পুড়ে যাচ্ছে। চাল এনেছো?

—অনেকদিন পর লটে মাছ পেলুম। বেশ ঝাল দিয়ে রাঁধোতো গিয়ে।

দু-ঘরের মাঝখানে একটা মাত্র কুপি। তেল কমে গিয়ে দপ-দপ করছে। চণ্ডী সেদিকে একবার তাকিয়ে বলল, তেল ভরতে হবে। কেরাসিন এনেছো?

নকুলের বিড়ি নিভে গিয়েছিল, নিচু হয়ে কুপি থেকে ধরিয়ে নিয়ে বলল, একটু পড়েই চাঁদ উঠবে। আজ ওতেই একরকম চলে যাবে। কাল কেরাসিন আনব।

মেয়েদুটো আর চুনী খেতে বসে বাপের কিলচড় ভুলে কোঁদল শুরু করেছিল, এক ধমক খেয়ে চুপ। জ্যোৎস্নায় দাওয়ায় বসে সবাই চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে, খাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই, হঠাৎ ছোট মেয়েটা ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল, আমায় মোটে একটুখানি মাছের ঝোল দিয়েছে, আমার কত রক্ত পড়েছে নাক দিয়ে!

নকুলের চোখে ঘোষেদের বাড়ির জানলা ভাসছিল, হঠাৎ কান্না শুনে মুখে ভাত নিয়েই সে খুব বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল, মারব এক থাবড়া!

চণ্ডী নিজের ভাগ থেকে খানিকটা ঝোল পান্নার থালায় তুলে দিয়ে বলল, সব সময় খালি মারব, মারব! জিবে নিমের পাতা বেটে দিয়েছ নাকি, অ্যাঁ?

খেয়ে উঠে বিড়ি ধরাবার উপায় নেই, কুপি অনেকক্ষণ নিভে গেছে। উনুনের পোড়া কাঠ-পাতায় জল ঢালা। নকুল বিড়িহাতে চণ্ডীর পিছনে এসে দাঁড়ায়, ঘরে দেশলাই নেই?

—জোছনায় ধরাও গিয়ে!

একটু পরে হাত ধুয়ে এসে একটা দেশলাই এনে নকুলের পায়ের কাছে ছুড়ে দেয়।

তিনটে মাত্র কাঠি। নকুল সাবধানে বিড়ি ধরায়।

চাঁদ গাবগাছ ছেড়ে সুপুরিবনের দিকে যাচ্ছে। দাওয়ায় বসে চণ্ডীর থালাবাটি ধোওয়ার শব্দ আর তার গোঙানি শুনতে শুনতে নকুল বিড়ির আগুন থেকে আরেকটা বিড়ি ধরিয়ে

ঘন-ঘন টানতে থাকে ।

চণ্ডীর হাতের হাজা ছাই-জল লেগে জ্বলছে, তার ওপর অন্ধকারে একটা ভাঙা বাটির কানায় লেগে তার হাত কেটে গেছে, সে কোঁকাতে-কোঁকাতে দাওয়ায় এসে দাঁড়াতেই নকুল খিঁচিয়ে উঠল, আঃ, তাড়াতাড়ি সার না ঘরামীর মেয়ে!

'ঘরামীর মেয়ে' নকুল রেগে আর আদর করে— দু-অবস্থায়ই বলে । ঘরে ঢুকে চণ্ডীকে নিজের দিকে টেনে নিতে নিতে এবার নকুল অন্যরকম গলায় বলল, ঘরামীর মেয়ে! ছাগল দুধে কালোজামের মধু মেরে তোকে খাওয়াব, দেখিস ।

একটা গাছের ডালকে শাড়ি জড়ালে যেমন হয় চণ্ডী প্রায় সেইরকম । গায়ে মাংস নেই, শুধু হাড় । কোঁকাতে-কোঁকাতেও সে ঝেঁঝে উঠল, রোজ ওই এক কথা । শুনে শুনে কান পচে গেল! মিথ্যুক ঠগ! কই, একদিনও তো—

নকুল এক ঝটকায় তাকে বিছানায় ফেলে দাঁত কিড়মিড় করল, চোপ ঘরামীর মেয়ে!

শেষ রাতে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে নকুলের ঘুম ভেঙে গেল । চণ্ডী বিছানায় নেই । পাশের ঘরে ছেলেমেয়ে তিনটে গুঁটিসুঁটি মেরে ঘুমোচ্ছে । একটা ফোঁকর দিয়ে জলের ছাঁট এসে হীরের পা ভিজিয়ে দিচ্ছিল, নকুল দরমাটা টেনে দিতে দিতে দেখল দাওয়ার দিকের দরজায় খিড়কি নেই, অল্প ফাঁক হয়ে আছে ।

পাল্লা ঠেলে নকুল দাওয়ায় এসে দেখল চণ্ডী দেওয়াল ঘেঁসে বসে থালায় কী মাখছে । নকুল সাবধানে পাশ থেকে উঁকি দিল । এক থালা আটায় অনেকটা মধু ঢেলে জল দিয়ে চটকাচ্ছে । সে একহাতে চণ্ডীর চুলের মুঠি আরেক হাতে থালার ওপর ঘটি-শিশি নিয়ে সোজা নিজের ঘরে । তারপর চণ্ডীর মুখে কাপড় গুঁজে বেদম মার ।

সকালে বেরোবার সময় নকুল মধুর সবকটা শিশি একটা ব্যাগে পুরে সেটা সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে নিল । শুধু নিমের এক শিশি ঘরে রইল, দত্তবাবুর বায়না করা । শিশিটা মাচার এককোণে লুকিয়ে রাখল, দত্তবাবুর কাছে বেশি দাম পাওয়া যায় ।

গোলাপজামের খুপরিতে কাঠের ফাঁক চুইয়ে বৃষ্টির জল ঢুকেছে, নকুল একটা আধলা ইট নিয়ে খুপরির ছাদের তক্তা তিনটে ঠুকে ঠুকে একদম মিলিয়ে দিল । রাস্তার ওপাশেই তিনটে গোলাপজাম গাছ । ওখান থেকেই বাগানের শুরু । এক ঝাঁক মৌমাছি গোলাপজামের বড় বড় ফুল কালো করে বসে মধু খাচ্ছে, এক ফুল থেকে আরেক ফুলে ওড়াউড়ি করছে, তারা হঠাৎ উড়ে এসে নকুলের মাথার চারপাশে ঘুরে ঘুরে চক্কর দিতে লাগল ।

মুনসেফ কোর্টের কাছে তিনটে দোকান নকুলের খদ্দের । ঝনখট ঝনখট শব্দ তুলে নকুল সাইকেল চালায় । ব্যাগের শিশিগুলোতে ঠোকাঠুকি লাগছে । তার মাথার চারপাশে কয়েকশো মৌমাছি তোবড়ানো বৃত্তের মতো চক্কর দিতে দিতে চলেছে ।

এই দৃশ্য এখানকার লোকের চোখসওয়া । এক ঝাঁক মৌমাছি মাথার চারপাশে নিয়ে নকুল ঝনখট ঝনখট সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে দেখে শিবু দূর থেকে চিৎকার করে ডাকল, নকুল, নকুল গো—

নকুল ফট করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সাইকেলের মুখ ঘোরাল । শিবুর সঙ্গে তিনটে মেয়ে ।

নকুল কাছে আসতেই মেয়ে তিনটে ঠিক একসঙ্গে ‘বাবা গো!’ বলে হাতের পাতায় মুখ ঢাকল । তিনজনেই দাঁড়িয়ে পড়েছে ।

শিবু বলল, মৌমাছি দেখে ভয় পেয়েছেন । সামলে রাখিস ।

নকুল সাইকেল থেকে নামতে তার মাথার সঙ্গে মৌমাছির ঝাঁকও আরও নেমে এসে পাক খেতে লাগল । নমিতা-শমিতা লাফ মেরে পিছিয়ে গেল আর লীনা লজ্জা-টজ্জা ভুলে রাস্তার ওপর উবু হয়ে বসে পড়ে দু-হাতে মুখ-মাথা ঢেকে চেঁচিয়ে উঠল, সরে যেতে বলো, উঃ, শিবু, সরে যেতে বলো না!

নকুল হাসতে হাসতে বলল, ভয় নেই । আপনারা ভয় পাবেন না । এরা হুল ফোটাবে না । আপনাদের কাছেই যাবে না ।

নকুলের মাথা ছেড়ে একটা মৌমাছিও এদিক-ওদিক যাচ্ছে না দেখে নমিতারা আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয় । নকুলকেও তো কই হুল ফোটাচ্ছে না! লীনা সাহস করে উঠে দাঁড়িয়ে মৌমাছির চক্কর খাওয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে । মাঝে মাঝে অজ্ঞাতে তার চোখ বন্ধ হয়ে যায় ।

শরীরে হাড়গোড় নেই নাকি? নকুল জীবনে এরকম সুন্দর মেয়ে দেখেনি । শুধু জোছনা আর ননী দিয়ে তৈরি । মধুমাখা গলা আর কাকে বলে । নকুলের খেয়াল নেই সে অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে । তার চোখ ঘুরেঘুরে বসে পড়া মেয়েটার মুখের ওপর বসছে । নকুলের মুখ হা । ধরা পড়ে গেলে খুব চোখ পিটপিট করতে করতে সে মুখ সরিয়ে নিচ্ছে ।

শিবু ভারি বিব্রত, নকুল! এনারা তোর মধু কিনতে এসেছেন!

নকুল চোখ পিটপিট করে ।

শমিতা বলল, দিদি, মৌচাক দেখবি না?

নমিতা লীনার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচায়, ওকে জিজ্ঞেস কর!

নকুলের খুব উৎসাহ। ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা খুপরি ওদের দেখায়, এইটা সজনেফুলের। এইটা আমের বউলের। এদিকে আসুন, এটা কালোজামের।

মেয়েদের ভয় ভেঙে গেছে। একেকটা বাঁশের খুঁটির ওপর আলাদা একেকটা কাঠের বাক্স। শিবু রাস্তার ওপারে একটা গোলাপজাম গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছে। এরা নকুলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে যত দেখছে ততই অবাক।

লীনা একটা বাক্স, দেখিয়ে বলল, এটা কী ফুলের মধু?

—ঘাসফুলের।

নমিতা বলল, তুমি কী করে বোঝ কোনটা কোন ফুলের?

—আজ্ঞে একদল মৌমাছি এক ঋতুতে শুধু এক রকম ফুলেরই মধু খায়। ওই খুপরিটা দেখছেন, ওই চাকের মৌমাছিরা এবছর লিচুগাছে বসছে।

শমিতা সাহস করে একটা খুপরির মধ্যে উঁকি মেরে বলল, কী ছোট্ট চাক। এটা কোন ফুলের?

—নিমফুলের। নিমফুলে এবার খুব কম মৌমাছি বসছে।

—নিমের মধু! কী আশ্চর্য, নারে, লীনা!

নমিতা নিচু হয়ে শাড়ির চোরকাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, নিমফুলের মধুর কথা খুব শুনেছি। আছে তোমার কাছে?

দুমাস পরে দিতে পারব। এবছর দুয়েক শিশির বেশি হবে না।

—এখন তোমার কাছে কী কী পাওয়া যাবে?

নকুল ব্যাগের থেকে একটা একটা করে শিশিগুলো বের করে নাম বলে।

শিবু বিড়ি শেষ করে বকের মতো লম্বা ঠ্যাঙে এগিয়ে আসে।

নকুল দাম বলতে যাচ্ছে, শিবু চোখ টিপে দিয়ে বলল, কলকাতা থেকে এয়েছেন, ল্যায্য দাম ধরিস।

নকুল ভুরু কোঁচকায় । বেশ বিরক্ত । ন্যায্য দামের চেয়েও কমে সে সবকটা শিশি দিয়ে দেয় । একটায় মধু একটু কম, শেষরাতে চণ্ডী ঢেলে নিয়েছিল, সেটা সে ফাউ দিয়ে দিল ।

অনেকগুলো টাকা হাতে পেয়ে নকুল পাঁচ কেজি চাল ছাড়াও পুরো নশো গ্রামের একটা শোল মাছ নিয়ে নিল । সঙ্গে এটাসেটা । মশলাপাতি । দু-বাণ্ডিল বিড়ি । দেশলাই কিনল দুটো ।

দুবেলা পেট ভরে খেয়ে সে দাওয়ায় বসে চাঁদের আলোয় পর পর অনেকগুলো বিড়ি শেষ করে শুতে গেল । গাবগাছের মাথায় চাঁদ । জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকতে আসছে । নকুল অনেকক্ষণ বউয়ের রোগা মুখটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অনেক বছর আগের তার সুশ্রী চোখ-নাক খুঁজে পেল ।

মাঝরাতে সামান্য ঠুকঠাক শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখল, চণ্ডী মাচার নিমফুলের মধু নামিয়ে আটা মেখে গবগব করে খাচ্ছে ।

পা টিপে টিপে সে তার বউয়ের পিছনে এসে পিঠে হাত রাখতেই চণ্ডী তাকাল । তার মুখ মড়ার মতো ।

নকুল হেসে ফেলে বলল, তোমার বাপু রাক্ষসের খিদে ।

চণ্ডী এতক্ষণে হাসে, কখনও বাচ্চা পেটে ধরনি তো!

নকুল শিশি থেকে আরও খানিকটা মধু ঢেলে দিতে দিতে বলল, এমন শুকনো শুকনো খাচ্ছিস, দম আটকে মরবি নাকি গো ঘরামীর মেয়ে!

প্রথম প্রকাশ : যুগান্তর, ২৭ অগাস্ট ১৯৭৮

# গৃহ

ভোরবেলা বাবা এলেন, মাথার জট এবার আরও বেড়েছে, হাতে কচি কচি চারটে সজনে ডাঁটা ।

এর আগে যেবার এসেছিলেন, সেবার এনেছিলেন চারটে সবেদা । মায়ের, আমার, নীলুর আরেকটা নিজের জন্য । এবারও চারটে । বাবা তো আর জানতেন না, নীলু জেলে ।

বাবার ডাক শুনেই মা আমার ঘুম ভাঙান । মাথায় কাপড় দিতে দিতে বললেন, 'দরজা খোল তো ।' বলে নিজেই দরজা খুলে দিয়ে বাবার চোখে চোখ রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন । বাবার মাথার ওপর দিয়ে দেখলাম আকাশে তখনও শুকতারা জ্বলজ্বল করছে ।

বাবা বললেন, 'ঘুমোচ্ছিলে?'

কথার উত্তর না দিয়ে মা শুধু বললেন, 'ভেতরে এসো ।'

বাবাকে বসবার ঘরে বসিয়ে মা বোধহয় বিছানা তুলতে গেলেন । আগের বার বাবার পরনে ছিল গেরুয়া, মা রাগে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে দিয়েছিলেন । এবার ময়লা, ছেঁড়া ধুতি আর ফতুয়ায় বাবাকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা ভিখিরি ।

হাতের চেটোয় সিগারেট আড়াল করে বাথরুমে যাবার সময় দেখলাম, বাবা ঘাড় ঘুরিয়ে দরজা-জানলার পর্দা দেখছেন । আমাকে দেখে বললেন, 'আজকাল কী করছ-টরছ শুনব । স্নান সেরে এসো । নীলুকে তো দেখছি না?'

বছরের পর বছর খবর রাখেন না, আজ এত খবরে কী দরকার আপনার! মুখে বললাম, 'আপনি রেস্ট করুন, মা চা আনছে ।'

বাবাকে দেখে এবার কেন জানি না আমার আনন্দ হল না । বরং অস্পষ্ট একটা বিরক্তি ক্রমশই মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে । শুকনো রুগণ চেহারা, ভিখিরির অধম জামাকাপড়, বাবা এভাবে জীবনে কী আহরণ করছেন, তিনিই জানেন!

বাথরুমের দরজায় খটখট । মায়ের গলা— 'তোর কি দেরি হবে মলু?'

বেরিয়ে দেখি মায়ের হাতে বাবারই বহু যুগ আগের পাটভাঙা ধুতি । বাবার পাশে রেখে বললেন, 'ছাইভস্ম ধুয়ে, রাজবেশ ছেড়ে এসো ।

বাবার মুখে অপরাধীর হাসি । সজনে ডাঁটাগুলো তখনও হাতে ধরা, মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বড় উপকারী । অল্প আঁচে রেঁধো ।'

'তুমি খাবে না?'

'না হলে আর চারটে এনেছি!'

'তুমি বাড়ির রান্না খাবে? তোমার জন্য আলাদা হাঁড়ি মাজতে দিয়ে এলাম ।'

বাবার মুখে আবার সেই গোঁফ-দাড়ি ছাপানো অপরাধীর হাসি ।

মা আজ বোধহয় চায়ের কথা ভুলে গেছেন । আমার জেলের দেরি হয়ে যাচ্ছে, শুধু তো দেখতে যাওয়া না, নীলুর জন্য কিছু কেনাকাটাও করতে হবে । এদিকে ইন্টারভিউ শুরু হবার আগেই জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দরখাস্ত না দিতে পারলে সেদিন আর দেখা হবার উপায় নেই ।

রবিবার এমনিতে আমার ছুটির দিন । কিন্তু জেলের তাড়াহুড়োয় সকালটা আলস্যে কাটাবার উপায় থাকে না । খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে চানটান করে তৈরি হয়ে নিই । সপ্তাহে ওই একদিনই নীলুর সঙ্গে দেখা করা যায়, অন্য দিন নিষিদ্ধ ।

এর সঙ্গে আজ আবার একটু বাড়তি তাড়াও আছে । দুপুরে ঋতু আসবে । আমাদের সঙ্গে খাবে । বেরবার আগে মুরগি কিনে দিয়ে যেতে হবে । মায়ের তা অজানা নয় ।

মা বাবাকে তোয়ালে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন, তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দরজায় খুব আস্তে ঠকঠক করতেই বাবা দরজা খুলে দিলেন । বাবা ধুতি পরে চান করছিলেন, তোয়ালেটা নিতে নিতে বললেন, 'নীলুকে দেখলাম না তো!'

'সে বাবু সন্ন্যেসী হয়ে গেছে!'

'সে কী!' বাবা খুব চমকে উঠেছেন মনে হল ।

'সন্ন্যাসীর ছেলে সন্ন্যাসী ছাড়া আর কী হবে?' বলে এদিকে মুখ ঘোরাতেই দেখলাম, মায়ের নাকের পাটা হঠাৎ দুবার ফুলে উঠল ।

মা রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, আমি বললাম, 'নীলুর সঙ্গে আজও দেখা হওয়া মুস্কিল হবে! ঋতুরও আসার সময় হয়ে যাচ্ছে!'

খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে মা বললেন, ‘ঋতুর আজ এখানে না আসাই ভালো। তুই বরং নীলুর কাছ থেকে ঋতুদের বাড়ি চলে যাস। তোরা হোটেল থেকে কিছু খেয়ে নিস।’

‘বাবার কথা ঋতু তো জানেই?’

‘সে জানা আর হঠাৎ এরকম দেখা এক কথা না।’

‘বাবা নিশ্চয়ই দু-তিন সপ্তাহ থাকবে—’

‘যা ভালো বুঝিস কর—’

বলে মা রান্নাঘরে গেলেন।

ফর্সা ধুতি পরে বাবা বাথরুম থেকে বেরলেন। চুল-দাড়ির জটা বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। বাঁহাতে সেই ছাড়া ফতুয়াটা।

আমাকে দেখে বললেন, ‘নীলু তাহলে সন্ন্যাস নিল?’

আমি হ্যাঁ-না কিছুই বললাম না।

বাবা ঠায় দাঁড়িয়ে। খানিকটা উদ্বেগ, কিছুটা অন্যমনস্ক। মনে হয় নিজের সঙ্গে কিছু একটা বোঝাপড়া করছেন।

হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, ‘কতদিন বাড়িছাড়া?’

‘সাত বছর!’

‘তখন ওর বয়েস কত?’

‘সে তো আপনারই জানার কথা!’

বাবা দুয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে খুব শান্ত গলায় বললেন, ‘তোমার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে, তোমার মনে শান্তি নেই, শুধু বাইরের দিকে সুখ-শান্তির আয়োজন করেছ।’

এক হাতে ফ্রাই প্যানে ওমলেট, আরেক হাতে টোস্ট নিয়ে মা সোজা টেবিলের কাছে এসে বললেন, ‘প্লেটটা টেনে নে।’ আমার প্লেটে টোস্ট ওমলেট দিয়ে বাবাকে বললেন, ‘তুমি কি এই আমিষ টেবিলে বসবে, না চা ঘরে দিয়ে আসব?’

বাবা কথার উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্কভাবে খাবার টেবিলের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

মা রান্নাঘরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, বাবা বললেন, 'শোনো, একটা কথা বলো দেখি। নীলু কি তবে সংসারে—'

বাবা কথা শেষ করলেন না। চুপ করে আছেন দেখে মা আবার চলে যাচ্ছিলেন, বাবা বললেন, 'নীলু কি সংসারে কোনও ব্যথা পেয়েছিল?'

মা স্পষ্ট চোখে বাবার দিকে তাকালেন, মায়ের ঠিক এরকম চোখ তুলে তাকানো আমার মনে পড়ে না। ওইভাবে চেয়ে থেকেই বললেন, 'এই মলুর সামনেই বলছি, নীলু তোমার কাছে কী পেয়েছে একটু ভেবো তো!'

বাবা কিছুক্ষণ বসে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এতক্ষণে হাতের ফতুয়াটা টেবিলের কোনায় রাখলেন। ঠক করে শব্দ হল।

মা আমার জন্য চা নিয়ে এসেছিলেন, শব্দটা তাঁরও কানে গেছে— ফতুয়ার পকেটে ওটা কি গাঁজার কলকে না? যে কদিন থাকবেন, বাড়িতেও খাবেন নাকি? মা কি আগেই এটা দেখেছিলেন, তাই ঋতুকে আসতে বারণ করছিলেন?

মা গলা তুলে বললেন, 'লক্ষ্মী! এদিকে একবার আয় তো। ফতুয়াটা নিয়ে একেবারে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়!'

বাবা ব্যস্ত হয়ে ফতুয়াটা তুলে ধরে পকেট থেকে একটা বড় রঙিন পাথর বার করে নিলেন, একবার মায়ের দিকে, একবার আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'এটা নিয়ে আমি খেলি!'

মা বললেন, 'তোমার তো এখন খেলারই বয়েস!'

'না না, মন যখন বিক্ষিপ্ত হয়, ওই পাথরটা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাই, মন শান্ত হয়ে যায়। ওতে আমার ভারি মনসংযোগ হয়।' একটু থেমে বললেন, 'তোমাকেও শেখাব।'

মা হঠাৎ রেগে উঠলেন মনে হয়। গলার স্বরে ঝাঁঝ নিয়েই বললেন, 'আগে সংসার-ধর্ম শেখো, তারপর তোমার সন্ন্যাস শিখিয়ো! তোমার সকালবেলায় সেবায় কী কী লাগে বললে না তো?'

বাবা মনে হয় আঘাত পেয়েছেন। স্বরে আঘাত চাপবার চেষ্টা। বললেন, 'সকালে আমি কিছু খাই না। চা যখন করেছ, এক কাপ দিতে পারো। এক গেলাস জলও দিও।'

মা চায়ের সরঞ্জাম আজ টেবিলে আনেননি। রান্নাঘর থেকে এক কাপ চা এনে বললেন, 'এখানেই খাবে?'

'একটা টেবিল আর কী দোষ করল?'

'দোষগুণ তুমিই জানো! সেবার তো পিঁড়িও ছোঁওনি।'

মা ফ্রিজ খুলে একটা জলের বোতল বার করে এদিক ওদিক গেলাস খুঁজলেন, না পেয়ে বোতলটা বাবার হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমার তো কমণ্ডলু থেকে খাওয়ার অভ্যেস — খুব ঠান্ডা কিন্তু—'

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'হিমালয়ের বরফের চেয়ে তো বেশি ঠান্ডা না।'

কথাটা আমি হালকাভাবে, নির্দোষ মজা হিসেবেই বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু কেমন ব্যঙ্গের সুর এসে গেল! বাবা দেখলাম, হাতের পাথরে চোখ নামালেন।

আগের বার বাবা যখন এসেছিলেন, বছর নয়েক আগের কথা, আমি ম্যানেজমেন্ট কোর্সের অ্যাডমিশন টেস্টে সিলেকটেড হয়ে টাকার ধান্দায় না ধরছি এমন আত্মীয় নেই, তখন আমাদের খাবার টেবিল ছিল না, মেঝেয় পিঁড়ি পেতে বসে খেতাম, আমার মনে আছে, বাবা সেবার মায়ের পীড়াপীড়িতেও পিঁড়িতে বসতে রাজি হননি। মা কেঁদে ফেলেছিলেন। এখন বুঝি, কত সামান্য কারণে মা তখন কাঁদতেন। সারা সন্ধে মায়ের ফোঁপানো কান্না শুনতে শুনতে সেদিন বাবার ওপর আমার খুব রাগ হয়েছিল।

মা চান করে শাড়ি বদলে এসেছেন। আমি খাবার টেবিলেই ছোট আয়না বসিয়ে দাড়ি কামাচ্ছি। আমাকে দেখে বললেন, 'আ! আজ আবার এখানে বসলি কেন?'

আমি মুখ না ফিরিয়েই বললাম, 'তুমি বাথরুমে ছিলে।'

মা আমাকে কিছু না বলে বাবাকে বললেন, 'দুপুরে খাবে তো? নাকি এখনও একাহারী?'

আমি টের পাচ্ছি, বাবা আমাকে দেখছেন। মাকে বললেন, 'না! আর কোনও নিয়ম নেই।'

'আজ আমাদের মুরগি হবে। তুমি খাবে?'

বাবার উত্তর নেই। একটু পরে বললেন, 'আমার জন্যে ভাতের মধ্যে কিছু সেদ্ধটেদ্ধ করে দিও। আর সজনে ডাঁটা।'

'তবে যে বললে, নিয়মটিয়ম আর মানো না?'

বাবা খুব শান্ত স্বরে বললেন, 'প্রাণী হত্যার দায়ভাগী হতে পারব না ।'

বলে খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ।

বাবার কথাটাতেই আমার জ্বালা ধরেছিল, মনে হল যেন ব্রণয় হঠাৎ ব্লেড বসে গেছে, তার ওপর ওই দীর্ঘশ্বাস আর সহ্য করতে পারলাম না । বাবার দিকে তাকিয়েই বললাম, 'তবে তো আপনার ভাতও খাওয়া চলে না! গাছও তো প্রাণীই । সজনে ডাঁটা খাওয়ার যুক্তিটাই বা কী?'

বাবা পাথরটা হাতে নিয়ে দু-হাত জোড় করে বসেছিলেন, এবারও খুব শান্ত গলায় বললেন, 'জীবন তর্কের বিষয় নয় । তর্ক খুব বাইরের জিনিস, মলয় ।'

মলু না বলে মলয়! এরকম বাবা আগেও বলতেন, আমাকে মলয়, নীলুকে নীলয়, সে আমাদের ছেলেবেলায় দেশি-বিদেশি গল্প শুনিয়ে গল্পের উপদেশ যখন বোঝাতেন, তখন । আমার কথাাট একটু রূঢ় হয়ে গেছে সন্দেহ নেই, তা কী করা যাবে, আমিও তো মানুষ । একে তো শেষরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে মাথাটা ভার হয়ে আছে, তার ওপর এত আগে উঠেও লাভ কী হল? সেই দেরিই হয়ে গেল । বাজারে যাও, মুরগি কিনে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দাও, তারপর নীলুর জন্য আজ একটা মাখন আর কেজি খানেক ছোলা-বাদাম কিনব ভেবেছি, একটা পাজামা আর এক জোড়া চপ্পল চেয়েছিল, কাল কিনে রাখতে ভুলে গেছি, আজ রবিবার দোকান-টোকান কোথায় খোলা আছে কে জানে— সব তো আমাকেই সামলাতে হবে! এদিকে দেখতে দেখতে প্রায় সাড়ে আটটা । তার মানে ঋতুরও আসার সময় হয়ে এল ।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে মাকে বললাম, 'আমি মুরগি এনে দিয়ে যাচ্ছি । ঋতু এলে আমার ঘরে বসিয়ো । আর কিছু কি আনতে হবে?'

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন । হাতে এক পেয়ালা দুধ । আমার সামনে ধরে বললেন, 'এক চুমুকে খেয়ে নে । কখন ফিরবি, কখন খাবি তার তো কোনও ঠিক নেই । ছোট বাঁধাকপি একটা পাস তো আনিস ।'

দুধে চুমুক দিচ্ছি, বাবা বললেন, 'আজ যে বড় রান্নার ঘটা! নেমন্তন্ন নাকি?'

'নেমন্তন্ন আবার কী! একটা মেয়ে আসবে, আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছি—'

'কার মেয়ে?'

'তুমি চিনবে না ।'

'তোমাদের সঙ্গে কী ধরনের সম্বন্ধ?'

মা এবার একটু হেসে বললেন, 'সম্বন্ধ হয়নি, হচ্ছে। মলুর অফিসের বন্ধু। বুঝলে?

দুধ শেষ করে বেরবার মুখে অভ্যেসবশত সিগারেট ধরাতে গিয়ে সামলে নিলাম। হাতের তালুতে সিগারেটটা লুকিয়ে ফেলা বাবার চোখে পড়েছে। আরেকবার বাবার চোখের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে বললাম, 'আমি বাজারে যাচ্ছি। ফিরে এসেই আবার বেরতে হবে। আপনি বরং পিছনের বাগানে ঘুরে বেড়ান, আপনার ভালো লাগতে পারে।'

বাবা চেয়ারে বসে থেকেই বললেন, 'আমি ভাবছি, তোমাকে এত চঞ্চল দেখাচ্ছে কেন!'

'চাঞ্চল্যের কারণ আছে বলেই দেখাচ্ছে'।

'না না, সে কথা বলছি না। তুমি বড় অশান্তিতে আছো।'

ভাবলাম কথা না বাড়িয়ে চলে যাই, সত্যিই দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু হঠাৎই কী রকম জেদ ধরে গেল, বললাম, 'অশান্তির কারণ থাকলেই অশান্তি থাকবে। পাগল বা সাধু-সন্ন্যাসী হলে আলাদা কথা।'

'তুমি বোধহয় আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছ না। একটা কথা বলো তো, আজ যার আসার কথা তার সঙ্গে কি তোমার বিবাহ হবার সম্ভাবনা আছে?'

মা বোধহয় সবই শুনছিলেন, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে বাবাকে বললেন, 'তুমি ওকে অমন জেরা করছ কেন? শুনছ ওর খুব দরকারি কাজ আছে, দেরি হয়ে গেছে—'

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তুই বরং আগে ওখানে যা। ফেরার সময় মুরগি নিয়ে আসিস। পাওয়া যাবে না?'

তাছাড়া আর বোধহয় উপায়ও নেই। বাজার করে ফিরে এসে নীলুর কেনাকাটা সেরে আলিপুর যাবার আর সময়ও থাকবে না। বাদ দেওয়াও আর যায় না। গত রবিবার যাওয়া হয়নি, ও খুব আশা করে থাকবে।

বাবা দাড়ির জটে হাত বোলাচ্ছেন। জট ছাড়াচ্ছেন না, হাত দিয়ে জটগুলো যেন অনুভব করছেন। আমি চলে যাচ্ছি দেখেও বললেন, 'মলুর জীবনে অনেক জট পড়েছে। সেসব না ছাড়িয়ে অন্যের জীবনে এখনই ওর জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না।'

ঘরে বসে জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে নীলুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন লিখতে লিখতে মায়ের গলা শুনলাম, ঝাঁঝ চাপতে পারেননি, 'বত্রিশ বছর বয়েস হল, ওকেও কি সন্ন্যাসী বানাতে চাও নাকি?'

বাবার গলা এবারে বেশ মৃদু । বললেন, 'অনুপযুক্ত হাতে সংসার করতে গেলে সংসার নরক হয়ে ওঠে ।'

বাবার কথায় মা একেবারে জ্বলে উঠলেন, বোধহয় রান্নাঘর থেকে চ্যাঁচাচ্ছেন— 'সারা জীবন সন্ন্যেসীগিরি করে কাটালে, সংসারের কতটুকু বোঝ? ইচ্ছে হল আর বেরিয়ে পড়লে । মলু কত দিকে কত লড়াই করে আজ দাঁড়িয়েছে । ওর জন্যই যা হোক একটু সুখের মুখ দেখছি । কথায় কথায় ওকে অপমান করলে সইবে কেন!'

রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আ! মা! তোমরা কী শুরু করলে? ঋতু আজ না এলেই ভালো হয়!'

মা আবার বেরিয়ে এসে বাবার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি দু-দিনের জন্যে এসেছ, সংসারের সব ব্যাপারে মাথা ঘামাবার তোমার দরকার কী? যাও না, দু-দণ্ড বাগানে গিয়ে বসো না ।'

বাবা এমন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন যে, ওরকম উত্তেজনাময় পরিবেশেও আমার বুকের মধ্যে একবার ধ্বক করে উঠল ।

রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমেই ঋতুকে ফোন করলাম ।

'ঋতু, শোনো, আয়াম ফিলিং সো ব্যাড—'

'কী ব্যাপার?'

'না, মানে, বলতে খুবই খারাপ লাগছে—'

'দেরি করছো কেন, বলো, বলে ফেলো, আমি কিন্তু টেন্স হয়ে যাচ্ছি—'

'মানে আমার এক আত্মীয় মারা গেছেন । আজই সকালে, এইমাত্র খবর পেলাম—'

'সো স্যাড—'

'নেমন্তন্নটা কিন্তু মুলতুবি রইল । সামনের রবিবারের পরের রবিবার । না না, আমি তোমাকে জানিয়ে দেব ।'

নীলুকে বাবার কথা বলব বলব করেও শেষ পর্যন্ত বললাম না । কত বছর জেলে রয়েছে, আরও কত বছর থাকতে হবে, বাবার কথা ওকে জানিয়ে লাভ কী? আর বলবই বা কী?

দু পরত তারের জালের আড়ালে গোঁফ-দাড়িময় ওর মুখটা দেখে আজ হঠাৎ মনে হল, মা খুব মিথ্যে বলেননি, সন্ন্যাসীই তো, নীলুকে ক্রমশ তরুণ সন্ন্যাসীর মতো দেখাচ্ছে!

বললাম, 'আজ আর চপ্পল কেনার সময় পেলাম না । পাজামা জমা দিয়ে যাচ্ছি । তোর মাপটা মনে ছিল না, ৪০ নম্বর নিয়েছি, পরে দেখিস তো ।'

'পাজামা একটু ছোট হলে এমন কী আর, বড় হলে গুটিয়ে নিলেই হবে ।' তারপর লাজুক হেসে বলল, 'দুয়েক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে যেও ।'

'তোর কেসের কতদূর কী হল? কোর্টে নিয়ে যায়?'

'প্রায় সব কোর্টেই কেস দিয়েছে । প্রতি সপ্তাহেই কোথাও না কোথাও যাচ্ছি । বিনা পয়সায় দেশ ভ্রমণ আর কী!'

নীলু অনায়াসে এসব কথা বলে যায় । আমিও সহজ থাকার ভান করি । সেই ভাবেই প্রশ্ন করলাম, 'তোরা শুনেছিলাম দেশ বদলে দিবি । তা দেশ তো যেখানে ছিল সেখানেই আছে । মাঝখান থেকে তোরা সরকারের অতিথি হয়ে গেলি । লাভ কী হল?'

নীলু এবারও হেসে বলল, 'এসব কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা করে লাভ নেই । দাদা, তুমি বিয়ে করছ কবে?'

আমি সাধারণত এখানে এসে নীলুর সামনে সিগারেট খাই না, আজ একটা ধরিয়ে ফেললাম ।

'তুমি বিয়ের কথায় চুপ মেরে গেলে যে?' হাসলে নীলুকে ভারি সুন্দর দেখায় ।

আমিও হেসে বললাম, 'তুই শ্বশুরবাড়িতে, আমিও শ্বশুরবাড়িতে, মা কাকে নিয়ে থাকবে?'

'তুমি কি ঘরজামাই হচ্ছ নাকি?'

'সে তো তোরই একচেটিয়া ।'

বলে আমি অকারণে পাশের গোয়েন্দা অফিসারের দিকে তাকালাম । ভদ্রলোকও মৃদু হাসলেন, বললেন, 'নীলয়বাবুর মতো জ্ঞানী, ওরকম চার্মিং ইয়ংম্যান আমার ২৬ বছরের চাকরিজীবনে আমি আর দেখিনি । মাঝে মাঝে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে ভাবি—'

নীলু জালের ঝাপসা আড়াল থেকে ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বলল, 'থাক থাক গোয়েন্দামশাই, আমার চরিতকথা আর নাই বা শোনালেন!'

'নীলু, বাবার কথা মনে পড়ে?'

'তুমি কোনও খবর পাও না?'

'তোর কীরকম মনে আছে শুনি?'

'সেই যে একবার গেরুয়া-টেরুয়া পরে এসেছিল। রোজ রাত থাকতে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিত। চলে যাবার সময় মা গেরুয়া ফেলে দিয়েছিল। আমি অবশ্য বাবাকে খুব ভালো করে জানি না।' একটু হেসে বলল, 'আজকাল বসে বসে ডায়রি লিখি, সময় কাটানো আর কী, বাবার কথা একদিন ভাবছিলাম। বাবা কি আমার কথা জানে?'

'বাবা জানে তুই সন্ন্যাসী হয়ে গেছিস।' শুনে নীলু হো-হো করে হেসে উঠল।

মা বোধহয় ঋতুর আশায় রয়েছেন। মুরগির অপেক্ষা করছেন। জেল থেকে বেরিয়ে আমার সমস্ত মন যেন এলিয়ে পড়ল। কী রকম মনে হল আমার আর কোথাও যাবার নেই, আমার পথ শেষ হয়ে এসেছে, এবার বসে পড়লেই হয়। অদ্ভুত একটা ক্লান্তি না বিষাদ না বিরক্তি না বৈরাগ্য— কে জানে কী আমাকে পেয়ে বসেছে।

একটা খালি ট্যাক্সি দেখে উঠে পড়লাম। পার্ক স্ট্রিটের ঠান্ডা বারে ঢুকে বিয়ার নিয়ে বসে বসে সময় কাটাতে লাগলাম, যেন সময় কাটানোই এখন আমার সবচেয়ে বড় কাজ।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতেই বাবার ভজন কানে এল। ভরাট, সুরেলা গলা। হিন্দি উচ্চারণও পরিষ্কার।

গান আসছে বাগানের দিক থেকে। এগোতেই চোখে পড়ল বাবা চোখ বুজে দুলে দুলে গাইছেন। মা পাশে বসে আছেন। ঠিক একটা মূর্তি। জ্যোৎস্নায় আমগাছের বউল চকচক করছে।

'আপনাকে চা দিই দাদাবাবু?' পিছনে লক্ষ্মী এসে দাঁড়িয়েছে।

বললাম, 'থাক, এখন আর চা খাব না।'

বাবার চোখ খুলে গেল। ভজন সমে এসে পৌঁছেছে, আমার দিকে চেয়ে থেকেই শেষ করলেন।

গান শেষ হতেই মা মুখ তুলে আমাকে দেখলেন। যেন ঘোর থেকে উঠে এলেন।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এদিকে আসতে আসতে বললেন, ‘ভাবাতেও পারিস বটে! গেলি তো গেলিই । সারাদিন একটা খবর পর্যন্ত নেই । ঋতুও এল না । খেলি কোথায়? ওর ওখানেই গিয়েছিলি বুঝি?’

কিছু না বলে আমি হাসলাম ।

বাবা বললেন, ‘অত ব্যস্ত হও কেন? সংসার তো মায়ের আঁচল নয়!’

আমি বললাম, ‘আপনি এবার কতদিন থাকবেন?’

বলতে চেয়েছিলাম, এবার কিছুদিন থেকে যেতে পারেন না?

প্রথম প্রকাশ : শারদীয় যুগান্তর, ১৯৮৪

# হাতেখড়ি

১৩৮০ বঙ্গাব্দে বাণী-বন্দনার দিন বেলার দিকে সবে আগের রাতের বৃষ্টিটা একটু ধরেছে, পঞ্চাননের ছোট মেয়ে পর পর হ্যাঁচ্চো দিতে দিতে থেমে থেমে কোনওরকমে বলল, ‘চলো বাবা, এই বেলা বেরিয়ে পড়ি!’

পঞ্চানন এই আশঙ্কাই করছিল । আগের রাতে কোত্থেকে গোছা গোছা মটরশুঁটি গাছ উপড়ে এনেছে, সকাল থেকে বসে বসে মটরশুঁটি বেছে আলাদা করছিল, তিনু সামনে এসে হ্যাঁচ্চো দিতেই তার মন ডেকে উঠল, এবার উপায়! উদ্বেগে মটরশুঁটিলতার জটের মধ্যে না দেখে শোঁপোকার গায়ে সে হাত রেখেছে । বৃষ্টি থেমে যাবে সে ভাবেনি ।

একে মাঘ মাস, তার ওপর রাত থেকে বৃষ্টি । কনকনে শীতে ভোরবেলা চান করে তিনুর বোধহয় সর্দি লেগেছে । একটা হাঁচি সামলে বলল, ‘হ্যাঁ, তুমি বসে থাকো, আবার বৃষ্টি নামুক—’

হাঁচির সঙ্গে অল্প অল্প কাঁপুনি । সর্দিতে চোখ ছলছল করছে । পঞ্চাননের মনে হল, মেয়েটা এবার কেঁদে ফেলবে । আকাশের অবস্থা দেখার ভান করে সে তিনুর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, ‘বৃষ্টিকে বিশ্বাস কী?’ মেয়েটার চোখ তার বুকে বিঁধে আছে ।

নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে, তবু কিছুতেই তিনু আঁচল দিয়ে নাক মুছে শাড়ি অপবিত্র করবে না । তার খুব ইচ্ছে ছিল, আজকের দিনটা নতুন শাড়ি পরবে । তাই নিয়ে কাল সারাদিন তার মন খুঁতখুঁত করেছে । শেষ পর্যন্ত মায়ের সাত ছেঁড়া বিয়ের শাড়িটা বাক্স থেকে বের করে সে নিজেকে বুঝ দিয়েছে । শাড়িটা ধোয়াই ছিল, তবু সে নিজে আরেকবার খুব যত্ন করে কেচে নিয়েছে । অত বড় শাড়ি, ঠিকমতো সামলাতে পারেনি, পেটের কাছটা উঁচু হয়ে আছে । পায়ের দিকের শাড়ি সাবধানে তুলে ধরে সে কলতলা থেকে নাকটাক ধুয়ে এসে বলল, ‘তুমি ওঠো তো । আমি বলছি আর বৃষ্টি হবে না’

‘পুজোই হয় কিনা দেখ ।’ পঞ্চানন গলায় জোর পাচ্ছে না, তবু বলল, ‘মাইক-টাইক তো শুনছি না ।’

‘তুমি কি অদ্ভুত কথা বলছ! সরস্বতী পুজোর দিন সরস্বতী পুজো হবে না!’

গলার স্বরে পঞ্চানন ভয় পায় । মেয়েটা তার প্রাণ । এমনিতে অনেক রকম দুঃখকষ্ট সওয়া পঞ্চাননের অভ্যেস, কিন্তু মেয়েটার চোখে জল দেখলে সে আর ঠিক থাকতে পারে না । সেই কালবৈশাখীর সময় থেকে বায়না ধরেছে এবার সরস্বতী পুজোয় তাকে হাতেখড়ি দিতে হবে । বলতে নেই, তাদের বংশে কেউ কখনও এই বয়েসে এতোটা লেখাপড়া শেখেনি । সে নিজে পাঠশালায় যেতে শুরু করে তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে । তখন অ-আ-ক-খও চেনে না । সে তুলনায় তিনুর কাণ্ড দেখে অবাক হতে হয় । কোত্থেকে শিখল, কার কাছে শিখল কে জানে, খুদে খুদে হরফের লক্ষ্মীর পাঁচালী সে দুলে দুলে দিব্যি পড়ে যায় । আরও আশ্চর্য, সে ইংরিজি পড়তে পারে । মটরশুঁটি মোট কটা, পঞ্চাননের আগে তিনুই গুনে বলে দেবে । শুধু লিখতে শেখেনি । হাতেখড়ির আগে লেখার নিয়ম নেই । না হলে এতদিনে নিশ্চয়ই লিখতেও পারত । লিখতে পারে না বলে ইস্কুলে ভর্তি হতে পারছে না ।

তিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে পঞ্চাননের বুকের মধ্যেটা খরখর করে ওঠে । কাল দাম করেছিল, একটা শিলেট আজকাল টাকা-দু টাকা । ডানহাতের তেলো কুটকুট করছে, শোঁয়া লেগেছে টের পায়নি, অন্যমনস্কভাবে বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে জোরে জোরে জায়গাটা চুলকোতে চুলকোতে পঞ্চানন বলল, 'আমি বরং একবার দেখে আসি ।'

'তুমি গেলে আর আসবে নাকি! আমাকে টাকা দাও, আমি খড়ি-শিলেট কিনে আনি । প্যান্ডেলেও অমনি খোঁজ নিয়ে আসব ।'

গোটা বাড়িতেই এখন সর্বসাকুল্যে সতেরোটা পয়সা আছে । লক্ষ্মীর আসনের নিচে সিঁদুরমাখানো কটা তামার পয়সার হিসেব ধরে লাভ নেই । ও-পয়সা আজকাল আর চলে না । পঞ্চানন জোর করে ক্ষীণ একটা ভরসার কথা ভাবে, তিনুর মায়ের কাছে যদি...বলল, 'দেখি— তোর মা ফিরুক—'

তিনু ঝাঁঝের সঙ্গে কেঁদে ফেলে, 'মা তো ফিরেছে! রান্নাঘরে বসে বসে কাঁদছে! যাও না, তুমি টাকা এনে দাও ।'

মেঘলায় কুয়াশায় বৃষ্টিতে এক পাতা বড়িও শুকোয়নি, রোদ না পেয়ে পেয়ে টোকো গন্ধ হয়ে গেছে, আজ পাতলা একটু রোদ উঠতেই তিনুর মা বণিকদের বাড়ির ছাদে বড়ি শুকোতে দিতে গিয়েছিল । এ অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু বাড়ি । সবার আগে রোদ পায়, রোদ যায়ও সবচেয়ে দেরিতে । ছাদ ভিজে দেখে বড়ির পাতাগুলো কার্নিশে রেখে ছাদের একটা কোণ আঁচল দিয়ে মুছেটুছে উঠে দাঁড়াতেই কার্নিশে চোখ পড়ল, এক পাতা বড়িও নেই! দৌড়ে কার্নিশের কাছে এসে যতটা পারে নিচের দিকে ঝুঁকে দেখল, রাস্তার জলে-কাদায় বড়িগুলো মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে । তিনুর মা প্রথমে বুকফাটা চিৎকার করে উঠেছিল,

তারপর অনেকক্ষণ ছাদে বসেই ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদল। অত উঁচু ছাদ, প্রায় আকাশছোঁয়া, কেউ তার কান্না শোনেনি।

রান্নাঘরের দরজা পঞ্চাননের মাথায় ঠেকে যায়। নিচু হয়ে ভেতরে ঢুকতে আজ আর সাহস হল না। বাইরে দাঁড়িয়ে সামান্য কুঁজো হয়ে সে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করল। তিনুর মা হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মাইকে হিন্দি গান শুরু হয়েছে। আর সময় নেই, তিনুর মায়ের ব্যাপারটা পরে দেখা যাবে, পঞ্চানন গলা খাঁকরে বলল, 'পঞ্চা সাহার দোকানে কাল বড়ি দেবার কথা ছিল না?'

ওদিক থেকে একইরকম ফোঁপানি। পঞ্চানন ভিত্তিটা জবরদস্ত করতে চায়। আরেকটু ঝুঁকে এসে বলল, 'কাল নিত্য বাঁড়ুজ্যের দোকানে টাকার জন্য গেছিলাম, বললে বড়ি নিয়ে এলেই আগের টাকা মিটিয়ে দেবে।'

একইসঙ্গে তিন-চারটে গান জড়াজড়ি করে তেড়ে আসছে। সেই আওয়াজেই হয়ত, কান্নাও এখন একটু মৃদু। পঞ্চানন আর দেরি না করে আসল কথাটা বলে ফেলে, 'তিনুটাকে প্যান্ডেলে হাতেখড়ি করিয়েই আমি যাব। বড়ি দিয়ে একবারে টাকা নিয়ে ফিরব। তোমার কাছে এখন গোটা দুই টাকা আছে নাকি? তিনুর একটা শিলেট-খড়ি—'

কথা শেষ হল না। তার মুখের ওপর দোমড়ানো-মোচড়ানো কাদামাখা কলাপাতার পুঁটলি ছিটকে এসে পড়ল। তখনও থ্যাঁতলানো ভাঙাচোরা কাদালাগা বড়ি লেগে আছে।

রান্নাঘরের ভেতরে ততক্ষণে মড়াকান্না উঠেছে।

সংসারের অনেক কিছুই তিনু আগে থেকে বুঝতে পারে। বাবা মায়ের ভরসায় আছে জেনে সে পুরোপুরি নিরাশ হয়। এরপর কী হবে সে জানে। শেষ দেখার অপেক্ষায় না থেকে তিনু জলকাদা ভেঙে বাসরাস্তার দিকে চলে যায়। তার এগারো বছরের জীবনে কী করে যেন টের পেয়ে গেছে, তার জীবন সুখের হবে না। না হলে অ্যাদ্দিনে আর হাতেখড়িটুকু হয় না!

প্যাচপেচে রাস্তাঘাট। কোথাও কোথাও বিঘৎখানেক জল দাঁড়িয়ে গেছে। কোথাও আরও বেশি। একেক জায়গায় মাঠ একদম পুকুর। পুকুরের ওপর মাচা বেঁধে পুজো হচ্ছে। শাড়ি সামলে বাঁশের সরু সাঁকো বেয়ে তিনু কাছে যাবার চেষ্টা করে সাবধানে ফিরে এল। ভয় করে, যদি পড়ে যাই। বাসরাস্তার মুখটাতে প্যান্ডেলে জল ঢুকেছে। একটা টেবিলের ওপর ঠাকুর বসানো হয়েছে। টেবিলের সামনের দিকটা খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে তাতে তুলি বুলিয়ে এখনও পদ্ম আঁকা হচ্ছে।

তিনু জল এড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের এখানে হাতেখড়ির সময় কি চলে গেছে?'

একটা ছেলে বালতি করে ছাই এনে এনে একটা জায়গা উঁচু করছিল, বলল, 'শ্লেট-টেট এনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক' ।

একটু দূরে পাজামা আর হাওয়াই শার্ট পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল, তিনুকে কাছে ডেকে নিয়ে বলল, 'তুমি কার হাতেখড়ি দেবে?'

লোকটার চোখ তিনুর মুখ গলা বেয়ে সামান্য নিচে নেমে ছটছট করছে । বয়েসের তুলনায় তিনু একটু বেশি বাড়ন্ত, তার ওপর শাড়ি পরে তাকে আজ বড়-বড়ই দেখাচ্ছে । তিনু খুব আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে বলল, 'আমার!'

'তাই বুঝি? কে তোমাকে হাতেখড়ি দিয়ে দেবেন?'

লোকটার চোখের সামনে তিনু জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । মনে মনে একদম কুঁকড়ে গিয়ে বলল, 'পুরুৎঠাকুরকে বললে হবে না?'

লোকটা হাতের সিগারেট জলে ছুড়ে দিতেই জল ছ্যাঁক করে উঠল । মুখের মধ্যে ধোঁয়া আটকে রেখেছিল, মাথার ওপর ধোঁয়ার বড় বড় তিনটে শূন্য বানিয়ে বলল, 'দৌড়ে গিয়ে তুমি শ্লেট নিয়ে এসো, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব ।'

যা বিচ্ছিরি লোকটা! তিনু পালিয়ে বাঁচে । হাতিখড়ির ব্যবস্থা করে দেবে ভেবে আপাতত সে লোকটাকে মনে মনে ক্ষমা করে দিল । এখন একটা শিলেট আর একটা খড়ি হলেই হয় । তিনু হঠাৎ কী করে বুঝতে পেরে গেল, ওই লোকটাকে বললে এ নিশ্চয়ই তাকে খড়ি-শিলেট কিনে দেবে । তাছাড়া আর কোথায়ইবা সে পাবে । দুহাতে শাড়ি সামলে জলকাদার ওপর দিয়ে সাবধানে হাঁটতে হাঁটতে দম বন্ধ করে তিনু ভাবল, ফিরে গিয়ে বলবে নাকি? লোকটা পিছন থেকে গলা তুলে বলল, 'ঠিক আসছ তো খুকি?'

শিলেটের কথাটা মুখে বলতে বড় লজ্জা । যদি লিখে জানাতে পারত? তিনু পড়তে পারে, এখনও লিখতে পারে না ।

প্রথম প্রকাশ: যুগান্তর, ১৮ মার্চ ১৯৭৯

# ধুলো

প্রণব নিজের স্টপে নামতে যাচ্ছে, মোটা মতো এক মহিলা তার পা মাড়িয়ে বাসে উঠতে উঠতে তাকেই শুনিয়ে দিলেন, যত ভিড়— সব গেটে, আশ্চর্য।

প্রণবের মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল, কিন্তু বাস থেকে নেমেই তার প্রধান কাজ মাটিতে পা ঠোকা। ফুটপাতের শানে সে ছ-সাতবার ঠপ-ঠপ করে পা ঠুকে-ঠুকে চটির ধুলো ঝাড়ল। তারপর তিন আঙুলে পাঞ্জাবির বুকের কাছটা ধরে খুব করে নেড়ে দিল। তারপর ধুতির কোচা ঝাড়ল। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ ঘাড় গলা ঘষে ঘষে মুছে রুমালটা গুনে গুনে ঠিক পাঁচবার ঝেড়ে পকেটে রেখে সে ভাবল, এই সব অবিচারের প্রতিকার কী? গেটে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিলাম নাকি!

বাজার পেরিয়ে তার বাড়ির গলি। বাজার মানে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িপাল্লা আর আলু-কুমড়ো নিয়ে বসে যাওয়া। একটা লরি আসছে দেখে প্রণব পিছন ফিরে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে পড়ল। যা ধুলো ওড়ায়!

গলির মুখে পৌঁছেই বছরের প্রথম কালবৈশাখী। কাঁকর মুখে এসে বিঁধছে। দুহাতে চোখ ঢেকে প্রণব সিঁটিয়ে রইল। বাড়ি গিয়ে প্রথমেই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ধুতি পাঞ্জাবি ঝাড়া তার রোজকার অভ্যেস। আজ প্রায় পাঁচ মিনিট সে জামা-কাপড় ঝাড়ল। তারপর সোজা বাথরুমে। কানে আঙুল ঢুকিয়ে চোখের সামনে নিয়ে দেখল, আঙুলে ধুলো। চৌবাচ্চায় জল নিচে গিয়ে ঠেকেছে। ঝুঁকে আঙুল ভিজিয়ে ভিজিয়ে নাক পরিষ্কার করল। চুলে মাথায় ভিজে হাত চালিয়ে সে প্রাণপণে নিজেকে ধুলোমুক্ত করে ঘরে ঢুকে দেখল, রমা নেই। পাশের বাড়িতে জোরে রেডিও চালিয়েছে, প্রণব গলা তুলে ডাকল, নির্মলা!

সেই যে দরজা খুলে দিয়ে কোথায় সেঁধিয়েছে, সাড়া নেই। আবার চেঁচায় নির্মলা! তুই কি বাড়ি আছিস না নেই?

নির্মলা হালুয়া আর চা নিয়ে ঘরে ঢোকে, চা এখানে দেব, না বারান্দায় খাবে?

—সেই কখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাস না? তোর বউদি কোথায় গেছে জানিস?

—বিকেলে বেরিয়েছে। আমি বাথরুমে কাপড় কাচ্ছিলাম। বলে গেল, ফিরতে দেরি হলে তোমাকে হালুয়া করে দিতে।

—নর্দমায় ফেলে দে!

নির্মলা জানে, এসব রাগ গায়ে মাখতে নেই। টেবিলের ওপর বউদির ছাড়া জামা-কাপড়, কালকুট্টি ব্রেসিয়ার। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে একহাতে ওগুলো সরিয়ে দিল। তারপর প্লেটটা রেখে বেরিয়ে গেল।

—শোন! ঝড়ের সময় রান্নাঘরের জানলা বন্ধ করেছিলি?

—না তো।

—ও, তবে তো ভালোই! একেবারে ধুলোর হালুয়া বানালেই পারতে! সুজি বেঁচে যেত।

রাগের মধ্যেই এক চামচ মুখে দিয়ে থু-থু করে ফেলে দেয়, ইশ! ধুলো কিচকিচ করছে।

—ও চিনির বালি। র্যা শনে এবার যা ময়লা চিনি দিয়েছে।

পাঁচ মিনিটের ঝড় কখন থেমে গেছে, চারদিকে শুধু ধুলোর গন্ধ। একা ঘরে চা খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে প্রণব নিরুপায় পায়চারি করে। জানলা দিয়ে ধুলোর গন্ধ নাকে লাগছে। বাসের ভিড়, ঝড়ে পড়ে দুপুরের অপমান সে এতক্ষণ ভুলে ছিল, ধুলোর গন্ধে পারচেজের দিলীপ কুণ্ডুকে মনে পড়ে গিয়ে তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। শীত গ্রীষ্ম বারো মাস চওড়া টাই পরা কুণ্ডুসাহেবের সামনে নিজেকে সে এখন দারুণ শক্তিশালী কল্পনা করল। নেতাজি বা ওই রকম কারও মতো। অপমানে তার বুকের মধ্যেটা জ্বলছে। পায়চারি করতে করতে প্রণব দাঁত চেপে উচ্চারণ করল, শুয়োরের বাচ্চা!

রমা ফিরল ঠিক নটায়। ঘরে ঢুকেই ধপ করে বসে পড়ল। পা মাটিতে, কোমর থেকে শরীরটা ভেঙে সাবধানে বিছানায় উপুড় হয়ে হাত দিয়ে কপাল টিপে রেখেছে। মুখ না তুলেই বলল, কখন ফিরেছ?

প্রণব সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকে। সাড়া না পেয়ে রমা মাথা তুলে ভুরু কোঁচকায়, তার চোখ হালুয়ার প্লেটে, একি, খাওনি?

— তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

— ডাক্তারের কাছে।

— আজ যাবার কথা ছিল?

— না, বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলুম, খুব একটা লাগেনি, কিন্তু খুব ভয় হল, পেটে একটা চিনচিনে ব্যথাও হচ্ছিল—

— একা গিয়েছিলে?

— আর কে আছে, কাকে নিয়ে যাব?

একেকবার রাগের সময় নিজের বোনের নাম প্রণবের কিছুতেই মনে পড়ে না, একটু সেকেলে, সাধুভাষা-ঘেঁসা, শুধু এইটুকু তার মনে থাকে, ছোট কোনও ডাকনামও নেই, কখনও কল্যাণী, কখনও অপর্ণা, যখন যেটা মনে আসে নিঃসংশয়ে বলে দেয় । সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল, শ্যামলীকে নিয়ে যেতে পারতে ।

— তুমি ফিরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে?

— আমার জন্যই নাহয় অপেক্ষা করতে;

— কবে তুমি গেছ? একবারও তুমি নিজে আমাকে ভালো কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছ?

বিরক্তিতে উঃ বলে রমা মাথা নামায় । দু দিকের রগ টিপে ধরেছে ।

— ওপর-ওপর দেখল, না শাড়িটাড়ি...

রমা মুখ তুলল না । তাতে প্রণবের রাগ আরও বেড়ে গেল । চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে সে আবার পায়চারি করতে লাগল । তার গলা প্রায় গর-গর করে উঠল, তোমরা মেয়েরা পারোও বটে ।

দশ মিনিট পরে রমা উঠল । রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে হালুয়ার প্লেটটা অল্প একটু ঠেলে দিয়ে খুব আস্তে বলল, খাবার দেরি আছে, এটা খেয়ে নাও ।

প্রণব তার পিঠের কাছেই দাঁড়িয়ে পড়ে, ওই ধুলোর পিণ্ডি আমি খাব না ।

রমা হঠাৎ ঝেঁঝে ওঠে, সারাজীবন ধুলো-ধুলো করেই গেলে!

প্রণব প্রায় ভেংচায়, না— ধুলো জিব দিয়ে চাটব, ধুলোয় চিতিয়ে থাকব! শুধু মুখে সাবান মাখলেই হল, না?

ধুলোর খোঁটায় তার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে । ছিয়াশি লক্ষ সত্তর হাজার তিনশো এগারো টাকা উনিশ পয়সার হিসেব মেলাতে আটত্রিশ পয়সার গোলমাল কার না হতে পারে তাও যদি অ্যাডিং মেশিন থাকত! এই সামান্য ভুলের জন্য ব্যাটা কুণ্ডু তাকে এক ঘর লোকের সামনে বলতে পারল, অ্যাকাউন্টস ছেড়ে সুইপারের কাজ করলেই আপনাকে ঠিকমতো মানায় । সারাদিন তো দেখি শুধু ধুলোই ঝাড়ছেন ।

তার টেবিল সে দুবার ছেড়ে দুশো বার পরিষ্কার করবে, তোর বাপের কীরে শালা! মানুষের নাকে-মুখে ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চড়ে বেড়ালেই তুমি কিছু মানুষের বাচ্চা হয়ে যাও না। কর্তাদের জুতোর ধুলো চেটে ওরকম অফিসার সবাই হতে পারে।

প্রণব ঘর ছেড়ে অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করছিল, রমাকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরের দিকে যেতে দেখে বলল, ঘরে নার্স-টার্স কেউ ছিল, না ডাক্তার একাই সব দেখল?

রমা রাগে ছটফট করে ঘরে ঢুকে গেল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে কুঁজো থেকে গেলাশে জল ঢালতে ঢালতে নির্মলাকে বলল, আমি খাব না। রান্না হলে তোর দাদাকে খেতে দিয়ে তুই খেয়ে নিস।

ঢকঢক করে জল খেয়ে ঘরে ফিরে আলো নিবিয়ে দিল।

প্রণবের তখন আরও রেগে উঠতে ইচ্ছে করছে। রাগে ফেটে পড়তে পারলে বাঁচা যায়। রেডিওয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরোধের আসর হচ্ছে। তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে। মাথায় রাগ নিয়েই সে গানটার দুয়েক কলি শুনল। এইসব গান এখানে মানায় না। কলকাতা একটা বিষাক্ত শহর। এর হাওয়ায় রাশি রাশি ধুলো। সেঁকো বিষ!

খুট করে আলো জ্বলে উঠল। নির্মলা টান-টান করে চুল বেঁধেছে, মুখে ঘাম। শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে বলল, তোমার খাবার দিই?

— ফের শাড়িতে হাত মুছছিস? যা, আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আয়।

আরও ছ-সাত বার বারান্দার এমাথা-ওমাথা করে প্রণব ক্লান্ত হয়ে ভাবল এতো রাগ নিয়ে মানুষ বাঁচে! রোজ সেই রাগ আর জ্বালা আর ক্লান্তি। সেই ধুলো আর অপমান। বারো মাস তিরিশ দিন ঠিক এক ছকে জীবন বয়ে চলেছে।

বারান্দার ওমাথায় পৌঁছে এই প্রথম তার তারা ভরা আকাশ চোখে পড়ল।

অন্যমনস্কভাবে এক পলক তাকিয়ে প্রণব গা-ঝাড়া দেবার চেষ্টা করল, না, আর এই তিতিবিরক্ত দিন কাটানো নয়, কালই একটা হিন্দি ফিল্ম দেখতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে এবার থেকে রোজ সে ব্রিজ খেলবে। ফ্ল্যাশ খেলে পয়সা করতে পারলে আরও ভালো। রমার জন্য ছোটখাটো একটা নার্সিং হোমের ব্যবস্থা করা যায় না? কত টাকা লাগে? অফিসে লোন পাওয়া যাবে না? হাতে চার মাস সময়।

রেডিওয় তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় শুনে প্রণব খুব শান্ত হয়ে ভাবল, সে অন্য ধুলো। কলকাতার ধুলোয় রবীন্দ্রনাথ একেবারে বেমানান। এই শহরে এখনও যে মানুষ জন্মায় সেটাই আশ্চর্যের।

ভেজানো দরজা ঠেলে প্রণব ঘরে ঢুকল । অন্ধকার । চোখ সয়ে আসতে দেখল, রমা নিজের জায়গায় শুয়ে আছে । অন্ধকারেই সে রমার কপালে হাত রেখে আস্তে করে ডাকল, রমা ।

সাড়া নেই ।

— রমা! ওঠো! খাবে না? রমা, ও রমা—

রমা ঘুম ভেঙে উঃ করে উঠল, জড়ানো গলায় বলল, আমাকে একটু ঘুমোতে দাও ।

— দেব, দেব । বলে হঠাৎ সে রমার কপালে চুমু দিল । তারপর দুহাতে তার মাথাটা ধরে কপালে গালে নাকে গলায় পাগলের মতো চমু খেতে লাগল ।

— আঃ! কী কর, ছাড়ো!

গলার স্বরে প্রণব মাথা ছেড়ে দিয়ে স্থির হয়ে গেল । খানিক ওই রকম বসে থেকে বলল, ডাক্তার কী বলল? কোনও ড্যামেজ হয়নি তো?

রমা বাহুতে চোখ ঢেকে ছিল, হাত না সরিয়েই বলল, হলে তো বেঁচে যেতাম ।

— সে কি! তুমি ছেলে চাও না?

রমা চুপ করে রইল । প্রণব পুরোপুরি বিষণ্ণ গলায় বলল, রমা, রাগ করে থেকো না । সারাদিন আমি একটা খ্যাপা কুকুর হয়ে ঘুরে বেড়াই । তারপর তুমিও যদি—

ছেলেবেলা থেকেই প্রণবের অভ্যেস, বাক্য শুরু করলে শেষ করবেই । বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে তার সেই ক্ষমতা কমে আসছে জেনেও সে এখনও খুব চেষ্টা করে । আজ কথা শেষ না করে আস্তে উঠে গিয়ে চেয়ারে বসল । হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল ।

চোখে আলো লাগতে রমা দেওয়ালের দিকে ফিরে শুলো ।

পিছন ফিরে তার শুয়ে থাকার ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর । ঢেউয়ের মতো গড়ন । হাঁটু মুড়ে শুয়েছে । প্রণব সিগারেট খেতে খেতে আলগাভাবে চেয়ে থাকে । পায়ের কাছে শাড়ি উঠে গেছে, এক পায়ের গোছ দেখা যায় । হঠাৎ তার চোখ জ্বলে ওঠে । বাইরের শাড়ি বদলেছে, শায়া পালটায়নি । লেসের কাছটা ধুলোয় কালো হয়ে আছে ।

প্রণব রাগ চাপবার চেষ্টা করে, একি, রাস্তার শায়া নিয়ে বিছানায় উঠেছো!

রমা হয়তো ঘুমিয়ে গেছে, কিংবা ইচ্ছে করেই সাড়া দিল না ।

প্রণব প্রাণপণে রাগ চাপে, রমা, ওঠো শায়াটা ছেড়ে ফ্যালো । রাস্তার ধুলো একেবারে কামড়ে বসেছে ।

রমা নড়ল না । প্রণব একলাফে বিছানার কাছে এসে গর্জন করে উঠল, ওঠো, ওঠো বলছি! বিছানায় রাস্তার কাঁচা ধুলো লেপে না দিলে মন ভরে না, না? প্রণব মারবে বলে হাত তোলে ।

রমা ঝটকা দিয়ে উঠে বসে বিছানা ছেড়ে ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । অল্প অল্প হাঁফাচ্ছে ।

শাদা চাদরে চোখ রেখে প্রণব গজগজ করে, আর কদিন পর এখানে একটা বাচ্চা শোবে, সেটা পর্যন্ত খেয়াল থাকে না । এমনিতেই ধুলো বাঁচিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব, শহরময় শুধু ধুলো আর ধুলো, একেবারে সেঁকোবিষ!

রমা ঘরের কোণ থেকে ফুঁসে ওঠে, ওই ধুলো ধুলো করেই মরো! বাচ্চা শোবে! কী খাওয়াবে তার ঠিক নেই, একটা ডাক্তার দেখাবার মুরোদ নেই, শুধু ধুলো ধুলো করে নাচলেই হল! বোনটাকে তো ঝি বানিয়ে ছেড়েছো!

প্রণব এত উসকানিও উপেক্ষা করল । আগে বিছানাটা ঝাড়তে হবে । সে ঘরে পরার ধুতি নিয়েও কখনও বিছানায় ওঠে না । খালি গায়ে, শুধু আন্ডারওয়্যার পরে শোয়াই তার অভ্যাস । দুটো হ্যাঁচকায় ধুতি খুলে ফেলে সে বিছানায় উঠল । হাঁটু মুড়ে ঘুরে ঘুরে দু-হাত দিয়ে বিছানার চাদর পরিষ্কার করতে করতে অনেকটা আপনমনে বলল, ঘুষখোর কুণ্ডুটা না মরলে আমার আর প্রমোশনের আশা নেই ।

দু-হাতের পাতা ধুলোয় কিচকিচ করছে । গা শিরশির করে ওঠে । পাছে গায়ে লেগে যায়, হাত-দুটোকে সাবধানে তুলে ধরে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে প্রণব ফিরে দাঁড়াল, ডাক্তার দেখাচ্ছি না তো কী! ডাক্তারের কাছে আজ যাওনি তুমি?

— তুমি টাকা দিয়েছ? এই তিনবারের একবারও তুমি টাকা দিয়ে গিয়েছিলে আমায়?

রমা উল্টোদিকে মাথা দিয়ে বিছানায় ধপ করে শুয়ে পড়ে থরথর করে কেঁদে উঠল, বিনা পয়সায় দ্যাখে, পরীক্ষার ছুতো করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—

কান্নায় খাটসুদ্ধু নড়তে থাকে ।

প্রণব হাতের ধুলো ভুলে দৌড়ে এসে রমার পিঠে হাত রেখে একদম বোবা হয়ে থাকে । তার হাত রমার পিঠে ঝাঁকুনি খায় । ওই রকম বসে থেকে একসময় প্রণব তার ধুলোমাখা হাতের পাতায় মুখ ঢেকে ফস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ।

প্রথম প্রকাশ : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯

# স. ্যাসীর পুঁথি

## মা আজ কোন পুকুরে

— ভাদ্দর শেষ । এখনও আমনের শিষ ধরল না, চারাগুলোকে তো ন্যাবায় ধরেছে । অঘ্রাণে ধান উঠবে? ছাই । এ বছরটা ছাই খেয়ে থাকিস ।

খেতের ধারে উবু হয়ে বসে বাবা তামাক খায়, যেন হুঁকোটার ওপর রাগে গরগর করছে ।

আমার মাথায় উত্তর ফুটতে থাকে, হ্যাঁ গত সনে তো রোজ গরম ভাতে ঘি খেয়েছি!

— চোপ । যে শালা শুধু যাত্রার পালা বাঁধে, তার মুখে আবার গরম ভাতের বাক্যি! তোমার ওই লেখাপড়ার মুখে লাথি । দু-দুটো পাশ দিয়ে চাকরি করে কত বস্তা বস্তা টাকা আনছো । চাষীর ব্যাটা দু প্যাকেট কীটনাশক গুঁড়ো যোগাড় করতে পারিস না? সরকারে লেখালেখি করে একটা শ্যালো বসাতে পারলে গতবার খেতের ধান অমন খেতে জ্বলে যায়!

একটা মানুষ কত বছর আশায়-আশায় দিন কাটাতে পারে? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকল, এখনও শেয়াল-শকুন চেনে না । মহাজন যেন জন্মে দেখেনি । তবু কি কিছু শিক্ষা হল! নিজের জীবনটা মাটি, এখন আমার ভবিষ্যৎ মাটি না করে ক্ষান্তি দেবে না ।

আমি পায়ের চাপে চাপে তালের ডোঙায় জল সেঁচতে থাকি । ন মাসের পোয়াতির ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া, আর খিদেয় গর্তে ঢোকা পেট নিয়ে খেতে জল সেঁচা একই কথা । কপালের নোনা ঘাম আমার গাল বেয়ে মুখে ঢুকছিল । সারা গা জ্যাবজেবে, কালঘাম, কোথায় যেন পড়েছি, এই?

হুঁকো রেখে বাবা আবার লাঙল তুলে নেয় । কলাই বুনবে । ল্যাজে পাক দিয়ে বলদের পাছায় জোর চাপড় মারে, আর মুখে তো সুমুন্দির পো লেগেই আছে । আমাকেই বলে— আর এ তো কেনা বলদ ।

নালির কাছ দিয়ে ঘোরবার মুখে বাবা গলা নামায়, জোরে পা চালা বাপ! শ্রমের অন্ন । শ্রম-ভেন্ন কে কবে পায়?

বাবা সেই ন্যালা-ক্যাবলাই রয়ে গেল । তোমার গতর দিয়ে ফলানো ধান তুমি খাও? তোমার পরিবার খায়? তোমার ছেলেমেয়ের শরীরে গত্তি লাগে? এসব কথা পুলিনের । একবারে খাঁটি কথা । জন্ম থেকে তো দেখছি ।

কোঁচ-বেঁধা শোল মাছের মতো পেটের নাড়িভুড়ি উলটোচ্ছে । মা আজ কোন পুকুরে কে জানে । কদিন আগেও যেত পদ্মপুকুরে । এক পুকুরে কত আর শাপলা-কলমি গজাবে । গেঁড়ি তুলতে হয় হাঁস তাড়িয়ে । আর মাও কিছু একা নয় । এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে অনেক বউ-ঝি যায় পদ্মপুকুরে গেঁড়ি তুলতে । বিশ্বেস বাড়ির হাঁসের পাল তো আছেই ।

বাবা আরেক চক্কর মেরে, আমার কাছ দিয়ে যাবার সময় খিঁচিয়ে ওঠে— মুতছিস নাকি? এই জলে মাটি ভিজবে? জোরে জোরে দাপাতে পারিস না?

— মূর্খের মতো কথা বোল না! রেল চালাতেও কয়লা লাগে । কাল থেকে পেটে একটাও দানা পড়েছে, যে জোরে দাপাতে বলো?

— বাপকে মুখখু বলিস!

বেশ দমে গেছে । আর কোনও কথা না বলে হেই-হেট হেই-হেট করতে করতে বাবা ঘুরতে থাকে ।

## শায়ার নিচে পাঁপড়

গোলাপী বাড়ির দিকে যাচ্ছিল । আমি ডাকতে গিয়ে দেখি, ও-ও এদিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটছে । ওর কাছে নিশ্চয়ই পাঁপড় আছে । অন্য দিন ফেরে সন্ধে পেরিয়ে । টাউন থেকে বাসে লক্ষ্মীপুর । সেখান থেকে এক ক্রোশ হাঁটাপথ ।

— আজ যে তাড়াতাড়ি ফিরলি?

— মালিকের বাপ মরল খানিক আগে ।

— পাঁপড় আনিসনি?

বাড়ি গিয়ে সেঁকে পদ্মকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব ।

গোলাপী আমার থেকে দু-বছরের ছোট । পদ্ম চার বছরের । পদ্ম মুখে রোজ হলুদ বাটা মাখে । সকাল থেকে মেখে বসে থাকে, চানের সময় গামছা দিয়ে মুখ ঘষে । মার মুখঝামটা খায় ।

বাবা মাঝমাঠে । আমি চেঁচিয়ে বললুম, আমি ঘরে যাচ্ছি ।

হেই-হেট, হেই-হেট। আমার কথার উত্তর নেই।

— জানিস ভরত, বাবার বুকের ব্যামো হয়েছে। গয়েরে ছিট-ছিট রক্ত দেখেছি। টাউন থেকে পরশু হোমিওপ্যাথি এনে দিয়েছিলাম, খায়নি। পুকুরে ফেলে দিয়েছে।

— আমার, তোর, পদ্মর, দিদির, মার সকলেরই হবে।

— কী অলুক্ষণে কথা।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আমি গোলাপীর পেটের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করি— কটা রে?

— আজ বেশি সরাতে পারিনি। বুড়ো মরেছে, মেয়ে-জামাইয়ের দল ভিড় করে দেখতে এসেছে।

— একটা বার কর। আমার নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেল।

— কাঁচা খাবি?

— ইঁদুর-আরশোলা তো নয়। একদিন মানুষকে তাও খেতে হবে। যেভাবে চলছে। দেখিস।

বাঁহাতে শায়ার দড়ি টেনে ধরে ডানহাত ভেতরে ঢুকিয়ে গোলাপী সবে কাগজে মোড়া পাঁপড় বার করছে, সামনে বিশ্বেসবাড়ির মুকুলকে আসতে দেখে হাত বার করে আনল। মুকুল আমাদের কাছাকাছি এসে এক পা মাটিতে রেখে সাইকেলে হেলে বসে থেকে বলল, সন্ধেবেলা বাড়িতে নামগান হবে। হরির লুটের পেসাদ নিতে সবাই মিলে যাস।

গোলাপীর দিকে তাকিয়ে প্যাডেলে পা তুলে দিল।

— বদমাশের ধাড়ি। সেদিন, জানিস ভরত, লক্ষ্মীপুরের রাস্তায় আমাকে বলে এতটা হাঁটবি কেন, সাইকেলে ওঠ, বাড়ি পৌঁছে দেব।

কাঁচা পাঁপড় দাঁতে সেঁটে যায়। চিবোতে চিবোতে আমি বলি, তুই কী করলি?

— মুখে ঝামা ঘষে দিলুম। বললুম, আপনার শ্বশুরের সাইকেল, আপনিই চড়ুন। সিগ্রেট খাচ্ছিল, বললে, তুই সিগ্রেট খাস? খা না একটা। বেশ্যাপাড়ায় যায়, ওদের দ্যাখে তো। আমি চলে আসছি, সন্ধেবেলা ওই রাস্তাটা কীরকম ফাঁকা থাকে জানিস তো, বদমাশটা পিছন থেকে এসে খপ করে আমার কাঁধ ধরে বললে, চড়ে বসে সামনের হ্যান্ডেল দুটো ধারে থাক, দশ মিনিটে গাঁয়ে পৌঁছে যাবি। নাক দিয়ে ফস ফস করে নিশ্বাস ফেলছে। এমন ঝটকা মেরেছি, সাইকেল সুদ্ধু বাবু কাত।

গোলাপীর বলবার ভঙ্গি দেখে আমার হাসি পেয়ে যায় । আমার তিন বোনের মধ্যে ওর সঙ্গেই আমার যা একটু সুখ-দুঃখের কথা হয় । পদ্ম তো সারাদিন গায়ের রং ফরসা করতেই ব্যস্ত । সাজগোজের দিকে ওর খুব ঝোঁক । আর দিদি কেমন যেন হাবাগোবা । বিয়ের পর বছর না ঘুরতেই শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আসে । ওর শাশুড়ি ওর বাঁহাত ভেঙে দিয়েছে, গাছের ডালের মতো হাতটা সবসময় বেঁকে থাকে ।

একটা কাক আমার হাতের পাঁপড় ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ।

গোলাপী হঠাৎ হাসতে হাসতে কোমর ভেঙে হাসির ধকল সামলাতে চেষ্টা করে ।

— খেতে খেতেও তুই পালা বাঁধিস নাকি রে? কাকে এসে হাত থেকে পাঁপড় নিয়ে যায়, কীরকম ব্যাটাছেলেরে বাবা! হিহিহি— হিহি—

আমড়া গাছে বসে কাকটা একবার পাঁপড় ঠোকরায় আর একবার ঘাড় বেঁকিয়ে আমাদের দিকে তাকায় ।

গোলাপী ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে কাকটার দিকে ছোড়ে । ঢিল অনেক নিচ দিয়ে বেরিয়ে গেল । কাক ঘাড় ঘুরিয়ে লক্ষ করে । দুবার কা-কা করে । আমড়া গাছের মাথায় আকাশের একটা কোণ কালো হয়ে আসছে । হাওয়া না দিলে বিকেল নাগাদ বৃষ্টি হবে । বাঁচা যায় ।

## রহিমচাচার সংসার

রহিমচাচা তার ছেলেমেয়ে বিবি নিয়ে ইস্টিশানের দিকে যাচ্ছিল । হাতে-হাতে পোঁটলা-পুঁটলি, ছেঁড়া মাদুর, মাটির হাঁড়ি, গরিবের যাকিছু সম্বল ।

— ও রহিমচাচা, চললে কোথায় গো?

গোলাপীর কথায় চাচি ঘোমটা সরিয়ে তাকায় । চোখে মৃত্যুশোক । কোনওরকমে কান্না চেপে আছে ।

ছোট ছেলে শকলু মাথায় তাদের রান্নাঘরের দরমার বেড়াটা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, রহিমচাচা ডাক দেয়— একটু আস্তে আস্তে চ, বাপ ।

আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, কলকাতায় একটা চাকরির বেবস্থা হয়েছে । সোডা-আইসক্রিমের কলে ।

— মিছে কথা! আমরা কলকাতা যাচ্ছি ভিক্ষে করতে। আম্মা, আব্বাজান, আমি, শকলু আস্তায় আস্তায় ভিখ মেগে বেড়াব। এতক্ষণে বুঝলে ভরতদা!

সাকিনা এমন ফটফট করে কথা বলতে শিখল কবে? খুব তেল দিয়ে টেনে চুল বেঁধে লম্বা বিনুনি ঝুলিয়েছে। শাড়িটা ছেঁড়া-ফাটা, কিন্তু জেল্লাদার। ওর মার শাদির নিশ্চয়ই। এই ক-মাস আগেও মেয়েটা ইজের পরে খালি গায়ে ঘুরত। একবার পদ্মপুকুরে পায়ে শাপলা জড়িয়ে ডুবে যাচ্ছিল, আমি ঝাঁপিয়ে পাড়ে টেনে তুলি।

গাঁয়ের কেউ কেউ কলকাতায় কল-কারখানার কাজ নিয়ে চলে গেছে ঠিকই। কারখানা মানেই শোষণ, পুলিন বেশ বুঝিয়ে বলতে পারে, তা হোক, তবু দু-মুঠো খেতে তো পায়। পরের জমিতে উদয়াস্ত খেটে বছরভর দু-বেলা অন্ন জোটে? লজ্জায় রহিমচাচা আইসক্রিম কলের গল্প বানাল। আমি সাকিনার কথা যেন বিশ্বাস করিনি, রহিমচাচাকে বললুম, লাঙল-বলদ তবে বেচে দিলে?

— কী করি? কলকাতা শহরের চাকরি, ওসব দিয়ে আর কী করব?

— তোমার বিঘে-কতক নিজের ছিল না?

— ছেল তো কত বিঘেই!

কলকাতায় গিয়েই কি ওরা খেতে পাবে? লোকেরা তো সব নিরন্নের জন্য থালায় থালায় গরম ভাত বেড়ে বসে আছে! গোলাপীকে ফিস-ফিস করে বললুম, কখানা পাঁপড় দিয়ে দিবি? এক গাঁয়েরই তো লোক!

গোলাপী বিরক্ত হয়। আমার দিকে রুক্ষ চোখে তাকিয়ে বলে, তোর আবার সব তাতেই আদিখ্যেতা!

চাচি একবার পিছনের দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল। ঘোমটার ফাঁকে একবার আমাকে দেখল, একবার গোলাপীকে দেখল, একবার এই গাছটা, একবার ওই গাছটা, একবার আকাশটা দেখল। তারপর ঘোমটায় মুখ ঢেকে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

শকলু পিছন ফিরে হাঁক পাড়ে, তোমরা কি দেঁইড়েই থাকবে নাকি?

রহিমচাচাও তাড়া লাগায়, চ, চ। এটু পা চালা। পানি হতে পারে।

গোলাপী পাঁপড় বের করে গুনতে গুনতে হাঁটছিল । গোনা শেষ করে বলল, তুই যে বড় খেত ছেড়ে ঘরে চললি?

— আমার কিছু ভালো লাগে না । শোন গোলাপী, একটা কথা আমার মনে লাগছে । আমাদেরও একদিন ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে গিয়ে ভিক্ষে করতে হবে । দেখিস ।

— তোর শুধু অলুক্ষণে কথা । একটা চাকরি পেলে দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে । বাবা চাষকাজ নিয়ে আছে, আমি কাজ করছি, তুই চাকরি করবি, মা, দিদি, পদ্ম ঘরের কাজ করবে । ধান মাড়াই করা, ধান সেদ্ধ করা, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া । তারপর সবাই মিলে উলু দিয়ে ঘরে বউ আনব । বউ এসে গাই দুইবে, ঘুঁটে দেবে ।

গোলাপী হাসে । ওর চোখে কৌতুক । আমার মনে ভয়, রাগ, দুঃখ, আনন্দ, মায়া, ভালোবাসা, কতরকম ভাব যে মেশামেশি হয়ে লেপটে যায় । এই একরকম, এই আরেক রকম । একই সঙ্গে কত রকম । আমি নিজেই দিশে পাই না । অনেক কথা আমার মনে আসে । সেসব আমার লিখতে ইচ্ছে করে । আমি গুছিয়ে লিখতে পারি না । কখনও কখনও লিখতে চেষ্টা করি । তখন খুব উত্তেজনা লাগে, মনে হয়, এবার পারছি । খানিক লিখে দেখি, দূর! হল না, কিছুই হল না । আমি ইস্টিশানের বিপিন দাসের পত্রিকা-স্টলে নানা রকমের পত্রিকা পড়ি । একেকবার একেকজনের কোনও একটা গল্পের মতো লিখতে যাই । হয় না । আমার জ্যাঠা ‘অভিশাপমালা’ নামে একটা পুঁথি লিখেছিল । প্রায় হাজার পাতা । আমার জন্মের আগেই মানুষটা সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায় । সেই পুঁথি আমার মুখস্থ । আমি সেরকমও লিখতে পারি না ।

আমার জামাইবাবুকে আমি ঘেন্না করি । ওর কথা লিখতে ইচ্ছে করে । আমার দিদির অনেক দুঃখ । হাবাগোবা বলে সবটা বোঝে না । বাবা সারা জীবন কিছু পায়নি, শুধু আশায় আশায় থাকে । আমার মা কী সুন্দর আলপনা দিত । লক্ষ্মীপুজোয় । তখন বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হত । উঠোন থেকে ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত মা লক্ষ্মীর পা আঁকত । ছোটবেলায় মার মুখে সবসময় ঘোমটা । কলসি-কাঁধে পুকুরে জল আনতে যেত বুক অব্দি ঘোমটা টেনে । কথা বলত আস্তে আস্তে, মিষ্টি গলায় । মুখখানা পদ্মপাতার মতো । এখন মার হাতের শিরাগুলোয় চোখ পড়লে কষ্টে আমার দম আটকে আসে । গালে গর্ত, সারা শরীরের হাড় খরখরে চামড়ায় ঢাকা । তার ওপর শতছিন্ন একটা ন্যাতা কোনওরকমে জড়ানো ।

আমি আর গোলাপী বাড়ি ঢুকছি, দেখি উল্টোদিকের পথ দিয়ে মা আসছে । ভিজে কাপড় । গায়ে লেপটে আছে । এক হাতে কচুপাতায় শামুক গেঁড়ি, ফাঁক দিয়ে একটা কাঁকড়া দাঁড়া বেঁকাচ্ছে, নিশ্চয়ই মার আঙুল খুঁজছে, শোধ তুলতে চায় । কাঁকড়া মা আমার পাতেই দেবে, আমি জানি । তার ওপর শাড়ির খুঁটে চাল বাঁধা । আজ তাহলে একমুঠো হোক, আধমুঠো হোক, গরম ভাত কপালে নাচছে । কিন্তু চাল মা জোটাল কোত্থেকে? না বলে পারলুম না— চাল কোথায় পেলে?

মা আমার কথার উত্তর দিল না । গোলাপী বলল, ওই কটা চাল কার মুখে দেবে? বাজারে কিনলে নাকি?

— হ্যাঁ, তোরা তো কত টাকা ঘরে আনছিস!

গোলাপী ভুরু কোঁচকায়, তুমিও কি বিশ্বেসবাড়ি মুড়ি ভাজতে যাচ্ছ নাকি?

মার নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছিল । বাঁহাতে নাক ঝেড়ে বলল, কোন চুলোয় যেতে আর বাকি রাখলাম! পেটে ধরেছি, মরি-বাঁচি, দু-মুঠো ভাতের চেষ্টা তো করতে হবে । তোদের বাপ তো ওই একফালি জমি চষেই জীবন কাটাবে ।

দিদি এক মনে দেওয়াল নিকোচ্ছিল । ওর ওই এক স্বভাব । যখন যেটা করবে, তন্ময় হয়ে । মাটি আর গোবব-গোলা জলের হাঁড়ি ন্যাতা-ধরা হাতেই টেনে-টেনে নিয়ে এগোয়, বাঁহাতে জোর পায় না । দেওয়ালের একটা দিক শুকিয়ে সাদা ফুটফুট করছে । ভিজে দিকটা কাদা-কাদা । একবার বসে, একবার দাঁড়িয়ে দিদি দেওয়াল লেপছিল । বোধহয় হাঁড়ির জল ফুরিয়েছে, দাওয়া থেকে নেমে হাঁড়িটা নিয়ে পুকুরের দিকে গেল । আমরা ঘরে ফিরছি, ওর চোখেই পড়ল না ।

পদ্ম চান করে ফিরছিল প্রায় দৌড়তে-দৌড়তে, দিদির মুখোমুখি হতেই হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে বলল, ও দিদি, আমার সাবান পুকুরে পড়ে গেছে!

পদ্ম সাঁতার জানে না । দিদি ডুব সাঁতারে পুকুরের ওপারে গিয়ে ওঠে । ভাঙা হাতে এখনও চিৎ সাঁতার দেয়, যেন আলগা ভেসে আছে । পদ্মকে শান্ত গলায় বলল, চ দেখি ।

মা পিছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, এই পদ্ম! পুকুরে যাবি না । কাপড় ছেড়ে উনুন ধরা এসে ।

দিদির কিছু কানে যায় না, এগিয়ে যায় । পদ্ম ফিরে দাঁড়ায় । কয়েক পা পিছিয়ে এসে বলে, সাবানটা পড়ে গেছে । দিদিকে জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েই আসছি ।

— না, যাবি না। গেরস্ত ঘরের মেয়ে, দিন-রাত শুধু সাবান, হলুদ-বাটা, পাউডার। এত বড় ধিঙ্গি, একদিন দুটো নুড়ো জ্বেলে ভাত ফোটাতে পারিস না!

মা গজগজ করে। পদ্ম ভিজে কাপড়েই জ্বলে ওঠে, আগুনের সামনে আমি বসতে পারব না।

— কেন পারবি না? রোজ তোকে কে রেঁধে খাওয়াবে। কানীর আজ শরীর খারাপ, ও পারবে না।

কানী মানে কামিনী। দিদির ডাকনাম।

দিদি অনেকটা এগিয়ে গেছে। পদ্ম সেইদিকে একবার তাকিয়ে গোলাপীকে দেখিয়ে মাকে বলল, ও তো এসে গেছে।

মা ঝেঁঝে ওঠে, ও কি পাড়া বেড়িয়ে এল? দূর হয়ে যা, পাজি, পোড়ারমুখী, যমের অরুচি!

মা প্রায় মারতে ওঠে, পদ্ম কাপড় সপসপিয়ে পুকুরের দিকে দৌড়োয়।

মা পিছন থেকে দাঁতে দাঁত ঘষে, মর, মর, মর, হারামজাদি! মর! ওই সাবান নিয়ে চিতেয় উঠিস।

## হলদে পোস্টকার্ড

গোলাপী ঘরে ঢুকে শাড়ি বদলে চাল ধুতে যায়। বাইরের ব্লাউজটাও বদলে এসেছে। মা আঁচল খুলে চাল দেবার সময় মাটিতে কয়েকটা দানা পড়ে গিয়েছিল, উবু হয়ে বসে খুঁটে-খুঁটে চাল তোলে। কাঠকুটো জড়ো করে উনুনের কাছে গিয়ে আমাকে বলল, দে তো ভরত, তোর দেশলাইটা।

আমি দেশলাই বার করে দিয়ে গোলাপীর পাঁপড়গুলো চাটাই পেতে রোদে দিই। একটা পাঁপড় নিয়ে একটু একটু করে দাঁতে কাটি আর বসে বসে পাখি তাড়াই। উঠোনে সজনে গাছের গোড়ায় একটা পোস্টকার্ড পড়ে আছে। নিশ্চয়ই পিওন ফেলে গেছে। লোকটা গরিব-গুরবোদের বাড়ি ঢোকে না, রাস্তা থেকে চিঠি ছুড়ে দিয়ে চলে যায়। খোদ সরকারের পিওন তো! আর দিদির যা খেয়াল, তুলে নিয়ে ঘরে রাখবে? বাড়িতে চিঠি এসেছে, সে-খবরই ও রাখে না।

বিকাশের চিঠি। ১৬ তারিখে এখানে আসবে লিখেছে। বেড়াতে। খাবে কী? তক্ষুনি আমার দুশ্চিন্তা শুরু হল। এক যদি টাকা-পয়সা সঙ্গে আনে। তা নিশ্চয়ই আনবে। ওদের

তো আর আমাদের মতো অবস্থা নয় । ওর বাবা টাউনে বি ডি ও ছিল । বিকাশ-প্রকাশ দুই যমজ ভাই আমাদের ইশকুলে পড়ত । দুজনেরই ফর্সা টকটকে রঙ, সুন্দর স্বাস্থ্য । বিকাশ পড়তো আমার ক্লাসে, প্রকাশ ফেল করে এক ক্লাস নিচুতে । ওদের বাবা ঘুষ খেয়েছিল না কী করেছিল, সাসপেন্ড হয়ে কলকাতায় চলে যায় । ওরাও আমাদের স্কুল ছাড়ে ।

চিঠি পড়ছি, সেই সুযোগে তিনটে চড়ুই পাঁপড় ঠোকরাতে লেগেছে । আমি পোস্টকার্ড দিয়েই তাড়া লাগাই ।

## বাবার দিনপঞ্জি

কলাইয়ের থালার ফুটো দিয়ে গেঁড়ির ঝোল গড়িয়ে দাওয়ায় ভিজে গোল দাগ ফোটে । চোখ পড়তেই আমি থালার নীচে একটা মাটির ঢেলা গুঁজে দিয়ে ফুটোর দিকটা উঁচু করে দিই । ভাত থেকে ধোঁয়া উঠে রোদের ফালিতে লেগে ফালির আকারে নাচতে থাকে । গরম ভাতে জিভ জ্বলে যায় আমি তবু হাত পুড়িয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকি । কাঁকড়ার নরম ঘিলু ঠোঁটে জিভ লাগিয়ে টেনে নিই ।

মা আরেকটা থালা আমার পাশে ঠক করে নামিয়ে রেখে বলল, খেয়ে নিয়ে মাঠে দিয়ে আসিস । উপোসে ধুঁকছে, তবু নিজে একবার ভাতের খোঁজে আসবে!

ভাতে গর্ত করে গেঁড়ির ঝোল ঢেলে দিয়েছে । ওপরে কাঁকড়ার দুটো দাঁড়া । দাঁড়ার শাঁস খুব সুস্বাদু, মা আজ বাবাকে দিয়েছে । এক পাশে রোদে-সেঁকা চারখানা পাঁপড়, নুন, কাঁচালঙ্কা ।

দিদি পাতাসুদ্ধ জলপদ্ম এনেছিল, গোপালের পুজোয় লাগে । গোপাল মানে পুরনো ক্যালেন্ডারের গোপ-বালক কৃষ্ণ । আমি পদ্মপাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে বাবার থালা ঢেকে মাঠের পথ ধরি । এক হাতে পাতা চেপে রাখি । কাককে বিশ্বাস কী?

মাঠের কাছে এসে দেখি একটা লোক বাবার সঙ্গে কী সব কথা বলছে । প্যান্ট-শার্ট পরা । নিশ্চয়ই কলকাতার লোক । বাবাকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরাল । কী মতলব কে জানে ।

আমি কাছে গিয়ে বললাম, কোথা থেকে আসছেন?

আমাকে এক পলক দেখে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার । ওনার মুখ থেকে ওনার জীবনের কথা শুনব বলে কলকাতা থেকে এসেছি ।

— বাবাকে আপনি চিনতেন?

— না, না। আমি ঘণ্টাতিনেক আগে ট্রেন থেকে নেমেছি। একজন প্রবীণ কৃষকের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ওঁকে লাঙল দিতে দেখে—

বাবা বলল, ভাত নামিয়ে রাখ। কথাবার্তা সেরে খাব।

আমি বললাম, আপনি কী জানতে চান?

— তুই থাম।

সিগ্রেটে টান দিয়ে বাবা লোকটাকে বলল, তা বলেন, কী জানতে চান।

— আপনি কখন দিন শুরু করেন?

— তা ধরুন সূয্যি উঠলে আর বসে থাকার উপায় নাই।

— ভোর থেকে রোজ আপনি কীভাবে কাটান?

— ভোরের বেলা ঘুম থেকে উঠে গরু-বাছুরকে খেতে দিই।

— আপনি খাওয়াদাওয়া করেন কখন?

— ধরুন বারোটাও হয়, একটাও হয়, দুটোও হয়।

কতদিন যে কিছুই জোটে না বাবা সেকথা বলল না। বাবা লাজুক ধরনের, অভাব-অনটন বাইরের লোকের কাছে ভাঙতে পারছে না। লোকটা খসখস করে বাবার কথাগুলো লিখে নিচ্ছিল, বলল, দুপুরে খাওয়ার পর আবার কাজ করেন, না বিশ্রাম নেন?

বাবা আবার মিথ্যে বলল, যেন দুপুরে বিশ্রাম করাটা বেশ একটা মান-মর্যাদার ব্যাপার, বলল, এই ধরুন, ঘণ্টা-দুই বিশ্রাম নি।

— সন্ধেবেলা বাড়িতে কিসের আলো জ্বলে?

— আলো খুব একটা দরকার হয় না। ওই দরকারে-টরকারে কেরোসিন কুপি-টুপি জ্বলে।

— অন্ধকারে খারাপ লাগে না?

— সবই অভ্যেস হয়ে যায়।

— আপনার কটি ছেলেমেয়ে?

বাবা আমাকে দেখিয়ে বলল, ছেলে ওই একটিই আর তিন মেয়ে।

## অল্প দামের জামা-চাদর

লোকটা লিখতে লিখতে আমার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, কী নাম?

আমি উত্তর দিলাম না। বাবা বলল, ভরত পদ্মরাজ।

— মেয়েদের বিয়ে হয়েছে?

— বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। আর দুজনারও বিয়ের বয়েস হয়েছে।

— বিয়ে দিচ্ছেন না কেন? উপযুক্ত ছেলের অভাব, না টাকা-কড়ির অভাব?

— হ্যাঁ, তা সেরম যুগ্যি ছেলে পাই কোথায়! পয়সা-কড়িরও এট্টু অভাব।

— আপনার ছেলের বয়েস কত?

— ভরতের, তা পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে।

— আপনার ছেলেমেয়েরা কেউ স্কুলে পড়েছে?

— ভরত সেকেন্ডারি পাশ দিয়ে সদরে প্রি-ইউ পাশ দিয়েছে।

— আপনি বিয়ে করেছিলেন কত বছর বয়েসে?

— তা কুড়ি-বাইশ হবে। ধরুন আমাদের বিয়েতে তখন কনেকে পণ দিয়ে তবে ঘরে আনতে হত। এখন ছেলেকে পণ না দিলে মেয়ের বিয়েই হয় না।

— পণ দেওয়া-নেওয়া নিয়ে আপনার কী মনে হয়?

— আমি আর কী মনে করব? লোকে তো শোনে না।

— আপনি এখানে কত বছর চাষ করছেন?

— এই ধরুন, রায়েটের কিছু আগে থেকে। ওই যেবার হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হল।

— তার মানে তিরিশ বছরেরও বেশি আপনি নিজের হাতে ফসল ফলাচ্ছেন। আপনার, আর আপনার পরিবারের সকলের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন?

— আগে হত। এখন আর হয় কই?

— এর কী কারণ?

— আগে প্রকৃতির জলে চাষ হত। মাটিও ভালো ছিল। এখন সেচের জল, সার, বীজ, পোকামারা ওষুধ— সবই তো পয়সার ব্যাপার।

— আপনার গ্রামে অঘ্রাণে এখনও নবান্ন হয়?

— যে পারে, করে। করাটাই নিয়ম। তবে না পারলে আর কী করবে। এখনকার অনেকে আবার ওসব মানে না।

— আপনি জামা গায়ে দেন না?

— গরমের দিন তো। জামাটামা লাগে না।

— শীতকালে?

— আমাদের এই সাদামাটা অল্প দামের জামা-চাদর।

— আপনার স্ত্রী, বাড়ির মেয়েরা সাজগোজ করেন না?

## ঘোড়ার লাথি

লোকটার কথা শুনে কেন জানি না রাগে আমার মাথা দপদপ করতে থাকে। বাবার আদিখ্যেতা আরও অসহ্য। এসব কথা বলে লাভ কী?

বাবা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, আমি লোকটার দিকে ফিরে বললুম, গাঁয়ের মানুষ খেতে না পেয়ে হাল-বলদ বেচে কলকাতা গিয়ে ভিক্ষে করছে— সেসব তো কই আপনারা খবরের কাগজে লেখেন না। বাবাকে নিয়ে তো দেখছি তামাশা করছেন।

লেখা থামিয়ে লোকটা ধীরে-সুস্থে সিগারেট বার করতে করতে বলল, একজন চাষীর সারাদিন কীভাবে কাটে, আমি সেটাই লিখতে এসেছি। লোকের এ বিষয়ে কৌতূহল থাকা তুমি কি দোষের মনে কর?

— নিশ্চয়ই না। চাষীর জীবন জানতে চান তো একটা বছর এখানে থাকুন। জোতদার মহাজনদের দেখুন। কত ধানে কত চাল হয়, কটা দানা চাষীর পেটে যায়— এসব নিজের চোখে দেখে, ঠিকমতো জেনে সত্যি কথা লিখুন, তবে আপনাদের হিম্মৎ বুঝি। আপনি তো ইয়ার্কি করছেন।

— তুই যা, যা তো এখান থেকে। আপনি কিছু মনে নেবেন না। ও একটু মাথাগরম ছেলে, কী বলতে কী বলে বসে। হ্যাঁ, তা কী বলছিলেন, হ্যাঁ— তা মেয়েরা সাজগোজ আর

কী করবে? সংসারের কাজকর্ম করে, ওই সাধারণ শাড়িটাড়ি পরে আর কি । ছোট মেয়েটার একটু সাজগোজের শখ । তা কী আর দিতে পারি!

— কলকাতায় যাননি কখনও?

— ওই একদিন গিয়েছিলাম ।

— কবে?

— তা ধরুন দশ-বারো বছর হবে । পার্টির মিটিঙে একজন নিয়ে গিয়েছিল । বললে, রেলে টিকিট লাগবে না । বিখ্যাত জায়গা, দেখা-টেখা হবে । গেলাম । তা ঘোড়ার লাথি খেয়ে চলে এলাম । গড়ের মাঠে মিটিং হচ্ছিল । একটা লোক, তার মাথায় পাগড়ি, ঘোড়ার পিঠে বসে ঘোড়ার মাথায় চাটি মারে আর ঘোড়াও ক্ষেপে গিয়ে আমাদের লাথি ঝাড়ে । লোকেরা যে-যেদিকে পারে দৌড়চ্ছে, পুলিশের বন্দুক ফুটছে, বলাই পাল বলছে, তোমরা কেউ ভয় করবে না, ও ফাঁকা আওয়াজ । গায়ে গুলি লাগবে না । তা কলকাতা জায়গা ভালো । তবে ওই অবস্থায় কী আর দেখব । বড্ড চোখ জ্বলছিল, চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ জল পড়ছিল ।

## বনে শেয়াল যেমন

লোকটা বকতেও পারে । যেন নেশা ধরে গেছে । ফস করে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, যখন হাতে কোনও কাজ থাকে না কীভাবে সময় কাটান?

— ওই, পাঁচটা লোক এলে গপ্পো করি ।

— কী গপ্পো করেন?

— এই আমাদের মাঠঘাট । কীভাবে আবাদ করতে হবে । ছেলেমেয়েদের কীভাবে বাঁচাব । এইসব সুখ-দুঃখের কথা ।

— বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে আপনি কখনও কোথাও বেড়াতে যাননি?

— না, না । আমাদের চাষকাজ, সময়ই হয় না । তাছাড়া পয়সা না থাকলে মানুষ গাঁয়ের বাইরে যায় কী করে?

— আপনার তো সারা জীবনটা মাঠে কেটে গেল । সাধ-আহ্লাদ করলেন না, আরাম-আয়েস করলেন না, এই গ্রামের বাইরে পৃথিবীর কিচ্ছু দেখলেন না, এসব ভেবে কখনও দুঃখ হয় না? রেগে ওঠেন না?

— তা কী আর হবে ।

— সারা জীবন মানুষের অন্ন যোগাচ্ছেন, অথচ নিজেরা পেট ভরে খেতে পান না, ভেবে আপনি কখনও অবাক হননি?

বাবা আমার দিকে তাকায় ।

— আজকাল একটু একটু ভাবি । আমি বলি শুনুন । আমার মনে কোনও হিংসা অহংকারের কথা নাই । বনে শেয়াল যেমন বাস করে, আমরাও ওইরকমই । আমাদের কথা শুনে আর কী করবেন? তা, আপনার খাওয়া-দাওয়া তো হয় নাই । আপনারে এট্টু যে আপ্যায়ন করব—

— না, না । আমি খেয়ে এসেছি । আপনি বরং খেয়ে নিন ।

লোকটা যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে, বাবা বলে উঠল, আপনার আরেকটা সিগ্রেট দেন ।

— হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ।

সিগারেট দিয়ে লোকটা চলে গেল ।

## সোনার সিগ্রেট

লম্বা সিগারেট, পিছনে ফিল্টার লাগানো । বাবা এদিক-ওদিক খুঁজে একটা কচুগাছের পাতায় আলতো করে সিগ্রেটটা রেখে ভাতের থালা টেনে নিল । পদ্মপাতা রোদে নেতিয়ে পড়েছে, ধারগুলো কোঁকড়ানো । ভাত শুকিয়ে খরখরে । ঝোল টেনে গেছে । গেঁড়িগুলো যেন মাঠ বেয়ে ভাতের গায়ে উঠে চুপ করে বসে আছে ।

খাওয়া শেষ করে বাবা সিগ্রেট ধরায় । রয়েসয়ে আয়েস করে টান দেয় । গন্ধটা ভারি সুন্দর । ধোঁয়াটাও অনেক বেশি মিহি । হালকা, নীলচে । ছোট-ছোট গাছের ডালে-পাতায় ধোঁয়াটা বেশ খানিকক্ষণ জড়িয়ে থাকে । বাবা চোখ বুজে একটা সুখটান দিয়ে নিজের মনে কথা বলতে থাকে, তা মান দিয়ে কথা বলতে জানে । আমায় মুখখু ভাবলে অত কথা শুধাতো!

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট । মূর্খ বলেছিলাম তো, সেই কষ্ট ভুলতে পারেনি । তবে সেই ঝাঁঝ আর নেই । কলকাতার লোকটা এসে কাটিয়ে দিয়ে গেছে । বাবার ওপর হঠাৎ আমার কেমন মায়া হয় । ওই যে বলল, ছেলেমেয়েদের কীভাবে বাঁচাবে, তাই নিয়ে ভাবনা হয়,

আলোচনা করে । আমাদের কথা বাবা তাহলে সত্যিই ভাবে । ভেবে কষ্ট পায় । উপায় খোঁজে ।

মাঠে এই ছায়া, এই আলো । এমনই করতে করতেই আজ সূর্যাস্ত হবে । হাওয়া নেই । আমড়া গাছের মাথায় মেঘ আরও কালো । লক্ষণ ভালো । বাবা যে মনে মনে একপশলা বৃষ্টি আশা করছে, বোঝা যায় । একবার আকাশ দেখছে, একবার জমির সীমানায় চোখ বোলাচ্ছে, একটু অন্যমনস্ক ভাব । সিগ্রেট শেষ হয়ে ফিল্টারে ঠেকেছে, বাবা টান দিতে গিয়ে ধোঁয়া না পেয়ে সিগ্রেটটার দিকে তাকায় ।

— সোনার মতো সরু ফিতে দিয়ে বাঁধন দিয়েছে দেখেছিস । ঠিক মনে হয় সোনা ।

— বড়লোকদের সবই হয়, সবই ওইরকম ।

ফিল্টারের গোল সোনালি রেখাটা আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বাবা মুখ না তুলেই বলে, তা তো হবেই ।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে থাকে । হঠাৎ বাবার স্বরে উত্তেজনা, এটা সোনা নয় তো রে?

আমার একই সঙ্গে রাগ ও মায়া হয় । আমি রাগ চাপবার চেষ্টা করে বললাম, ধান-কলাই না বুনে আমরা সারা বছর ফুলের চাষ করতে পারি না? কলকাতায় বেচে তবু কিছু নগদ টাকা হাতে আসে । সরসীর শালা থাকে কল্যাণীতে, ফুল বেচে পাকা বাড়ি তুলেছে ।

বাবা জ্বলে ওঠে, আমরা ধানচাষী, আমাদের বংশে কেউ ফুলের চাষ করে না । ফুল হল গিয়ে শখ-সৌখিনতার জিনিস, অন্ন মানুষের প্রাণ ।

— পেটের ভাত না জুটলে প্রাণ বাঁচবে? ধানচাষ করে লাভ কী? হাতে টাকা থাকলে চাল কিনে খাওয়া যায় । সারা দুনিয়ার মানুষ জমি চষে পেটের ভাত জোটায় না ।

উপোসের খোঁটা দিয়েছি তো, বাবা একটু ঝিমিয়ে যায়, বলে, যার যা কাজ ।

ফিল্টারের টুকরোটা ট্যাঁকে গুঁজে বাবা উঠে পড়ে । গরুর কাঁধে লাঙল জুতে হেই-হেট হেই-হেট করতে করতে এগিয়ে যায় ।

আমি মাঠ ছেড়ে পথে নামি । ফুলচাষের কথাটা কদিন ধরেই ভাবছি । আমি এটা বুঝতে পেরেছি, কেউ আমাকে চাকরি দেবে না । কিছু একটা করতে হবে । যেভাবে চলছে, সেভাবে আর চলে না । আমার কেমন মনে হল, বাবারও আর বেশি বাকি নেই । শুধু আশায়-আশায় থেকে শরীরপাত করছে । আশা করতে-করতেই বাবা একদিন চোখ বুজবে । গোলাপী যা বলছে, তা যদি সত্যি হয়, কাশির সঙ্গে রক্তের ছিটে মানেই তো

যক্ষ্মা, আমি কী করে বাবাকে বাঁচাব। গোলাপীও সারাজীবন পাঁপড় বানিয়ে আর পাঁপড় চুরি করে আমাদের নড়বড়ে সংসারটা খাড়া রাখতে গিয়ে নিজেই একদিন নড়বড়ে হয়ে যাবে। নয় তো নষ্ট হয়ে যাবে। পদ্মর কথা ভেবে আমার ভয় হয়। একটা শাড়ি, একটু সাবান, একটু সুখের জন্য ও বোধহয় সব করতে পারে। ওর জন্য আমার দুঃখ হয়। কে ওর বিয়ে দেবে? জমি থেকে আমাদের পেটই চলে না, তা আবার বিয়ে। দিদিরই বা কী হবে? অথচ দিদির মতো মেয়ে হয় না। আমার একেক সময় মনে হয়, জামাইবাবুকে আমি নিজে গিয়ে অবস্থাটা বোঝাই। না বুঝলে গলা টিপে শেষ করে দিই লোকটাকে। আমার অমন দিদির জীবন নষ্ট করে তুমি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবে, তাই কি হয়?

ভালো লাগে না, কিছুই ভালো লাগে না। চারদিক যেন কেমন হয়ে আছে। মেঘলা আকাশ আমাকে আরও মনমরা করে দেয়। এত বড় পৃথিবীতে আমার কিছু করার নেই।

## লুবাইয়ের কবর

— ও ভরত, আমের একটা পল্লব পেড়ে দিবি বাবা?

মুখ তুলে দেখি আমগাছের নিচু ডালে দাঁড়িয়ে সুজলাবৌদি। জলাদার বউ। সুজলাবৌদির নামের একটা ইতিহাস আছে। আসল নাম সুকুমারী। স্বামীর নাম জলধর হালদার। আমরা বলি জলাদা। ওই জলাদার সঙ্গে বৌদির নামের আদ্য অক্ষর জুড়ে জেলেপাড়ার ক্ষিতীশ ওকে সুজলাবৌদি বলে ডাকে। শুনতে এত ভালো লাগে, আমিও ওই নামেই ডাকি।

সুজলাবৌদির সঙ্গে দেখা হলেই আমি চুরি করে ওর চোখ দেখি। চেয়ে থাকতে লজ্জা হয়, আবার না দেখলেও মনটা খচখচ করে। সবসময় নাকছাবি পরে থাকে, তাতেই আরও সুন্দর লাগে। জেলেপাড়ায় বৌদির রূপের খ্যাতি আছে। মন্দ লোকেরা, বিশেষ করে মেয়ে-বউরা ওকে নিয়ে অনেক গাল-গল্প বানায়। আসল কথা হিংসে। বৌদি খাগড়ার কাঁসারিপাড়ার মেয়ে। একসময় ওদের বাড়ির অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। বছর দশেক আগে সরকার কন্ট্রোলে রাং, তামার পাত দেওয়া বন্ধ করে দিয়েই ওদের পথে বসায়। শুধু সুজলাবৌদির বাবা-কাকাই নয়, গোটা কাঁসারিপাড়া সেই থেকে ধুঁকছে। অনেকেই সাতপুরুষের কাঁসারের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কেউ লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চানাচুর, চিড়ের মোয়া, গুড়ের খাজা ফেরি করে। কেউ রেলের কয়লা চুরি করে স্টেশনের কয়লার ডিপোয় বেচে দেয়। কেউ মুদির দোকানে, চায়ের দোকানে ফাই-ফরমাস খাটে। কেউবা মহাজনের রিকশা চালায়। কেউ কেউ ভিটেমাটির মায়া কাটিয়ে চাকরির আশায় এদিক-ওদিক চলে গেছে। গতবছর বৌদির বাবার অসুখে আমি বৌদিকে

পৌঁছে দিতে গিয়ে তিনদিন ছিলাম। জলাদার বিয়ের বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিলাম, তারপর ওই দ্বিতীয়বার। দশ-বারো বছরে কাঁসারিপাড়ার চেহারাই বদলে গেছে। বিয়ের দিনও সারা রাত সারা পাড়ায় ঠনঠন শুনেছি। একে তো বিয়েবাড়ির হইচই, তার ওপর আমরা গাঁয়ের ছেলে, রাতে দুয়েকটা নিশাচর পাখি-পেঁচার ডাক ছাড়া কোথাও কোনও সাড়া থাকে না। কাঁসারিপাড়ার কাজের আওয়াজে সেবার আমি ঘুমোতে পারিনি। গত বছর দেখলাম, দিনের বেলাই খাঁ-খাঁ। কাঁসারের কারখানা প্রায় চোখেই পড়ল না। তিনশো সাড়ে-তিনশো কাঁসারির মধ্যে সর্বসাকুল্যে বারো-চোদ্দজন কাঁসারের কাজ করে। তাও বেশিরভাগই টুকটাক মেরামতির কাজ। কেউ কেউ পুরনো ভাঙা বাসন গালিয়ে নতুন বাসন বানাচ্ছে।

সুজলাবৌদির বাপের বাড়ির অবস্থা যখন ভালো ছিল, কাঁসারিপাড়া থেকে পুজোয়-পার্বণে মেলা জিনিস পাঠাত ওর বাবা। আজ একজোড়া ভারি জামবাটি, কাল একটা পিতলের হাঁড়ি, কখনও বাটি-গেলাস, কাজ করা রেকাব। বৌদির যখন ছেলে হল, ঠিক সোনার মতো দেখতে দুধ খাওয়ার ঝকঝকে ঝিনুক-বাটি নিয়ে ওর বাবা নাতির মুখ দেখতে এসেছিল।

ওইসব দেখে তখন জেলেপাড়ার বউ-ঝিরা হিংসেয় পুড়ত। তারপর বৌদির বাপের বাড়ির অবস্থা পড়ে এল। জিনিস আসা বন্ধ হল। জলাদাও পর-পর তিন বছর পদ্মায় মাছ না পেয়ে একে-একে ওই সব বাসন-কোসন বেচতে লাগল। তখন পাড়ার মেয়েরা শোধ তুলতে উঠে পড়ে লাগল। জলাদা দশ-কুড়ি দিনের জন্য পদ্মায় গেলেই তারা সুজলাবৌদির নামে কুৎসা রটায়।

সুজলাবৌদি লক্ষ্মীবারের পল্লব নিতে এদিকে এসেছিল। হাত পাচ্ছে না, তাই আমাকে দেখে ডাকল।

বৌদির গাছে চড়াটা আমার ভালো লাগেনি। এমনিতেই এদিকটা নির্জন, বন-জঙ্গলময়, সন্ধে না হতেই মেঘলা করে অন্ধকার মতো হয়ে রয়েছে, এই সময় একা এতদূর এসে গাছে চড়ার দরকারটা কী? বদনাম তো কিছু কম রটেনি।

বৌদি ঝুপ করে লাফিয়ে নামল। আমি গাছে চড়তে চড়তে বললাম, একদিন লক্ষ্মী পুজো না করলে কী হয়? এত দূরে একা আসা তোমার ঠিক হয়নি।

— তোকে অত ভাবতে হবে না। বেশ কচি দেখে পাড়িস। তিনটে পাতা থাকা চাই কিন্তু।

আমের পল্লব পেড়ে আমি বৌদিকে জেলেপাড়ার দিকে এগিয়ে দিই। পল্লব ওর হাতে দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকি।

খানিক এসে সুজলাবৌদি দাঁড়িয়ে পড়ে । সামনে রহিমচাচার কুঁড়ে । শূন্য । সাড়াশব্দহীন । মেঘলা আকাশের নীচে আরও কালো হয়ে চালাটা দাঁড়িয়ে আছে ।

আমি এক পলক বৌদির চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, রহিমচাচার মেয়েকে আমি একবার পুকুর থেকে তুলেছিলাম । সাঁতার জানত না ।

সুজলাবৌদির চোখের পাতা পড়ছে না । আমার কথা শুনল কি শুনল না, বুঝতে পারলাম না । বললাম, চাচা মানুষটা কিন্তু ভালো ছিল । মনটা খুব নরম । নিজেরা দুবেলা খেতে পেত না । কিন্তু ফকির বাউল এলে একমুঠো খুদ অন্তত দিত । একদিন দেখি দাওয়ায় বসে বসন্ত বোষ্টুমির কেত্তন শুনতে শুনতে কাঁদছে । কেত্তন শেষ হলে বোষ্টুমির ঝুলিতে চাল দিল, আস্ত একটা লাউ এনে দিল ।

সুজলাবৌদি কী দেখছে? রহিমচাচার কথায় একবার হুঁ-হাঁও করল না । ওরা যে গাঁয়ের ভিটেমাটি ছেড়ে কলকাতা শহরে ভিক্ষে করতে গেছে, জানে না নাকি? একেবারে তন্ময় । দূরের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে ।

— কী দেখছ? বাড়ি যাবে না?

সুজলাবৌদির ঘোর ভাঙে । একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, চ ।

বাঁদিকে মোড় ঘুরে হাঁটতে-হাঁটতে আমার দিকে না ফিরে বলল, মাটির নীচে মানুষের শরীল মাটির সঙ্গে একদম মিশে যায়, না রে?

এতক্ষণ তাহলে লুবাইয়ের কথা ভাবছিল । রহিমচাচাদের কুঁড়েঘর ছাড়িয়ে ডানদিকের মাঠে লুবাইয়ের কবর । এক বছরের বাচ্চা পোড়াতে নেই তো, জলাদা ছেলেকে ওইখানে মাটি চাপা দিয়েছিল । জলাদা সে-বছর টানা এক মাস পদ্মায় কাটিয়ে মাছ নিয়ে ঘরে ফেরে । বিল থেকে কিছু জ্যান্ত কইমাছও এনেছিল । কী করে মাটির হাঁড়ি উলটে যায় । লুবাই সবে হাঁটতে শিখেছে, টলতে-টলতে এসে একটা মাছ ধরে মুখে দেয় । দম আটকে শেষ ।

## গাঙের চিঠি পুকুরে ভাসে

সুজলাবৌদিকে অন্যমনস্ক করতে আমি জলাদার কথা তুললাম ।

— জলাদা কোনও খবর পাঠিয়েছে? কবে ফিরবে? এবারও শুনছি ইলিশের ঝাঁক এখনও দেখা যায়নি!

— সে-মানুষ তো কতদিন হল আসামের নদীতে । পাড়ার কয়েকজনকে নিয়ে বেরিয়েছে ।

— আসাম? সে তো অনেক দূর?

— তা হালদাররা মাছের সন্ধানে কোথায় না যায়?

— তুমি কখনও জলাদার সঙ্গে পদ্মায় যাওনি, জেলেডিঙিতে?

— তুই বড় বোকা-বোকা কথা বলিস, ভরত । আমি জেলেপাড়ার আর পাঁচটা বউয়ের মতো জেলের মেয়ে না । আমার বাপ কংসবণিক । আমি খাগড়ার বিখ্যাত কাঁসারিবংশের মেয়ে । আমি কেন মরতে আঁশটে নৌকোয় মাছমারাদের সঙ্গে যাব!

কারও জাত কি পেশা নিয়ে কেউ খোঁটা দিলে আমার রাগ এসে যায় ।

আমি বললাম, মরতে কি বেড়াতে যাবার কথা বলছি না । জলাদা ঝড়েজলে প্রাণ হাতে নিয়ে মাছ ধরে, তুমি সঙ্গে থেকে একটু-আধটু কাজে লাগতে পারো তো ।

— তোকে আর গুরুগিরি করতে হবে না । হালদাররা কবে আবার সঙ্গে বউ নিয়ে মাছ ধরতে যায় রে?

সুজলাবৌদি রেগে আছে । একটু আগেই ছেলের শোকে চোখের পাতা পড়ছিল না, এখন দু-চোখ জ্বলছে । আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তোর মা তো পুকুরে পুকুরে শামুক গেঁড়ি তুলে হাতেপায়ে হাজা হয়ে মরতে বসেছে, এতো বড় মদ্দা, দু-দুটো পাশ দিয়েছিস, তুই মার কোন কাজে লাগছিস?

— চাকরির চেষ্টা তো কম করিনি ।

— চাষকাজে ঘেন্না ধরল বুঝি?

সুজলাবৌদির নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে । নাকছাবিটা মেঘলাতেও জ্বল-জ্বল করে । আমি বললাম, ঘেন্নার কথা না । চাষ করে লাভ কী? বছরকার ধানই ঘরে ওঠে না । আমি অন্য উপায় ভাবছি ।

— মাছ ধরেই বা কী-এমন দুধেভাতে থাকি রে? আমিও অন্য উপায় ভাবছি ।

— কী?

— তোকে বলব কেন? এই জগু, জগু ।

মোটা টেস্টপেপার নিয়ে জগু স্টেশনের কাছে খগেন স্যারের বাড়ি যাচ্ছিল কোচিং নিতে। সুজলাবৌদির ডাকে দাঁড়ায়।

— ফেরার পথে একবার পোস্টমাস্টারের বাড়ি হয়ে আসিস তো। পিওনটা শুনেছি অনেক সময় চিঠি পুকুরে ফেলে দেয়। সেদিন নিজের চোখে দেখলুম পোস্টো কার্ড ভাসছে। তিন মাস হয়ে গেল, একটু খোঁজ নিস তো ভাই।

জেলেপাড়ার ছেলেদের মধ্যে জগুই একমাত্র লেখাপড়া করে। খুব নিচু ক্লাসে পড়ে কেউ কেউ। সে কিছুদিনের জন্য। কয়েক বার ফেলটেল করে ইস্কুল ছেড়ে দিয়ে বাপ-দাদাদের সঙ্গে নৌকোয় আলকাতরা মাখায়, জালে গাবের রস লাগায়। নৌকোর দলে ভিড়ে পদ্মায় যায়। জগুই শুধু ওসব শিখল না। সে জেদ ধরেছে, জীবনে কখনও বাপের পেশায় যাবে না। পাশটাশ করে শহরে গিয়ে চাকরি করবে। লিখতে-পড়তে শিখে জগু অবশ্য পাড়ার একটা কাজে লাগতে পেরেছে। হালদাররা দূরের নদীতে মাছ ধরতে গেলে, সেখানকার ডাঙার কাউকে দিয়ে বাড়িতে খবর দিয়ে চিঠি লেখায়, জগু সেই চিঠি পড়ে দেয়। কখনও-কখনও কারও হয়ে চিঠি লিখেও দিতে হয় তাকে।

জগু বলল, সন্ধে রাতে আমি পোস্টমাস্টারের বাড়ি যেতে পারব না। সূর্য ডুবলেই আজকাল আফিম খেয়ে ঝিমোয়।

— আফিম খাক, তাড়ি খাক, একটু চিঠির খোঁজ নিতে গেলে তোকে কি গিলে খাবে?

জগু আর কথা না-বাড়িয়ে চলে যায়।

পোস্টমাস্টার লোকটাকে আমি চিনি। মহিমকুমার ভদ্র। লোকে সাধারণত মাস্টারমশাই বলে ডাকে। কেউ কেউ বলে ভদ্রবাবু। চাকরিতে এসে প্রথম প্রথম ভদ্রবাবু বেনামে খবরের কাগজে চিঠি লিখত। আশপাশের দু-পাঁচটা গ্রামের অভাব-অভিযোগের কথা। ডাক-বিভাগের অব্যবস্থার কথা। ডাকঘরের ফুটো চালা দিয়ে বর্ষার জল পড়ে চিঠিপত্র ভিজে যায়। এত বড় এরিয়া, লোক কম, চিঠি বিলি হতে হপ্তা কেটে যায়। একবার আমার নাম দিয়ে লিখে ছিল, লক্ষ্মীপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সারা বছরই ওষুধ থাকে না। পোস্টঅফিসে যখন কাজ থাকত না, ভদ্রবাবু টেবিলে বই রেখে মাথানিচু করে বসে বসে পড়ত। আমাকে একবার রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র পড়তে দিয়েছিল। আজকাল চিঠিও লেখে না, বইটইও পড়ে না। সন্ধে হলেই আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে।

জেলেপাড়ার মুখে এসে আমি সুজলাবৌদিকে সান্ত্বনা দিই, জলাদার জালে এবার হয়তো অনেক মাছ পড়ছে। একদিন দেখবে অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে হাজির হবে।

— বেঁচে আছে কিনা, তাই দ্যাখ। তুই যা, সন্ধে লেগে যাচ্ছে। লক্ষ্মীকে জল-বাতাসা দেব, পাঁচালি পড়ব। যা গুমোট! একটু বৃষ্টি হলে বাঁচি!

## বুকে ত্রিশূলের খোঁচা

সংসারে শকুন যত, উকুনের সংখ্যা তত নয়।
আকাশ জুড়িয়া যত আশা দেখি, তত দেখি ভয়।।
আশীর্বাদ যত আছে, শাপমন্যি তাহার অধিক।
সর্বভূতে শাপ দেয়, টিকটিকি কহে ঠিক ঠিক।।
শাপের কারণে শোক পাপ-তাপ মনোকষ্ট ক্ষুধা।
চরাচরে অভিশাপ, কোথা পাব জীবনের সুধা।।
অভিশাপ হেতু এই জীবনের কোনও অর্থ নাই।
কে কবে কহিয়া দিবে কোথা গেলে আমি শান্তি পাই।।
শ্মশানে-কবরে ক্ষয় হয় সর্ব যাতনা ও জ্বালা।
চন্দ্রকান্ত কবিয়াল অঙ্গুলিতে অভিশাপমালা।।
পদবীতে পদ্মরাজ, সদা ভয় সদা দুঃখীমান।
শৈশবে মাতুলালয়ে সঙ্গহীন আছিল মগন।।
বনোমাঝে মন্দিরেতে থাকিতেন কবি পুরোহিত।
একা মনে ভাবিতেন মানুষের যত হিতাহিত।।
শীতগ্রীষ্মে অকাতর, শয্যা শুষ্ক অরণ্যের কাঠ।
হতভাগ্য বালকেরে উষাকালে শিখাতেন পাঠ।।
শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু নমি আমি তাঁহার চরণ।
অভিশপ্ত সংসারের যত দুঃখি করিব বর্ণন।।

পড়তে পড়তে আলো কাঁপে। সারাদিনের গুমোট কেটে গিয়ে রাতে হাওয়া দিয়েছে। নারকেল পাতায় ঝিরিঝিরি। আলোর শিখা কাঁপতে কাঁপতে একেকবার ক্ষীণ হয়ে আসে।

ক্ষীণ হতে হতে একসময় নিভে যায় ।

স্বপ্নে জ্যাঠার রক্তচক্ষু দেখে স্বপ্নেই আমার কপাল ঘামতে থাকে । আমি জ্যাঠাকে কখনও চোখে দেখিনি । স্বপ্নে অনেকবার দেখেছি । জটাজুটধারী সন্ন্যাসী । গমগমে গলায় কথা বলে । একবার আমার মাথায় হাত রেখেছিল । আরেকদিন, মনে আছে, কাঁধের ঝুলি থেকে বার করে আমার হাতে একটা পাথরের রিভলবার ধরিয়ে দিয়েছিল । অদ্ভুত জিনিস । নল দিয়ে আপনা থেকেই আগুনের ঝলক বেরোয় ।

আমার কপাল, মুখ, গলা বেয়ে কুল-কুল ঘাম নামছে । জ্যাঠার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোয় । আমার বুকে ত্রিশূলের ডগা ছুঁইয়ে রেখে বলল, কুলাঙ্গার!

গলার আওয়াজে ঘরের চালা সুদ্ধু কেঁপে ওঠে । বুকে ত্রিশূলের খোঁচা খেয়ে যন্ত্রণায় আমার ঘুম ভেঙে যায় ।

চোখ মেলে অন্ধকারে মানুষের নড়াচড়া দেখতে পাই । ভয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে । ঘরের কোণে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে । তবে কি সত্যিই সশরীরে জ্যাঠামশাই? নাকি মরে গিয়ে ভূত হয়ে এসেছে? অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতে, সাহস করে চেয়ে দেখি মানুষটা নিচু হয়ে কী করছে । ন্যাকরা ছেঁড়ার শব্দ হল । চোর নাকি? আমি আস্তে আস্তে উঠে পা টিপে টিপে কাছে গিয়েই চমকে উঠি ।

— তুই? কী করছিলি অন্ধকারে?

দিদি ভয় পেয়ে ‘উঃ মা’ বলে উঠে আমাকে দেখে বলল, আমার এখনও বুক ধড়ফড় করছে রে । তোর ঘুম ভাঙবে ভাবিনি ।

— আলো জ্বালাসনি কেন? কী খুঁজছিস এখানে?

— কিছু না । তুই শো গিয়ে ।

আমি মাদুরে এসে বসি । ওখানে আমার দুয়েকটা পুরনো জামাটামা আছে । একটা পাজামা পুঁটলি বেঁধে তুলে রেখেছি ।

কলেজে পড়বার সময় টাউনের দরজিকে দিয়ে বানিয়েছিলাম । পায়ের দিকে ছিঁড়ে গেছে, ঝুলেও কিছুটা খাটো, তবু ওই একটাই আমার পাজামা, রেখে দিয়েছি, দরকার-টরকারে পরি । বিকাশ এলে গোলাপীকে দিয়ে একটু সেলাই করিয়ে নিয়ে ওটাই পরব ।

আবার ন্যাকড়া ছেঁড়ার শব্দে কেমন সন্দেহ হল, বললাম, আমার পাজামা ছিঁড়ছিস না তো?

— ছেঁড়া তো। জামা-দুটোর চেয়ে ওটাই দেখলাম বেশি ছেঁড়া।

— আমার একটা মাত্র পাজামা। রাত-দুপুরে তোর পাজামা ছেঁড়ার কী দরকার পড়ল?

দিদি কিছু না বলে ন্যাকড়া নিয়ে অন্ধকারেই বেরিয়ে গেল। অন্ধকারে অদ্ভুত উদ্ভট সব চিন্তা মাথায় আসে। হঠাৎ মনে হল, দিদি গলায় ফাঁস দেবার মতলব করছে না তো? ওর দুঃখের তো শেষ নেই!

## বকের বেশে শকুন

ফুলচাষের কথাটা ভালো করে ভাবতে হবে। সবদিক খতিয়ে দেখে তবেই হাত লাগাব। জমি নিয়ে সমস্যা। বাবা কি জমি ছাড়বে? বাবার সঙ্গে আমার খুব একচোট লাগবে, সন্দেহ নেই।

জমি কি চিরকাল বাবার হাতেই থাকবে। যেতে যেতে এখনও যেটুকু আছে, সেটুকুই আর কতদিন থাকে দ্যাখো। রহিমচাচার জমি কোথায় গেল? এমনি কতজনের। বেশিরভাগই তো নিজের জমি খুইয়ে ভাগচাষী, নয়তো চাষমজুর। বিশ্বেসরা, পঞ্চামহাজনরা দিনরাত ফন্দি আঁটছে, কলকাঠি নাড়ছে। টাকা বলো টাকা, বীজধান বলো বীজধান, ধারকর্জের ফাঁদ পেতে রেখেছে সারা গাঁয়ে। তুমি ইঁদুর, তুমি চড়ুই, অন্নের লোভে তুরতুর করে ওদের কলে ঢুকছো, তোমার ঘাড়ে যাঁতা বসিয়ে দিয়েছে, ঠ্যাঙে ফাঁস টেনে দিয়েছে, তুমি বুঝেও বোঝ না, আশায় আশায় ভাব এ বছরডা যেমন-তেমন সামনের বছর দুঃখহরণ। সেই যে খ্যাপাচাঁদু গায়। কৌটোর দুটো ঢাকনা করতালের মতো বাজিয়ে বাজিয়ে নেচে নেচে গান গেয়ে ভিক্ষে করে।

জমির ব্যাপারে সরকারের নিয়মকানুনও এক হেঁয়ালি। এক সরকারের একেক রকম নীতি। আজ এক সরকার এর-ওর বেনামী জমি বার করে একে-ওকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেয় তো কাল আরেক সরকার এসে সে জমিতে নতুন করে দাগ দিয়ে নতুন ভাগ-বাটোয়ারা করে। জমি পেলেই বা কী। চাষের খরচ দিচ্ছে কে? বীজধানই পেটে চলে যায়। তখন উদ্ধারকর্তা সেই তো বিশ্বেসরা, পঞ্চামহাজনরা। হুঁকো টানতে টানতে ঘুরে বেড়ায়। কারও নতুন-পাওয়া জমির ধারে এসে বকধার্মিকের মতো উদাসীন।

— কী চাষ দিচ্ছিস শেখের পো? এট্টু জান মন লাগিয়ে চাষ দিয়ে অবস্থাটা এবার পালটে নে তো বাপ।

— চাষ করতে টাকা লাগে বাবু। টাকা পাই কোথা?

— তা টাকা নাহয় আমি দিলাম। গায়ে-গতরে খেটে নিজের কপাল ফেরাতে পারবি তো?

শেখের পোর চোখে সন্দেহের সঙ্গে লোভও চকচক করে।

পঞ্চামহাজন ঘনঘন হুঁকো টানে।

— সাঁঝ লাগার আগে আমার বাড়িতে এসে তিনশো টাকা নিয়ে যাস। তুই-ই চাষ করবি। তিন টাকা রোজ, আর সকাল-দুপুরে খাওয়া। একা তো পারবি না, আরও জনাকয় মুনিষ লাগবে। ধান কিন্তু আমার গোলায় তুলে দিতে হবে। টিপছাপ দিয়ে টাকা নিয়ে যাস।

শকুন, শকুন। শুধু গরু মরার অপেক্ষা। জ্যাঠা ঠিকই লিখেছে, সংসারে উকুনের চেয়েও শকুন বেশি। এক উকুনে রক্ষা নেই, তায় আবার শকুন!

দাওয়ায় বসে সদানন্দ বিশ্বাস বুড়ুক-বুড়ুক তামাক খায়। এক চোখে ছানি, সামনের জিনিস ঠাহর করে দেখতে হয়। বাড়ির সামনের রাস্তায় পায়ের শব্দ শুনে হাঁক পাড়ে, কে যায়?

কোমর ভেঙে হাত জোর করে শিবুখুড়ো বলে, এজ্ঞে আমি কত্তা।

সদানন্দ শুধু গলার আওয়াজে মানুষ চেনে, শিবু নাকি?

— এজ্ঞে কত্তা।

যেন কোনও গরজ নেই, একমনে হুঁকো টেনে চলে, লোকটাও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, একসময় বলে, অতটা জমি পেলি, এবার তোর কপাল ফিরবে।

— আপনাদের আশীর্বাদ কত্তা, আর ভগমানের দয়া।

যেন আমাদের মতো গরিব-গুরবোদের কপাল না ফেরা পর্যন্ত এদের ঘুম নেই। কপাল ফেরাতে এরা চাষীদের ধার-কর্য দেবে, হিসেবের খাতায় সুদের পাহাড় তুলবে, কত রকম জাল ছড়াবে, তারপর একদিন সেই জালে চাষীর জমিসুদ্ধু টেনে তুলবে। সরকারি বন্দোবস্তে কেউ জমি পেলে, তার শুভাশুভের ভাবনা না ভাবলে এদের চলে? শরীরে দয়ামায়া নেই নাকি? চাষীর হাতে টাকা ধরিয়ে দিয়ে কাগজে বুড়ো আঙুলের ছাপ নিয়ে জমিটা বেনামে কিনে যার জমি তাকেই চাষমজুর বানিয়ে তবে এদের ভাত হজম হয়।

বাবা গরুর নাদায় জল দিয়ে মাঠে গেছে। গোলাপী লক্ষ্মীপুরের বাস ধরতে এতক্ষণে মাঝরাস্তায়। মা কাঠ চ্যালা করছে। রোদে মুখ-কপাল কুঁচকে গেছে। পদ্ম সাতসকালের রিঠের ফেনায় শাড়ি চুবিয়ে রেখে ঘুঁটে দিতে দিতে গজ গজ করছে। শিলের ওপর আস্ত হলুদ। বাটতে পারেনি তাই রাগ। দুধের বালতি উঠোনে পড়ে আছে। দিদি ঘর নিকিয়ে দুধ নিয়ে বেরোবে। বিশ্বেস বাড়ি, বাঁড়ুজ্যে বাড়ি গিয়ে দুধ মেপে দেবে।

মা দিদিকে হাঁক দেয়, বলে, দেখিস তো কটা টাকা যদি দিতে পারে। বাঁড়ুজ্যেদের বলিস। নয়তো দু-কুনকে চাল। মাসকাবারে দাম থেকে কেটে নেবে।

বুড়ো-আঙুলের নখে দায়ের কোপ খেয়ে মা যন্ত্রণায় ঝেঁঝে ওঠে, ইচ্ছে করে সংসারের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে একদিকে চলে যাই। আর ভালো লাগে না।

## সরসীর কুনজর

সরসী মুখের সামনে ছোট আয়না ধরে কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছাঁটছিল। দাওয়ায় ওর বউ ছেলেকে বুকের দুধ দিচ্ছে, আমাকে দেখে পিছন ফিরে বসল।

সরসী মুখ থেকে আয়না সরিয়ে বলল, কলকাতা থেকে পুলিশের লোক এসে নাকি তোর বাপের নাম-ধাম লিখে নিয়ে গেছে? গাঁয়ে আবার ধরপাকড় শুরু হবে নাকি রে ভরত?

স্টেশনের ওপারে সরসীর মনিহারী দোকান। বছর সাতেক আগে রাজনীতির দাঙ্গায় একবার দোকান লুঠ হয়েছিল। সেই থেকে পুলিশের লোক শুনলেই ভয়। আবার বুঝি পার্টিতে-পার্টিতে একচোট লাগবে।

— পুলিশের লোক, তোকে কে বলেছে?

— শুনলাম তো। পুলিনের মতি-গতি কিন্তু আমার ভালো লাগছে না। গাঁয়ে আবার একটা ঝামেলা না পাকিয়ে ছোঁড়ার শান্তি নেই।

— বাজে কথা ছাড়। শোন, তোর সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ আছে।

পরামর্শের কথায় সরসী ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে এল। পরামর্শ-টরামর্শ শুনলেই ওর মনে হয় গাঁয়ের কোনও মেয়ের ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথা আছে। ওর ওই এক দোষ। মেয়ে দেখলেই ঘুর-ঘুর করবে। সুযোগ-সুবিধে মতো কাছে ঘেঁসবার চেষ্টা করবে।

— কী, কার ব্যাপার?

— আগে তোমার পদ্মরে সামলাও তো। নির্লজ্জ বেহায়া!

সরসীর বউ পিছন ফিরে বসলে কী হবে, পিঠ খোলা, বাঁ পাশ দিয়ে কচি একটুখানি বুকও দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ আমার ওপর এমন ঝেঁঝে উঠল, কারণটা অনুমান করতে পারি। সরসী নিশ্চয়ই পদ্মর ওপর নজর দিয়েছে। সাবানটাবান, সেদিন তো পাউডারও দেখলাম, পদ্ম পাচ্ছে কোথায়?

সরসী কিছু ছেলেমানুষ না, আমার থেকে বছর-দুয়েকের বড়ই হবে। তার কীর্তিকলাপের জন্য তার বউ আমাকে দুষবে, এ তো বড় অদ্ভুত। শুধু পদ্ম কেন, এ-পর্যন্ত গাঁয়ের কোন মেয়েটার কাছে ও ছোঁক-ছোঁক করেনি? গত বছর নদে থেকে সন্ধ্যা এসেছিল, মুকুল বিশ্বাসের ভাগ্নী, বাপকে পুলিশ মিসায় ধরে হাজতে পুরেছে, সংসার অচল, মা লজ্জায় বাপের বাড়ি আসেনি, সন্ধ্যাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যা অপূর্ব সুন্দরী, আমি ও-রকম দেখিনি। শুধু একটু নেংচে হাঁটে। গরমের দিনে সন্ধেবেলা পুকুরে গা ধুতে গেছে। বাড়ির কাছেই মেহেদির বেড়া দিয়ে ঘেরা পুকুর। দ্বিতীয় কোনও প্রাণীও নেই। আমি একটা মেহেদিগাছের গোড়ায় নিঃশব্দে মাটি খুঁড়ছি। আমাকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। দূর থেকে ওর নড়াচড়া দেখে মনে হল শাড়ি শায়া গায়ের জামা পাড়ে খুলে রেখে ও একটা গামছা জড়িয়ে জলে নামল।

অন্ধকারে তিরিশ-চল্লিশ হাত দূর থেকে আমি ওর গা দেখতে পাচ্ছি না। গর্ত খুঁড়ছি আর মাঝে-মাঝে চোখ তুলে শুধু ঠাহর করার চেষ্টা করছি, চান শেষ করে সন্ধ্যা পাড়ে উঠল কিনা।

পাইপ গানে শাবল লেগে ঠপ করে আওয়াজ হল। আট-দশটা মানকচু পাতা দিয়ে মুড়ে রেখেছিলাম। পুলিনের ছোট ভাই ধরা পড়ার সময় পুলিনকে দিয়ে যায়, পরদিন সন্ধেয় পুলিন এটার দায়িত্ব দেয় আমাকে। কবছর পর যেদিন ভোরে পুলিন রানাঘাট যাবে, সেদিন রাতে জিনিসটা ওর বাড়িতে আমার পৌঁছে দেবার কথা।

শব্দ শুনে আমি সাবধানে শাবল চালাই। হঠাৎ দেখি, আমার পাঁচ-ছ হাত দূর দিয়ে সরসী হামাগুড়ি মেরে মেহেদির বেড়া ফুঁড়ে পুকুর পাড়ে এসে উঠে দাঁড়াল। পা টিপে-টিপে ও সন্ধ্যার পিছন দিক দিয়ে এগিয়ে যেখানে কাপড় ছেড়ে রেখেছিল তার খুব কাছে গুড়ি মেরে বসে রইল।

আমার হাতের শাবল থেমে গেছে। চিল চোখে আমি ওই দিকে তাকিয়ে আছি। সন্ধ্যা শব্দ না করে দু-হাতে জল কেটে ঘাটের কাছাকাছি খানিক সাঁতার দিল। তারপর হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে নিশ্চিন্তে পরনের গামছা খুলে নিঙরোয়। গা-মাথা মুছে

সবে পাড়ে উঠেছে, সরসী চাপাস্বরে উঃ বাপরে, আমাকে সাপে কেটেছে রে, বলে সন্ধ্যার কাপড়-চোপড়ের ওপর গড়াগড়ি দিতে লাগল ।

সামনেই ব্যাটাছেলে দেখে সন্ধ্যা ভীষণ চমকে উঠে এক ঝটকায় সরসীর পিঠের তলা থেকে শাড়িটাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে গায়ে চেপে ধরে । ভয়ে তার দম আটকে আসে । ঘন-ঘন শ্বাস নিতে নিতে বলে, কে? কে ওখানে?

সরসী কাঁদো কাঁদো গলায় মিন-মিন করে, তুমি সন্ধ্যা না? আমি সরসী । উঃ জ্বলে গেলাম । আমার হাঁটুতে সাপে ছোবল দিয়ে পাইলেছে । জ্বলে গেলাম রে! হাঁটুর ওপর একটা বাঁধন দাও না গো, শিগগির । শিগগির । দেরি হলে বাঁচব না ।

উঃ লাগছে ছাড়ুন । দাদুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ।

সরসী ওই অবস্থায় খাঁটি আতঙ্কে বিড়বিড় করে ওঠে, তোমার পায়ে ধরছি, লক্ষ্মী মেয়ে, কাউকে বোল না । লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার পায়ে পড়ি, তোমার কেনা হয়ে থাকব, ক্রিম, পাউডার, আলতা— আমার দোকানের যা চাইবে তাই দেব, বলো, আমার গা ছুঁয়ে বলো, আজকের সাপে কাটার কথাটা কাউকে বলবে না ।

পাইপগানের ব্যাপারটা না থাকলে, কী করতাম ভগবানই জানে ।

সেই সরসীর বউ কিনা আজ আমাকেই শাসায় । উরে, আমার পতিদেবতা রে! সেই যে দিদি কার্পেটে রঙিন সুতো দিয়ে পতি পরম গুরু লিখেছিল, এখনও ঘরের দেওয়ালে ঝোলে!

সকাল থেকেই আজ মেজাজ খিঁচড়ে আছে । তার ওপর মেয়েছেলের মুখঝামটা । ফুলচাষের কথায় সরসী তো প্রায় ঠাট্টা-ব্যঙ্গই করল আমাকে— দূর, ঢুলির হাতে বাঁয়া-তবলা?

— তোর শালা তো বলিস ফুলচাষ করে বাড়ি তুলেছে ।

— সে হল গিয়ে গুণী ছেলে ।

## বিপিন দাসের হিসেব

হাঁটতে-হাঁটতে স্টেশনের রাস্তায় এসে পড়েছি । দোকানের গায়ে, বাড়ির দেওয়ালে লাল কালিতে ছাপা পোস্টার গিজগিজ করছে । রক্ত দিন জীবন বাঁচান । ব্লাড ব্যাঙ্কের পোস্টার, নতুন সেঁটেছে ।

স্টেশন আমাদের কাছে বিদেশবিভূঁই । দোকানের বড়-বড় সাইন বোর্ডগুলোই শুধু চেনা-জানা । গাঁয়ের দু-চারজনের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে দেখা হয়, আর ওই সরসীর দোকান । এখনও তালা ঝুলছে । লাইনের ধারে কাঁখে চালের পুঁটলি নিয়ে একদল মেয়ে-বউ কলকাতার ট্রেনের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে আমাদের গাঁয়ের আলতা আর শ্যামাখুড়িকে দেখলাম । বাকি সব আশপাশের গাঁয়ের । এই যে এত লোক চারদিকে ঘুর-ঘুর করছে, এরা কোনও গাঁয়ের না, বেশিরভাগই এই স্টেশন এলাকার । চাল-চলন কথাবার্তাই আলাদা ।

প্ল্যাটফরমে শাক-সবজির ব্যাপারীরা সার-সার বোঝা নামিয়ে রেখে ট্রেনের অপেক্ষা করছে । জেলেপাড়ার নকুলও শেষপর্যন্ত হকারি ধরল । ঝুড়িতে গুড়ের খাজা সাজাচ্ছিল, আমাকে দেখে বলল, একটা বিড়ি দে তো । আমি একটু পরেই কিনব । বউনি করে তোকে চা খাওয়াব ।

বিড়ি দিয়ে আমি নিজেও একটা ধরাই । নকুল গাঁজার টান দিয়ে কাশতে-কাশতে বলল, আজ পালা দেখতে আসছিস? অমর ভিয়েতনাম । শুনেছি জব্বর হবে ।

— যাব । গুড়ের খাজা তুই নিজে বানাস?

— না, না । নগদে কিনতে হয় ।

বিপিন দাস আমাকে দেখতে পেয়েই ডাকল, ও ভরত! একবার ইদিকে এসো তো ।

আমি কাছে যেতে বলল, তিরিশ পয়সা করে সাতাশ দিনে কত হয়? আর ছত্রিশ পয়সা করে উনত্রিশ দিনে? চারদিন যুগান্তর আনতে পারিনি আর দুদিন আনন্দবাজার পাইনি, তা মাসের খদ্দেরদের কাছে কত পাব?

## নকুলের হিতোপদেশ

হিসেব করে দিয়ে আমি বসে-বসে পড়ছিলুম, নকুল দু-হাতে দুটো চায়ের ভাঁড় নিয়ে এল । তার ঝুড়ি চায়ের স্টলে রেখে এসেছে ।

— প্রথম খেপেই এক টাকা তিরিশ নয়া! চালের মেয়েগুলো একেকজন কুড়ি নয়া, তিরিশ নয়া করে নিলে মাইরি!

— সারাদিনে কত হয়?

— এ-রম ভালো বউনি হলে সাত টাকাও হয়, আবার কোনওদিন আড়াই-তিনেই ঠেকে যায় । ট্রেনে আজকাল ঘুগনির যা বিক্রি মাইরি । তুই লেগে পড় না । নে, একটা

সিগ্রেট খা ।

খিদে মারতে চায়ের জুড়ি নেই । ঝিমুনি ভাবটা বেশ কেটে যায় । আমি মৌজ করে সিগ্রেট টানতে-টানতে ভাবছিলুম, আরেক ভাঁড় চা হলে মন্দ হয় না, ঠিক তখনই নকুল বলল, ট্রেনের আর দেরি নেই । তুই খুব পয়মন্ত, বোস তোকে আরেক ভাঁড় চা খাওয়াব ।

— একটু খাজাও আনিস । পয়সা নেই কিন্তু ।

চায়ের স্টলের দিকে যেতে-যেতে নকুল ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, ওটি পারব না ।

আমার হাতে চায়ের ভাঁড় দিয়ে নকুল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই শব্দ করে চা খেতে লাগল ।

— চুয়াত্তর নয়া খরচা হয়ে গেল মাইরি । চার ভাঁড় ষাট, আর দুটো সিগ্রেট চোদ্দ ।

আমি মাথা নিচু করে চা খাচ্ছি, নকুল নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, যাক গে বিক্রি-বাটা আজ ভালোই হবে মনে হয় । খাজা খাবি? তোর কাছে দশ নয়া হবে?

— ও আমি এমনি বলেছিলুম ।

— বুঝলি না, ধারে বেচি না তো—

বিপিন দাস বলল, আমি সারা মাস ধারে কাগজ দিই ।

— তোমার হল গিয়ে বাবুদের নিয়ে ব্যবসা । আমার খদ্দের যত চাষী-মজুর । দে ভরত, একটা বিড়ি দে ।

বিড়ি ধরিয়ে নকুল একবার প্ল্যাটফরমে চোখ বুলিয়ে নেয় । তারপর আমার দিকে ফিরে বলে, তোর মাকে তখন চালের মেয়েদের সঙ্গে দেখলুম । চাল ব্ল্যাক করার অনেক ঝুঁকি । পুলিশকে ঘুষ দাও, হোমগার্ডদের ঘুষ দাও, তাছাড়া পুলিশের সঙ্গে ছুঁড়িদের রাতের বন্দোবস্ত থাকে । একেকটা ছুঁড়ির সাজগোজের কী ঘটা মাইরি । বুড়িদের ও-লাইনে সুবিধে নেই ।

— তুই দেখলি? মাকে?

— আমি বললুম, মাসি, এ তোমার কাজ নয় । যা শরীর, একবার শেয়ালদা যেতেই তোমার শ্বাস উঠে যাবে । বলল, দুটো স্টেশন গিয়েই চলে আসব ।

নকুল বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে কাশতে থাকে । থক করে খানিকটা গয়ের ফেলে পরামর্শ দেয়— আমি বলি, হয় ঘুগনি ফিরি কর, নয় তো চালের লাইনে থাকতে হলে পদ্মকে লাগা ।

আমি চায়ের ভাঁড় মাটিতে ফেলে পায়ে মাড়িয়ে গুঁড়ো করি ।

## ভাঁড় কুড়ুনি বোবাকালা

বোবাকালা কাছাকাছি কোথাও ছিল ভাঁড় গুঁড়োতে দেখে আঁ-আঁ করে ছুটে এল । আমার পায়ের কাছে বসে মুখ দিয়ে জন্তুর মতো আর্তনাদ করে আর কপাল চাপড়ায় । কুকুরের বাচ্চা, সারাদিন রাস্তার চায়ের দোকানে, স্টেশনে শুধু মাটির ভাঁড় কুড়িয়ে বেড়ায় । আমার আগের ভাঁড়টায় অনেকক্ষণ ধরে একটা মাছি বসে বসে আজ্ঞে হেঁ-হেঁর ভঙ্গীতে দু-হাত কচলাবার মতো সামনের দুটো ঠ্যাং মুখের কাছে তুলে ঘষছিল, সেটাও আমি আছড়ে ভাঙলাম । বোবাকালা বর্শা-বেঁধা শুয়োরের মতো উৎকট আওয়াজ বার করে । বোবাকালাই বটে । কালাচাঁদ নামে ওকে বোধহয় ওর মাও আর ডাকে না । আমার পায়ের কাছ থেকে খোলামকুচিগুলো নেবার চেষ্টা করছিল, উঠে দাঁড়িয়ে এক লাথি কষাই ।

## খানসেনাদের ব্যাটা

স্টেশনের থেকে বেরোবার মুখে জয়বাংলাকে মোট বইতে দেখে আমি হুঙ্কার করে উঠি, জয়বাংলা! আমার মাথায় যেন বাজ ডাকছে । ইয়ের বাচ্চা রিকশা থেকে বিশ্বেসদের মাল নামাচ্ছে । এই বড়-বড় পোঁটলা, বিরাট তালা লাগানো ট্রাঙ্ক, ঝুড়িভর্তি ফল-ফলারি, মুখবাঁধা গুড়ের কলসি । মেয়ে-জামাইকে একেবারে গাঁ উজোড় করে দিয়েছে । মেয়েটা ঘোমটার মধ্যেই ফ্যাচ-ফ্যাচ করে ঢঙের কান্না কাঁদছে । ছোট বৌদির সাধের নেমন্তন্নে এসেছিল, কাল একেবারে হরির লুঠ দেখে বাবুবিবি আজ কলকাতায় ফিরছেন, আহারে, বুড়ো বাপ-মাকে ছেড়ে গাঁ নিংড়ে জিনিসপত্তর নিয়ে যাবার সময় একটু দুঃখ হবে না? মেয়েটার বরটা রুমাল দিয়ে বার-বার মুখ মুছছে আর জয়বাংলাকে ধমকাচ্ছে, আঃ । সাবধানে তোল । অ্যাই । ফেলবি নাকি? নিচু হ, নিচু হ! এক ফোঁটা গুড় মাটিতে পড়লে তোর মুণ্ডু গুঁড়িয়ে দেব রে হতভাগা ।

মুখভরা বসন্তের দাগ, ঘন-ঘন রুমাল ঘষছে ।

— ভুনি, ওরকম করে কাঁদিস না ।

মুকুল বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে রিকশাওয়ালার সঙ্গে দরাদরি করে ।

মুকুলের বোন কাছে সরে এসে কাঁদতে-কাঁদতেই বলে, এরা কি ডাকাত নাকি? দুটো রিকশায় দু টাকার এক পয়সা বেশি দিবি না । ছোড়দা, আবার সেই কবে আসব! তোর

ছেলে হলে ষষ্ঠীতে গিয়ে নিয়ে আসিস।

— সে হবে'খন। এখুনি ট্রেন এসে যাবে। তুই স্টেশনমাস্টারের ঘরে গিয়ে বোস। নন্দ, তুমি গিয়ে টিকিটটা করে রাখো। আপ ট্রেনের সিগন্যাল হয়ে গেছে।

লোকটা বসন্তের দাগ ঘষতে-ঘষতে এগোয়। মুকুল রিকশাওয়ালার দিকে ফিরে বলে, গজা না? রিকশার মালিক হয়েছিস বলে কি ধরাকে সরা ঠাউরেছিস নাকি রে? ব্যাঙ্কলোন পেয়ে ভেবেছিস দেশটা মগের মুলুক হয়ে গেছে! এক থাবড়ায় সবকটা দাঁত ফেলে দেব।

গজা এতক্ষণ ব্রেক চেপে রেখে মাল নামানোর সাহায্য করছিল, দুহাত ছেড়ে দিয়ে মুকুলের মুখের সামনে গিয়ে বলল, মারেন তো, দেখি কত জোর আপনার থাবায়। কই মারেন— কটা দাঁত ফ্যালতে পারেন দেখি—

অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে দাঁতের পাটি মুকুলের মুখের কাছে তুলে ধরে।

— এত সাহস ভালো নয় গজা!

— সাহস আর কী দ্যাখলেন? গায়ে হাত দিলে দ্যাখতে পেতেন।

— এই জয়বাংলা!

আমার গলা শুনে মুকুলের বোন ঘোমটা সরিয়ে হাউ-হাউ করে ওঠে, এটা না, এটা না, ভরত, ওই বদমাশটা! ছোড়দাকে মেরে ফেললে রে।

ওর কথার উত্তর না দিয়ে আমি এক হ্যাঁচকায় জয়বাংলার ইজেরের পিছন ধরে টান মারি।

নিচু হয়ে মস্ত একটা রুই তুলছিল, হ্যাঁচকায় কানকোর ছড় খুলে মাছটা ধপ করে ধুলোর ওপর পড়ল।

— ফের তুই ওদের মোট বইছিস?

— মা বলেছে।

— চল, আজ তোর মার একদিন কি আমারই একদিন। মুকুল, এর পয়সা মিটিয়ে দাও।

মেয়েটা মিনমিন করে— ভরত, তোর এসব কেমনধারা কথা? তুই আমাদের গাঁয়ের ছেলে, বিপদে পড়ে তোর সাহায্য চাইছি, আর তুই-ই কিনা—

— চোপ!

মুকুল লাফ মেরে আমার কাছে আসে । বোনকে ঝেঁঝে ওঠে— তখন থেকে বলছি স্টেশনে গিয়ে বোস, কথা গ্রাহ্য হয় না!

আমি বললাম, জয়বাংলার পয়সা মিটিয়ে দাও!

— বাকি মাল কটা স্টেশনে তুলে দিক, পয়সা দিয়ে দেব ।

— মাল আর বইবে না । ভাড়া দাও ।

— ভরত, তুই কিন্তু একটু বাঁকাট্যারা কথা বলছিস! ফলটা ভেবে দেখলে ভালো করতিস ।

— চোপ, শালা, সুদখোরের বাচ্চা । পয়সা ফ্যাল!

মুকুল কী একটা বিড়বিড় করতে করতে পয়সা বার করে দেয় ।

পয়সা নিয়ে আমি জয়বাংলাকে টানতে-টানতে ফাঁকায় নিয়ে আসি ।

— তোর বাপ কে জানিস?

— হ্যাঁ ।

— কে?

ওর চুলের মুঠি আমার হাতে । সেই অবস্থাতেই চোখ তুলে বলল, খানসেনারা ।

— তা খানসেনার ব্যাটা— নেড়ি কুত্তার মতো বিশ্বেসদের লাথি খেতে লজ্জা করে না? যা ভাগ—

মাথাটা ঝাঁকিয়ে আমি ওকে ছেড়ে দিই । পয়সা গায়ের ওপর ছুড়ে ফেলি ।

## থিয়েটারের পুলিশ

এ তো একেবারে মঞ্চ বেঁধে থিয়েটার । ভিড় করে দেখতে এসেছে সব । আমাদের গাঁয়ের প্রায় সবাই দেখছি দিব্যি জায়গা দখল করে বসে গেছে । তাঁতিপাড়ার ফুলমনি ওর তিন বৌদির সঙ্গে একেবারে সামনের দিকে । মুকুল ফটফট এদিক-ওদিক ঘুরছে-ফিরছে, ওদের বাড়ির শুধু ও-ই এসেছে । আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভিড়ের মধ্যে সরে গেল । বাবা সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে বসেছে । মুখ হাঁ করে নাটক দেখছে । দিদি, গোলাপী, পদ্ম সামনে মেয়েদের দিকে । সরসী ওর বউয়ের তিন-চার হাত পিছনে স্টেজের দিকে মুখ তুলে রেখে ঘন-ঘন সিগারেট টানছে । একটা ভিয়েতনামী মেয়েকে চারজন লালমুখো

সোলজার জাপটে ধরে টেনে-হিঁচড়ে কোথাও নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, মেয়েটা চিৎকার করে ওদের গালাগাল দিচ্ছে, পা দিয়ে লাথি মারছে, কামড়ে দেবার চেষ্টা করছে। এইসময় সরসীর দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, মেয়েটাকে ও পর-পর চোখ মেরে যাচ্ছে। আমার দিদি আঁচলে চোখ ঢেকেছে।

মা আসেনি। এতক্ষণে ঘরে হুড়কো দিয়ে ঘুমোচ্ছে হয়তো। শেষ বেলায় ফিরেছে। আমি কথা বলিনি। 'নে গেল' বলে সামনে ভাতের থালা নামিয়ে রেখে যেতেই আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাই।

আমার ছোটবেলায় মার খুব যাত্রা-থিয়েটারের শখ ছিল। আমাকে নিয়ে দূর-দূর গাঁয়ে দেখতে যেত। দিনের আলো থাকতে-থাকতেই রাতের খাওয়াদাওয়া মিটিয়ে রওনা দিতাম। লণ্ঠন জ্বালিয়ে পলতেটা খুব ঢিমে করে মা একা আমার হাত ধরে দু-পাঁচটি গাঁয়ের মাঠ ভাঙত। মাঝরাতে ফেরার সময় পলতে বাড়িয়ে দিত। মার এক হাতে লণ্ঠন, আরেক হাত আমি শক্ত করে ধরে থাকতাম। আলোর দুলুনিতে চারপাশের খাঁ-খাঁ মাঠ-ভরা অন্ধকার এমন বিচ্ছিরিভাবে নড়ে-নড়ে উঠত, ভয়ে আমি অনেক সময় চোখ বুজে হাঁটতাম। মার শরীরের সঙ্গে সেঁটে।

একটা ছেলে যুদ্ধে যাবে, তার মা তাকে বার-বার কপালে চুমু দিচ্ছে। কী উৎকট দুর্গন্ধ রে বাবা। কারও নিশ্চয় পেট গরম হয়েছে। আমি ধুতির খুঁটে নাক টিপে বসে থেকে এক সময় উঠে পড়ি। স্টেজের পিছনে দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা গ্রিনরুম! অনেকে সেজে তৈরি হয়ে বসে আছে। কয়েকজন তখনও সাজছে। সহদেবকে প্রায় চেনা যায় না। মনে হচ্ছে, ঠিক সত্যিকার পুলিশ। আমাকে দেখে বলল, সিগ্রেট আছে?

আমি বিড়ি বার করি, একটাই আছে।

— না, বিড়ি না, একটা সিগ্রেট খেতে চাই।

সহদেবের বুড়ি পিসি গ্রিনরুমে ঢোকে। লাঠি ঠুকে-ঠুকে এসেছে। হাঁফাচ্ছে। দাঁত নেই। হাঁফাতে হাঁফাতে ফক ফক করে যা বলল তার মানে, সহদেবের বউয়ের এখন-তখন অবস্থা, চোখ উলটে গেছে। মরা একটা ছেলে বিইয়েছে, এত বড় মাথা।

সহদেব আমাকে ছাড়তে চায় না। কেঁদে ফ্যালে আর কি। কুম্ভদা ছাড়বে কেন, ঘড়ি দেখে বলল, বউকে দেখে তাড়াতাড়ি ফিরবি। এক ঘণ্টার মাথায় তোর পার্ট।

মাঠ ভেঙে আমি আর সহদেব দৌড়তে থাকি। বুড়ি অনেক পিছনে লাঠি ঠুকে-ঠুকে আসছে। এক সময় ওর লাঠির শব্দ আমরা ছাড়িয়ে যাই।

সহদেব ছুটতে ছুটতে হাঁফায় আর মাঝে মাঝে বলে ওঠে, হায় ভগবান!

মাঝমাঠে পৌঁছে আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি । পুলিন রিভলবার উঁচিয়ে চিৎকার করে ওঠে, শালা, বেইমান, পুলিশের কুত্তা!

সহদেবের বুক তাক করে দাঁত চিবোয়, হাত তুলে থাক!

আমি দরদর করে ঘামছি ।

— পুলিশ নয়, পুলিশ নয়, ও সহদেব!

এত হাঁফাচ্ছি, আর পুলিনের টিপ আমি জানি, ভয়ে আমার মুখ দিয়ে ঠিক মতো কথা বেরুচ্ছে না ।

পুলিন গর্জন করে ওঠে, হাত নামলেই গুলি করব, শালা শুয়ারকা বাচ্চা! কেউ এক পা এগোবি না!

আমি আবার কথা বলতে যাচ্ছিলাম, পুলিন ধমকে ওঠে, চোপ শালা! স্টেশনে কলকাতার ছোকরাকে তোর খোঁজ করতে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল । শাললা! তলে-তলে এতদিন এই মতলব আঁটা হচ্ছিল । তোর বাপের কাছে খবরের কাগজের লোক এসেছিল, বেইমান! আমাকে ধোঁকা দেওয়া?

মাথার ওপর হাত তুলে রেখে আমি দম নিয়ে বলি, পুলিন, ও আমাদের সহদেব । থিয়েটারে পুলিশ সেজেছে ।

সহদেব হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে, আমার বউ মরে গেছে রে পুলিন!

পুলিন রিভলবার উঁচিয়ে আমাদের কাছে আসে । ভালো করে সহদেবকে লক্ষ করতে করতে হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে ।

পিছনে লাঠির ঠকঠক শুনতে পাই । সহদেব পুলিনের হাত জড়িয়ে ধরে, তুই-ও একটু চ' আমাদের সঙ্গে । বাচ্চা বিয়োতে গিয়ে আমার বউ—

কথা বলবে কী, হাউ-হাউ করে কাঁদে ।

আমি বললাম, কে আমার খোঁজ করছিল বললি?

হাঁটতে হাঁটতে পুলিন আমাদের সিগ্রেট দেয় । নিজে ধরায় । সহদেব কান্না থামিয়ে ফোঁস-ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে আর সিগ্রেট টানে ।

— একই ট্রেনে এসেছে । কলকাতা থেকে । ঝকঝকে শার্ট, বেলবটম প্যান্ট । মনে হয় বড়লোকের ছেলে, কাত্তিক-কাত্তিক চেহারা । রিকশাওলাকে তোদের বাড়ি চেনে কিনা জিজ্ঞেস করছিল । কে রে ছোকরা?

নিশ্চয় বিকাশ । আজ তো ষোল তারিখ । বললাম, বিকাশের আসবার কথা ছিল । টাউন স্কুলে পড়ত আমার সঙ্গে ।

— যার বাবা সরকারি রিলিফের টাকা খেয়েছিল?

— ওইরকম কিছু হবে । ছেলেটা ভালো । সুন্দর আবৃত্তি করত ।

— তা এতদিন বাদে?

— এমনি, বেড়াতে ।

এটা কি একটা বেড়াবার মতো জায়গা । আমার সন্দেহ হচ্ছে । একটু চোখে চোখে রাখিস তো ।

সহদেব পুলিশের টুপিটা খুলে হাতে নেয় ।

আমার তাহলে আর যাওয়া হয় না । বাড়িতে মা একা । বিকাশকে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ ।

— সহদেব, পুলিন তোর সঙ্গে থাক, আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে ।

— হায় ভগবান! হায় ভগবান! ও-হো-হো-হো!

## সুখের ভাগ

বিকাশকে আমারই চিনতে কষ্ট হয় । ঠিক সিনেমার হিরোদের মতো দেখতে হয়েছে । হাতে একটা সুটকেশ, উঠোনে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, আমি প্রায় দৌড়ে এসে ওর সামনে লাফিয়ে পড়ে হেসে ফেলি । তারপর নিচু দরজা থেকে সাবধানে ওর মাথা বাঁচিয়ে ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বললাম, তুই একটু বোস, আমি তোর খাবারের ব্যবস্থা করে আসি । দেখি কী পাওয়া যায় ।

— কিচ্ছু দরকার নেই । আমি রাতের খাবার খেয়ে এসেছি ।

— বুদ্ধিমানের কাজ করেছিস । চল, তোকে জল দিই, হাত-মুখ ধুয়ে নিবি ।

— দরকার নেই । তুই দুটো গেলাস নিয়ে আয় । আর খাবার জল ।

— সে দিচ্ছি । তুই পা ধুবি না?

— দূর, মোজা পরা আছে, ঠিক আছে । দুটো গেলাস নিয়ে আসতে পারিস?

— দুটো দুহাতে ধরে চুমুক দিবি?

আমি হেসে ফেলি । বিকাশ সুটকেশ খোলে । জিনিসপত্রে ঠাসা । দামি জামা-প্যান্ট, একটা ক্যামেরা, পাশে ওটা কী? আমি অর্ধেক জিনিস চিনিই না ।

বললুম, রেডিও অত ছোট?

— এটা টেপ রেকর্ডার-কাম-রেডিও । টু-ইন-ওয়ান ।

বিকাশ চালিয়ে দিতে ঝমঝম করে ইংরিজি বাজনা বেজে উঠল ।

— টেপ রেকর্ডার এখানে কী কাজে লাগবে?

সুটকেশের তলা থেকে বিকাশ একটা সুদৃশ্য বোতল বার করে বলল, তেমন কোনও পাখির ডাক-টাক পেলে তুলে নেব ।

একপাশে কয়েকটা বই । বই সরিয়ে লুচির মতো গোল একটা কাচ-কাগজের পুরু প্যাকেট বার করে বিকাশ দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়ল । ভেতরে বেলা-লুচির মতো পাতলা, কাঁচা কী যেন, একটার পর একটা সাজানো । গোলাপী রঙের ।

আমাদের ডাকাডাকিতে সেই যে ঘুম ভেঙেছে, মা আর শোয়নি । ভাবনায় ডুব দিয়ে বসে আছে । অন্যমনস্ক ভাবে দাঁতে নখ কাটছে । আমাকে কুঁজো থেকে জল ঢালতে দেখে বলল, ঘরে এক মুঠো চাল নেই, তার ওপর অতিথ!

ছোটবেলায় বিকাশকে মা কত তালের বড়া খাইয়েছে । লক্ষ্মীপুজোয় নারকেল নাড়ু । জলের ঘটি নিয়ে চলে আসতে আসতে বললাম, ওর জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না ।

সিগ্রেটের নাম ডানহিল । এরকম প্যাকেট আমি আগে দেখিনি । সুজলাবৌদির বাপের বাড়ি চন্দন কাঠের ছোট্ট বাক্স দেখেছিলাম, সেইরকম মজবুত, মসৃণ । রং-নকশা ভারি সুন্দর । মাথার ডালা খুলে বাক্সটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বিকাশ বলল, কার সঙ্গে কথা বলছিলি?

— মা তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল ।

— তোর বোনেরা কি ঘুমোচ্ছে? এতদিনে নিশ্চয়ই সব মহিলা হয়ে গেছে? বিয়ে হয়েছে?

— থিয়েটার দেখতে গেছে।

বিকাশ চৌকো বোতলটায় মুখ লাগিয়ে একটুখানি চুমুক দিল। মদ নাকি? বোতলের গায়ে বড় বড় ইংরিজি অক্ষরে লেখা ভ্যাট ৬৯।

— আরেকটা গেলাস আন।

— জিনিসটা কী?

— মধু।

— যাঃ! মধু ওভাবে চুমুক দিয়ে খায় না।

তুই গেলাস নিয়ে এসে বোস তো। কতদিন পর দেখা। কী করছিস-টরছিস শুনব। জলদি যা। তোর সঙ্গে অন্য কথাও আছে।

গেলাস এনে আমি দরজাটা ভেজিয়ে দিই।

মধুই বটে! গাঁজলা-ওঠা তাড়িও এর কাছে কিছু না। চ্চাং করে কান-গলা ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে, কয়েক চুমুক খাবার পর বেশ হালকা-হালকা লাগে। আমার মন ভালো হয়ে যায়। এ নিশ্চয়ই বিলিতি মদ।

বিকাশকে ভালো করে দেখি। একেবারে সাহেবদের মতো চেহারা। কী রং, কী স্বাস্থ্য। কী দারুণ সুখে আছে! ব্যাটার মনটাও ভালো। কবেকার কোন পাড়াগাঁর বন্ধুকে ঠিক মনে রেখেছে। এতদূরে এসেছে নিজের সুখের ভাগ দিতে। একেকটা সিগ্রেটের কত দাম কে জানে। ফটফট করে বাড়িয়ে দিচ্ছে। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিচ্ছে। আগুনটাও যেন বিলিতি।

## ঝিক্‌কা-ঝিকা ঝিক্‌কা-ঝিকা

কাঁচা লুচির মতো জিনিসটা তো অমৃত। দেখতে কাঁচা, আসলে নুন-মশলা দেওয়া মাংস। রাঁধে কী করে কে জানে।

বিকাশ সুটকেশ থেকে এরকম আরেকটা প্যাকেট বের করে বলল, অনেক আছে, খা। ব্যাগেও খাবার আছে।

লম্বা চুমুকে গেলাসটা খালি করে দিয়ে আমি বিকাশের দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

জীবন যে এত আনন্দের আমি শালা অ্যাদ্দিন জানতেই পারিনি। শুধু সিগ্রেটের ধোঁয়াতেই এত স্বাদ!

আমি ওর দেখাদেখি এবার তিন-চারটে ছোট ছোট চুমুক দিয়ে বললাম, এই বোতলটার দাম কত?

নিজের গেলাসে ঢেলে বোতল উপুড় করে বাকিটা আমার গেলাসে ঢালতে ঢালতে বিকাশ বলল, আমি দুশোয় পাই ।

— কয়েক ঘণ্টায় দুশো টাকা খেয়ে ফেললুম!

— তোকে ভাবতে হবে না । আরও আছে । আমার ব্যাগটা দে এদিকে—

আমি ওর হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, তুই আমাকে দুশো টাকা দিবি? আমি ফুলের চাষ দেব । ফুলচাষে অনেক টাকা । ফুল বেচে আমি তোর টাকা শোধ করে দেব ।

— জমি তৈরি করবি, গাছ লাগাবি, ফুল ফোটাবি, তারপর ফুল বেচবি— কত টাকা পাবি?

— একেক মরসুমে একেক ফুল । বছরে পাঁচ-ছটা চাষ দেব । হাজার অব্দিও পেয়ে যেতে পারি ।

— বছরে?

— হ্যাঁ, এক বছরে এক হাজার টাকা!

— চাকরি করবি?

— অনেক ঘুরেছি । সব শালা ইয়ের বাচ্চা ।

— করবি কিনা বল!

— কে দেবে?

— আমি ।

— সত্যি? তোকে শালা ভগবান পাঠিয়েছে!

আমি ওর পা ছোঁবার চেষ্টা করি । বিকাশ পা সরিয়ে নিয়ে বলল, তোর নেশা হয়ে গেছে ।

— একটুও না, মা কালীর দিব্যি । বিশ্বাস কর ।

— কত মাইনে চাস?

— পঞ্চাশ-একশো, যা দিবি ।

— দূর। একশো টাকায় আজকাল মাসের চায়ের খরচও হয় না। পাঁচশোয় শুরু কর, তারপর দেখা যাবে।

মাসে? কেউ যদি আমাকে একটু তুলে দেয়, আমি হ্যাঁচকা তালে নাচতে পারি ঝিককা-ঝিকা ঝিককা-ঝিকা ঝিককা-ঝিকা— দোলের দিন মেথরপাড়ায় সবাই কী সুন্দর নাচে!

গলা ছেড়ে গান ধরি, অ্যাদ্দিন গেল যেমন-তেমন, এই বছরেই দুঃখ হরণ। খ্যাপাচাঁদু গো, খ্যাপাচাঁদু, এবার উলটো করে গাও না দাদু।

## খাবারের বাক্স

দরজা ঠেলে বাবা ঘরে ঢোকে। বাবার পিছনে পদ্ম, গোলাপী, দিদি মুখ বাড়ায়!

আমি বললুম, বাবা, আমার পাঁচশো টাকার চাকরি হয়েছে। মাসে পাঁচশো টাকা। বিকাশ সব ব্যবস্থা করে দেবে।

বিকাশ একমুখ হাসি ফুটিয়ে বলে, আপনি ভালো আছেন, মেসোমশাই?

বাবা সুটকেশ থেকে চোখ তুলে বলল, তোর সেই বন্ধু না? তা খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই?

— কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। মেসোমশাই আপনি বসুন, আজ আপনাদের একটা জিনিস খাওয়াব। তোমরাও এসো।

বিকাশ সুটকেশ থেকে বড় একটা কাগজের বাক্স বার করল। দিদি, গোলাপী, পদ্ম বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি দিদির থুতনি নেড়ে দিয়ে বললাম, আর-কটা দিন থাকো দিদি কেঁদে কঁকিয়ে, নতুন বরের সঙ্গে তোমার দেব নতুন বে।

বিকাশ পদ্মদের দিকে তাকিয়ে বলল, একটা গেলাস নিয়ে এসো তো। আর একঘটি জল।

এসব খাবারের নামও জানি না। বাক্স খুলে বিকাশ বাবাকে দেয়, আমাকে দেয়, তারপর সামনে নামিয়ে রেখে বলে, খেয়ে দেখুন তো, কেমন লাগে। তোমরাও এসো, হাত লাগাও।

বাবা মুখে খাবার নিয়ে হপ-হপ করে বলে, অত করে বলছে, আয় না, খেয়ে দ্যাখ, খুব দামি জিনিস।

বিকাশ আরেকটা বোতল বের করে গেলাসে মদ ঢালে। বাবার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, বলুন তো কী?

— শরবত?

— এটা না, যেটা খাচ্ছেন?

— মাছ-মাছ লাগছে।

— হল না, তুমি বলো।

গোলাপীর দিকে তাকায়।

— মাছই তো। আপনি তো কই খাচ্ছেন না?

— আমি আর ভরত অনেক খেয়েছি। তুমিও পারনি। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কে?

দিদি পদ্মকে দেখায়।

— ও। আমি বোধহয় ওকে পাঁচ বছরের দেখেছি, সারা গায়ে ধুলো মাখতো। কী, মাছ?

— মাংস বোধহয়।

— কাছাকাছি। মুরগি। হাড় বের করে ফেলে প্রিপেয়ার করে।

— এইটে পাঁঠার মাংস, খেয়ে দ্যাখ —

লুচির মতো জিনিসটা আমি পদ্মর দিকে এগিয়ে দিই। দিদির কাছে প্যাকেটটা দিয়ে বললুম, খুব সুন্দর। খা একটা। বাবাকে দে— গোলাপী, তোকে আর পাঁপড়ের বেসন ঘাঁটতে হবে না।

বাবা একহাতে বাক্স থেকে মুখে পুরছে, আরেক হাতে গেলাস। মাঝে মাঝে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকছে।

বিকাশ বাবাকে সিগ্রেট ধরিয়ে দিয়ে বলল, চুমুক দিন।

## বাবার উত্তেজনা

বাবা আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে গ্লাসে চোখ রাখে— তাড়ি নয় তো বাবা?

— দূর । সাহেবরা আমাদের মতো তাড়ি খায় নাকি? মেম-সাহেবরা নিজের হাতে বানিয়েছে । খেয়ে দেখুন, শরীর ভালো হয়ে যাবে ।

সারা জীবন বাবা কীই বা খেয়েছে! আমি বললুম, এক বোতলের দামই দুশো টাকা ।

বিকাশ শার্টের বোতাম খুলছিল, বাবা গেলাসে চুমুক দিয়ে বলল, পদ্ম, একটা পাখা এনে বাতাস কর । ওনাদের এত কষ্ট করে থাকার তো অভ্যেস নেই ।

গোলাপী আগেই উঠে গিয়েছিল, চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে বাবাকে দেখল, বলল, তুমি আবার ওসব খেতে গেলে কেন?

বাবা গায়ে মাখল না । তিন চুমুকে গেলাস খালি করে খানিক ঝিম মেরে থেকে বলল, জিনিস ভালো ।

— তোমার না বুকের ব্যামো?

— সব সেরে যাবে । বিলিতি ফলের রস রে । বড় দামি জিনিস ।

আমি বললুম, দে বিকাশ, আমাকে একটু ফলের রস দে ।

গেলাসগুলো একে একে ভরে দিচ্ছিল, মুখ না তুলে বলল, এতে স্বাস্থ্য ভালো হয় । তোমরাও খেতে পারো । গেলাস নিয়ে এসো—

— আমরা গাঁয়ের মেয়ে, বিলিতি জিনিস পেটে সইবে না!

বিকাশের চোখ ধ্বক করে ওঠে, সারা মুখ ঝকঝক করছে । খপ করে পদ্মর পাখাসুদ্ধু হাতটা ধরে বলল, তিনটে গেলাস নিয়ে এসো । দেখি কেমন না সয়!

পদ্ম পাখা রেখে উঠে যায় । বাবা আমতা-আমতা করে, থাক বাবা, বছরভর গেঁড়ির ঝোল খাই, ওর যখন ইচ্ছে নেই—

— মেসোমশাই, সামান্য একটা মেয়ে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কথা বলবে, অসহ্য । এ আমি কখনও সহ্য করিনি ।

বাবা বেকুবের মতো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, তা তো বটেই । তা তো বটেই ।

গোলাপী হিল-হিল করে ওঠে, বাপ-ব্যাটায় বসে বসে মদ গিলছো, তোমার লজ্জা করে না?

গেলাসে চুমুক দিয়ে বাবা হঠাৎ গর্জে ওঠে, তোর বাপের পয়সায় খাচ্ছি?

দিদি প্রথম থেকেই বিকাশের মুখে অত কী দেখছে কে জানে। আমার যতবারই চোখে পড়েছে, দেখি অদ্ভুতভাবে চেয়ে আছে। গোলাপী আবার কী বলতে যাচ্ছিল, দিদি শান্ত গলায় বলল, তুই চুপ কর গোলাপী। ভরতের বন্ধু, খারাপ কিছু তো দেবে না।

গোলাপী দিদির দিকে ফেরে, তোদেরও বলিহারি! শুতে যাবার নাম নেই, রাতদুপুরে সেজেগুজে এখানে এসে বসে আছিস। বেহায়া কোথাকার!

দিদির মনটা বড্ড নরম, বকুনি সইতে পারে না, ওর মুখে কষ্টের ছাপ পড়ে। বিকাশ হঠাৎ হাতজোড় করে ক্ষমা-চাওয়া নকল করে, ক্ষমা দাও রণ-রঙ্গিণী।

স্বর বদলে বলে, বোসো তো। তখন থেকে তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছ।কতকাল পর দেখা বলো তো, একটু গল্প-টল্প করে শুতে যেও। আমি তো আর রোজ-রোজ আসব না।

বাবা ঘন-ঘন চুমুক দেয়। গেলাস খালি করে বলে, দাও বাবা, আরেকটু দাও।

এক হাতে গেলাস নিয়ে বাবা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দিদির কাছে আসে। কপালে গুঁড়ো-গুঁড়ো ঘাম জমেছে। বাবাকে আজ একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে। এই ধরনের উত্তেজনা আগে কখনও আমি বাবার গলায় শুনিনি।

— ভরত মাসে-মাসে পাঁচশো টাকা পাচ্ছে। আর কিসের ভয়? তুই দেখিস এবার সে-ব্যাটাকে জেলের ঘানি টানিয়ে ছাড়ব। হাত ভেঙে দেব। না-পারি তো আমার নাম পেহ্লাদ পদ্মরাজ নয়!

পদবীটা প্রায় গলা চিরে বলল।

আমার আবার খুব ভালো লাগতে শুরু করেছে। আগামের কথায় বললাম, আমাকে কিছু টাকা আগাম দিবি তো?

— পুরোটাই, যদি চাস।

— কলকাতায় একটা ঘর দেখতে হবে।

— সেসব ঠিক করে দেব। কাল তো আমি থাকছি, তখন কথা হবে। কী গোলাপী, থাকতে দেবে তো?

— আপনার ইচ্ছে।

বলে গোলাপী উঠে যায়।

— এক নম্বরের গোঁয়ার । গেঁয়ো ভূত, বিকাশের মতো ছেলের সঙ্গে লাগতে আসিস! পাশের ঘরে পদ্মর সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়েছে । সারাজীবন ওই নিয়েই থাক তোরা । আমি তো কলকাতায় । তিরিশ দিনে পাঁচশো । দিনে কত হয়?

বাবার সামনে সিগ্রেট খেতে পারছি না । একেবারে ক্ষেপে গেছে । হাত মাথা নেড়ে নেড়ে দিদির শ্বশুরকে খুব গালিগালাজ করছিল, গেলাসটা ঠক করে নামিয়ে রেখে বলল, ফাঁসিতে ঝোলাব! হাত গুঁড়িয়ে দেব! আমার মেয়ের গায়ে হাত দিস— এত তোদের সাহস!

দিদি বসে বসে ঢুলছিল, বাবার চিৎকারে উঠে দাঁড়ায়, চলো বাবা, এবার শুতে চলো ।

— শালা শুয়োরের বাচ্চাদের শেষ করে দেব!

দিদি বাবার হাত ধরে টানে, এখন চলো তো । তুমি ঠিক অসুখ বাধাবে ।

বাবা দিদির গায়ে ভর দিয়ে বেরিয়ে যায় ।

বিকাশ ঢেঁকুর তুলে বলল, তোদের বাথরুমটা কোন দিকে?

— চ, আমার সঙ্গে । ওটা নে, ওই সিগারেটের প্যাকেটটা ।

আমার পা টলছে । বিকাশের কাঁধে হাত রেখে নেবুতলার দিকে যেতে যেতে বললাম, দারুণ নাটক লিখেছি । তুই অবাক হয়ে যাবি ।

— তোর বাবা কাকে খিস্তি করছে?

— দিদির শ্বশুরবাড়ির লোকদের । সিগারেট দে ।

বিকাশ সিগারেট ধরিয়ে দেয় ।

— ও কি বেড়াতে এসেছে?

— এখানেই থাকে । তুই চাকরিটা দে, আমি সব ব্যাটাকে দেখে নেব ।

— মেয়েটা ভালো । তোদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে ভালো স্বাস্থ্য ।

—কিরম করে হাত ভেঙে দিয়েছে যদি দেখিস—

গোলাপী উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকে, শিগগিরি আয় ভরত, মা ফিট পড়েছে ।

## তৃপ্তির ঢেঁকুর

মা আর দিদির সকাল থেকে ফুরসত নেই । এখানে ঝাড় দিচ্ছে, ওখানে গোবর নিকোচ্ছে । থালা-বাসন ধুয়ে পরিষ্কার করছে । একপাশে বমি-মাখা কাঁথা-চাদর ডাঁই করা । দিদি বলল, বাবা বিছানায় শুয়েই কাল খুব বমি করেছে । একটু পরে কাচতে পুকুরে নিয়ে যাবে । আমাদের এরকম তকতকে উঠোন দেখলাম দশ-পনেরো বছর পর ।

বাবা গরুর নাদায় জল দিতে দিতে নিজের মনে বকবক করছিল, আমাকে দেখে বলল, এক জোড়া বলদ কিনতে হবে । ক-মাস পর উত্তরের ভিটেয় তোর জন্য একটা ঘর তুলব । আঃ, হারামজাদা । ল্যাজের ঝাঁপর দিচ্ছে দ্যাখো ।

পদ্ম আজ নিজে থেকে উনুনের ধারে । ডেকচিতে জল ফুটছে । পদ্ম ঝুঁকে পড়ে জলে চায়ের গুঁড়ো ঢেলে দিয়ে হাতা দিয়ে খুব নাড়ছে ।

বিকাশের গলা পেয়ে দিদি আমাকে বলল, ওই যে, জল রেখেছি ।

ঝকঝকে পিতলের ঘটি । ঘরে ঢুকে দেখলাম, বিকাশ বিছানার ওপর বসে হাই তুলছে । আমার দিকে দুটো দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুই বাজারে যা । চাল-ফাল যা লাগে কিনবি । বড় মাছ পাওয়া যায়? যা পাস নিয়ে আয় । আমি আরেকটু ঘুমোব ।

বিকাশ আবার শুয়ে পড়ল ।

দুটো বাটিতে ধোঁয়া-ওঠা চা নিয়ে পদ্ম ঘরে ঢোকে ।

— চা কোথায় পেলি রে?

পদ্ম আমার কথায় উত্তর না দিয়ে বিকাশকে বলল, কই উঠুন । জুড়িয়ে যাবে ।

— দূর, আমি সকালে চা খাই না ।

— আপনার জন্যই তো করলাম ।

— তুমি খেয়ে নাও ।

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, একটা সিগারেট দে তো ।

পুরো প্যাকেটটাই ঠেলে দেয়, তুই রাখ ।

পদ্ম চা নিয়ে চলে যাচ্ছিল, বিকাশ ডাকে ।

— আমার বালিশটা একটু টিপে-টিপে নরম করে দিতে পারো? বড্ড শক্ত । মাথা ধরে গেছে ।

পদ্ম বালিশটা দু-হাতে নিয়ে নরম করে।

— মাথা তুলুন।

উঠে আসতে আসতে বলে, গন্ধটা খুব সুন্দর। বালিশ অব্দি ভুর-ভুর করছে। নাম কী ওটার?

— কিছু একটা হবে।

— সঙ্গে এনেছেন?

— তোমার বুঝি সেন্ট-টেন্টের খুব শখ?

পদ্ম হাসে।

বিকাশের হাতঘড়িতে দেখলুম আটটা দশ। বড় মাছ তো এখানে পাব না, স্টেশনে যেতে হবে। বললুম, আমি তবে বেরোচ্ছি। তুই সন্দেশ-টন্দেশ খাস তো?

— তোরা তো খাস। সন্দেশ-দই যা পাবি নিয়ে আসবি। আর টাকা দেব?

— না-না। শোন, এ-টাকা কিন্তু পরে তোকে ফেরত নিতে হবে।

রাস্তায় সুবলের সঙ্গে দেখা। বলল, বুড়োশিবতলায় পুলিনদা ডেকেছে। সন্ধেবেলা।

— ঠিক আছে। তুই সহদেবের কোনও খবর জানিস?

— পুলিনদা ছিল সারা রাত। আমায় কিছু বলেনি।

বউ বেঁচে আছে নিশ্চয়ই। তেমন কিছু হলে একটা খবর কি আর পেতাম না? রাতের কথা ভেবে নিজের ওপর আমার রাগ হয়। বিকাশের সঙ্গে ওইসব না-করে একটা খবর অন্তত নেওয়া উচিত ছিল। খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। যাক গে, একদিনের তো ব্যাপার। ফিরে গিয়ে চাকরির ব্যাপারটা বিস্তারিত শুনতে হবে।

ভাগ্যিস জয়বাংলাকে পেয়ে গেলাম। আমার একার পক্ষে এত জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত হত।

চালের থলে বাড়িতে নামিয়ে দিয়েই জয়বাংলা চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম, একেবারে খেয়ে যাবি।

মা'র ওই এক খারাপ স্বভাব। বেছে-বেছে সব বিকাশের পাতে দিচ্ছে। তারপর আমাকে আর বাবাকে। বিকাশ বাঁহাতে থালা ঢেকে যতই না-না করুক, মা শোনে না, জোর করে মাছের মুড়ো, বেগুন ভাজা চাপিয়ে দিচ্ছে।

জয়বাংলা শাক শেষ করে হাঁ করে বিকাশকে দেখছে। মাকে বললাম, জয়বাংলাকে তুমি বসিয়ে রেখেছ।

মা কোমর ভেঙে ভাত দিচ্ছিল, সোজা হবার চেষ্টা করতে গিয়ে মুখ বেঁকে গেল। বলল, ওর অত তাড়া কিসের? তুমি খাও বাবা।

তিনটে সন্দেশের একটা মাত্র খেয়ে বিকাশ উঠে পড়ল। দিদি জলের ঘটি হাতে পথ দেখায়।

বাবা ডান বগলের তলায় বাঁহাতে শরীরের ভর রেখে থালায় ঝুঁকে পড়ে একমনে খাচ্ছিল, মা পাঁচ-ছবার ভাত দিয়ে গেছে, এই প্রথম মুখ তুলে বলল, আর চারটি ভাত দাও তো।

মা এখনও সোহাগ করে কথা বলতে পারে, না শুনলে বিশ্বাস হয় না। আবার ভুরুও কোঁচকায়। ঠিক ওইভাবেই বলল, পেটে জায়গা রাখো। দই-সন্দেশ খাবে না?

— ওসব কাল। ঢেকে রেখে দাও। তুমি ভাত আনো। আর মাছের ঝাল।

পদ্ম ভিজে কাপড় ছপছপিয়ে উঠোন ভিজিয়ে ঘরে ঢুকল।

মা জ্বলে ওঠে, গা জ্বলে যায়! কাপড় নিয়ে ঘাটে যেতে পারিসনি?

— রোজই তো আমি ঘরে এসে কাপড় ছাড়ি।

বাবা পিঠ টান করে বসে বিরাট ঢেকুর তোলে।

মানকচু গাছের কাছে একটা ভিখিরি খঞ্জনি বাজিয়ে বেসুরো গাইছে। সুজলাবৌদি বলল, সরে দাঁড়াও, দেখি, পথ দাও তো।

হাতে একটা পোস্টকার্ড। আমার কাছে এসে বলল, আমি বরং একটু বসে যাই। খেয়ে উঠে পড়ে দিস। কী জানি কী লিখেছে। ওমা, মাসি! তোমাদের এখনও খাওয়া হয়নি।

মুখ ধুয়ে এসে চিঠি পড়ে আমি সুজলাবৌদির মুখে তাকাই। মিঠা জলে ইলিশ ভালোই আসিয়াছে। রোজই তিন-চার গণ্ডা জালে পড়িতেছে। যাত্রাকালে লুবাই আমার ডানহাতের আঙুল ধরিয়াছিল। তখনই বুঝিয়াছিলাম, ভাগ্য শুভ হইবে। এখানে সোমবার-সোমবার এক ফকির আসে। বিপদতাড়ন মাদুলি দেয়। অনেকেই লইয়াছে। লুবাইয়ের জন্য একটি লইব।

— কী রে? চুপ করে আছিস! বিপদে পড়েনি তো?

— এ তো পুরনো চিঠি!

— ওমা, তাই বুঝি? তবে যাই—

মা এঁটো জায়গায় গোবরন্যাতা দিচ্ছিল, জয়বাংলার থালাটা হাঁটুর কাছে ঠেলে দিয়ে যতটা পারল মুছে নিল । তারপর সুজলাবৌদিকে বলল, দুটো ডুব দিয়ে আসি । চলে যাসনি । চারটি খেয়ে যাবি । ভরতের চাকরি হল, শুনেছিস তো ।

— না মাসি, আমি এই খেয়ে এলাম । কুঁচো চিংড়ি দিয়ে মেটে আলুর চচ্চড়ি করেছিলাম—

— মাছের ঝাল দিয়ে দুটো খাবি, তার আবার অত কথা কী রে!

মা ঠিকই বুঝেছে সুজলাবৌদির উপোস যাচ্ছে । মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে । চিঠি পড়াবার অছিলায় চলে এসেছে । আমার বাজারে যাওয়ার কথা কারও কাছে শুনেছিল নিশ্চয়ই ।

মা পুকুরের পথে ফিরে দাঁড়ায়, না খেয়ে যাসনি যেন । ওবেলা তোকে নিয়ে বিশালাক্ষীর থানে যাব । ভরতের জন্য ঢিল বেঁধেছিলাম ।

জয়বাংলা থালা আগলে বসে আছে । মাজা থালার মতো তকতকে । মা ফিরে উঠোনে কাপড় মেলতে-মেলতে কপাল কুঁচকোয়, ওঠ এবার! একেবারে রাক্ষুসে খিদে ।

মা ভিখিরিটাকে একটা পদ্মপাতায় বিকাশের মাখা ভাত এঁটোকাঁটা তুলে দিল । সুজলাবৌদিকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল । দিদি আর পদ্মকে ডাকল ।

জয়বাংলার চোখ দরজা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে । মার হাতের প্রতিটি নড়াচড়ায় এঁটে আছে । খেতে-খেতে মার সেদিকে চোখ পড়তেই মা জয়বাংলার দিকে পিছন ফিরে বসে বলল, ওপারের যুদ্ধে কত লোক মরল, ও-বেটি কেমন বেহায়ার মতো বেঁচে রইল, মরণ!

সুজলাবৌদি বলল, ওমা! কী বলব মাসি! সেদিন পোস্টমাস্টারের বাড়ি গিয়েছিলাম, মাগীর কাণ্ড দেখে লজ্জায় মরি!

আমি উঠোনে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট খাচ্ছিলাম । দরজার কাছে এসে বললাম, খাচ্ছো, পেট ভরে খাও না! দিদি, জয়বাংলাকে চারটি ভাত দিবি?

বিকাশ দরজায় এসে দাঁড়ায় । হাতে ছোট একটা চামড়ার ব্যাগ ।

বাইরে রোদ, ঘরে অন্ধকার । বিকাশ অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে বলল, পেট ভরে খাচ্ছেন তো মাসিমা? আরে গোলাপী, কখন এলে?

মা ঘোমটা টানে, পিঠের কাপড় উঠে যায়। ঘোমটার মধ্যেই গদ-গদ হেসে বলে, ও আমাদের জেলেবৌ।

— এখানেই থাকে?

— না না, ওর বাসা জেলেপাড়ায়।

— বাঃ, চলো, তোমাদের বাড়ি যাব। চল ভরত, জেলেপাড়ায় গিয়ে খোদ জেলেবৌয়ের কাছ থেকে মাছ কিনব।

মা তেমনই হাসে, মাছ কোথায়! ব্যাটাছেলেরা সব গাঙে। দু-তিন মাস পরে ফিরবে। তখন এসো, গাঙের মাছ খাওয়াব। আজ তো তুমি কিছুই খেলে না।

## মায়ের হাসি

পুবোঠাকুরের বাড়ির ঠিক পিছনেই সূর্য অস্ত যায়। কবেকার কোন জমিদার স্বপ্নে শিবের আদেশ পেয়ে বুড়োশিবতলায় পুবোঠাকুরের পাকা বাড়ি করে দিয়েছিল। ছেলেবেলায় কালবৈশাখীর বিকেলে আমরা লুকোচুরি খেলতে আসতাম পুবোঠাকুরের ভিটেয়। লুকোবার খুব সুন্দর জায়গা। তখনই এখানে-ওখানে ভেঙে পড়েছে। দরজা জানলার কপাট নেই, একটু অন্ধকারেই রাক্ষসের চোখের মতো।

সূর্য ডুবে গেছে। গাছপালা কালো। সন্ধের ঝুলকালি মেখেছে। শুধু দূরের আকাশে একটা অদ্ভুত ধরনের রং তখনও দেখা যায়। পুলিন আমাদের বোঝায়, এটা ঠিক যে বাঁচতে হলে রক্ত চাই। আমরা রক্ত দেব না, রক্ত নেব। এতদিন যারা আমাদের রক্ত চুষে দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেঁচে আছে, এবার তাদের রক্ত নিতে হবে। আমাদের এই অঞ্চলকে স্বাধীন করতে হবে। এদিককার গ্রামের পর গ্রাম হবে মুক্তাঞ্চল।

পুলিনের ঠিক পিছনে এক ঝাঁক জোনাকি জ্বলছে-নিভছে। পুলিন যে স্বপ্ন দেখায়, তাতে আমার বড় ভয় করে। পুলিনের ভাই এখন কোথায়? যে মাটি দিয়ে যা খুশি বানাতে পারত। চিটেগুড়ে খই মেখে একবার রাজহাঁস বানিয়েছিল। অনেকদিন তাকে দেখা যায়নি।

বাড়ি ফিরে দেখি, বিকাশ নেই। মা বলল, সেই সে ঘুরতে গেল বিকেলে আর আসেনি।

মার দিকে তাকানো যায় না। এই আমার মা! ক্ষইতে-ক্ষইতে গাছের শুকনো ডালের মতো চেহারা হয়েছে। সংসারের শতেক জ্বালা মাকে একেবারে নিংড়ে নিয়েছে। সংসার

নিয়ে মার তবু ভয়-ভাবনা, স্বপ্ন-আশা শেষ হয়নি। হাড়-পাঁজরের নীচে মার হৃদয়ে এখনও কত দপদপানি। বালি খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন জল বেরোয়, ঠিক সেইরকম। সত্যি সত্যি মুক্তাঞ্চল হবে? কপি পাতার মতো ঝলমলে নতুন দেশ? মাকে দেখে আমি আচমকা বললাম, এবার দেখো মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

— হ্যাঁ বাবা। আমি মানত করেছিলাম, আজ ঢিল খুলে পুজো দিয়ে এসেছি। এবার তোর একটা বউ আনতে হবে।

মা অনেকদিন পর মুখ ভরে হাসে।

চাকরিটার কথা ভেবেই মা নতুন করে জেগে উঠেছে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা কি আমার ঠিক হবে? বিকাশকে কোথাও দেখছি না। আকাশে অল্প তারা। অন্ধকার ঘন হলে ও পথ খুঁজে পাবে না।

## রহিম চাচার ভিটেয়

রহিমচাচার ভিটের দিক থেকে কে হেঁটে আসছে। শূন্য ভিটে। অন্ধকার ঝোপঝাড়। চারদিকে ঝাঁক-ঝাঁক জোনাকি। কেমন একটা অলক্ষুণে ভাব। জেলেপাড়ায় যায়নি তো?

মানুষটা হনহন করে এসে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। সুজলাবৌদি। যেন ভূত দেখেছে।

— সাহস বলিহারি। তুমি কি ছেলের পাশেই মরতে চাও নাকি?

ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কেটে যায়। নাকের পাটা ফুলে-ফুলে ওঠে।

— মরি-বাঁচি তোর কী রে?

সুজলাবৌদি থক করে একবার থুতু ফেলে আবার বলে, আমার জন্য তুই এত ভাবিস কেন, অ্যাঁ? আমি তোর কে, অ্যাঁ? তোর কিসের অত মাথাব্যথা? যার ভাববার কথা, সে বলে কোন গাঙে বাসরঘর বেঁধে দিব্যি সুখে আছে, বল, সুখে আছে কিনা বল, অ্যাদ্দিন হল, একটা খবর নিয়েছে? নিজের একটা খবর দিয়েছে?

হাঁটতে হাঁটতে বললাম, জলাদা তো মাছ ধরতেই গেছে।

সুজলাবৌদি কি পাগল হয়ে গেল? হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আমার বুকের কাছটা খামচে ধরে, বুকে দুম-দুম করে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলল, একা মেয়েমানুষ— আমার কী করে চলে, একবারও ভেবেছে মানুষটা?

বলতে বলতে হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে। মুখে মদের গন্ধ। কাল রাতের সেই বিলিতি। আমার ভুল হয়নি।

এক ঝাঁকুনি দিয়ে সুজলাবৌদিকে সরিয়ে দিয়ে আমি গর্জে উঠি, বিকাশ কোথায়?

— আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন?

— তুমি জানো। তুমি বিকাশের কাছে গিয়েছিলে।

— আমি কিছু জানি না। পথ ছাড়, বাড়ি যাব।

— মিছে কথা। রহিমচাচার ভিটেয় তুমি কী করতে গিয়েছিলে?

আমি সেদিকে পা বাড়াতেই সুজলাবৌদি পিছন থেকে খপ করে আমার জামা টেনে ধরল!

— ও ভরত শোন, তোকে সত্যি বলছি। লুবাইকে আমি ঠাকুরের পেসাদী ফুল দিতে গিয়েছিলাম। তোর মায়ের সঙ্গে তখন বিশালাক্ষীর থানে গিয়েছিলাম না?

— তুমি মিথ্যে বলছ। তোমার মুখে বিলিতি মদের গন্ধ।

— অ্যাঁ। তা মানুষের মুখে কতরকম গন্ধ হয়— লুবাইয়ের মুখে তো আমি কচি তালশাঁসের গন্ধ পেতাম—

সুজলাবৌদির আঁচলের খুঁটে আমার চোখ বিঁধে যায়। গেরো দিয়ে কিছু একটা বেঁধে রেখেছে। আমার চোখে একপলক চোখ রেখে সুজলাবৌদি আঁচল কাঁধে তুলে বলে, একটু এগিয়ে দিবি ভাই? বড্ড অন্ধকার।

## ভাতে চিতার বাস

অমাবস্যা আমার কোনওদিনই ভালো লাগে না। অন্ধকারে গাছপালা মিশে আছে, রাস্তা মুছে গেছে, দিক ঠাওর করা যায় না, তার ওপর হোঁচট খেয়ে বুড়ো আঙুল জ্বলছে। বাবা আজ লাঙল দিতে গিয়ে মাটির নীচে শাঁখা-সিঁদুর পেয়ে থম মেরে গেছে। কেউ নিশ্চয়ই বাণ মেরেছে। অন্ধকারে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে হায়-হায় করে উঠছে। দাওয়া থেকে শোনা যায়। কাল ভোরে যাবে গুণিন ডাকতে।

বিকাশ ফিরল জয়বাংলার সঙ্গে। দেখা হল কোথায়? আমাকে দেখেই ছেলেটা পিছন ফিরে দৌড়।

বিকাশের মতিগতি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। কী চাকরি, কোথায় চাকরি, সারাদিনে বলবার সময় পেল না, শুধু খেয়াল-খুশি নিয়েই আছে। চাকরির কথাটা হয়তো গাঁজা। মদের ঝোঁকে বলে ফেলে এখন এড়াতে চাইছে। ওরকম মোদো-মাতালের কথায় বিশ্বাস কী!

বিরক্তি চেপে বললাম, সন্ধে থেকে খুঁজছি, গিয়েছিলি কোথায়?

বিকাশ হাসে, ঘুরেটুরে দেখলাম একটু।

— অন্ধকারে গাঁয়ে কেউ বেড়ায় না।

বিকাশ সোজা ঘরে ঢুকে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে সিগারেট ধরিয়ে বলে, পদ্মাতীর অব্দি গিয়েছিলাম।

— তুই কি কালই ফিরে যাচ্ছিস?

— হ্যাঁ। সকালের ট্রেনে। সিগারেট খা—

— জিভ খসখসে হয়ে গেছে। চাকরির কথাটা বললি না তো?

— বলব— একটু পরে।

হাত-পা এলিয়ে শুয়ে আছে। চোখ বোজা। মাঝে মাঝে শিথিল হাত মুখের কাছে এনে সিগ্রেটে আলতো টান দেয়। পাশের ঘরে বাবার হায়-হায়। একবার ভরত রে বলে ককিয়ে উঠল।

বাইরে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। দূর থেকে জয়বাংলার বাঁশি ভেসে আসছে। দিদি একরকম জোর করে বাবাকে খেতে বসায়, বাবা, ও বাবা, মুখে তোলো, ভাত নষ্ট হবে যে।

— ভাতে চিতার বাস পাই!

বাবার গলা। শাঁখা-সিঁদুর দেখে খেতেই ঝিম মেরে বসেছিল, রাতে মা গিয়ে বাবাকে ঘরে আনে। অনেকক্ষণ সামলেছে, তারপর নিজেই দাঁতকপাটি লেগে পড়ে আছে। হাতের মুঠোয় একটুকরো তালপাটালি। বাবার জন্য ঘটিতে জল ভরতে বসেছিল। মুঠো খোলে কার সাধ্য।

## সুখের হদিশ

মার গোঙানি শুনে বিকাশ উঠে বসে। ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে। তারপর উঠে গিয়ে নিজেই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে এসে আমাকে চোরাচালানের গুপ্তকথা

বোঝায় ।

ধোঁয়া ছেড়ে ব্যাখ্যা করে, বর্ডার তোর বাড়ি থেকে সাত মাইলও না ।

কলকাতায় তোকে ঘর দেব, মাইনে দেব । শহরে থাকবি, খাবি, ফুর্তি করবি । মাঝে মাঝে বাড়ি আসবি । টুকটাক দুটো-একটা মাল, দুয়েকটা মেসেজ বর্ডারে পৌঁছে দিবি । ওখানে চায়ের দোকান আছে । খাবার দোকান আছে । আমাদেরই লোক । তুই শুধু পৌঁছে দিয়েই খালাস । সামান্য কাজ । লোকে জানবে, তুই কলকাতায় চাকরি করিস । আমাদের উদ্বাস্তু অনাথ সেবা সমিতির অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টারে তোর নাম থাকবে । সিগারেট খাচ্ছিস না?

— জিভ খসখস করছে ।

বিকাশ সুখ-সচ্ছলতার আরও হদিশ দেয়, সাকসেসফুলি এটা করতে পারলে, পরে তোকে আরও বড় দায়িত্ব দেব । সে কাজে মাইনেও অনেক বেশি । আশপাশের গ্রাম থেকে একটু স্বাস্থ্যবতী দেখে চেনা-জানা মেয়ে কলকাতায় পাঠাতে পারবি? নিজে আড়ালে থেকে পাঠাতে হবে । গ্রামের সবাই জানবে, মেয়ে নিজের ইচ্ছেয় চলে গেছে । হয়তো কাজ পেয়েছে, বা কাজের খোঁজ পেয়েছে, কি কারও সঙ্গে প্রেমে পড়ে ঘর ছেড়েছে । চাকরি, বিয়ে, সিনেমায় চান্স করে দেওয়া— সবরকম লোভ দেখিয়ে তোকে কাজ সারতে হবে । যে যাতে ভোলে । কলকাতার ঠিকানায় একবার হাজির করতে পারলেই তোর কাজ শেষ । তুই রাজি হলে, সব তোকে বুঝিয়ে দেব ।

বিকাশ হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে এসে বলল, তুই আমার স্কুলের বন্ধু । এত অভাবে কষ্টে তুই কদিন বাঁচবি? আমার কথা শুনে নিশ্চয়ই পাপ-পুণ্য নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করছিস? তোর মা-বাবা খেতে পায় না । তোর এত বয়েস হল, এখনও বিয়ে করতে পারলি না । কোনও মেয়ের শরীর ছুঁয়ে দেখেছিস? তোর কী ভবিষ্যৎ? এভাবে সবদিক থেকে তোকে বঞ্চিত রাখাটা কোন ন্যায়বিচার শুনি? আর পাপ? কাকে পাপ বলিস? আমার একটা ডায়রি আছে, তাতে তারিখ দিয়ে দিয়ে মেয়েদের নাম লিখে রাখি, যাদের সঙ্গে আমি অন্তত একবার সেক্স করেছি । আমি কি পাপী হয়ে গেছি? ভালো করে ভাব । ভেবে দ্যাখ । রাজি?

— রাজি ।

— কালই কলকাতায় আয় । সব বুঝিয়ে দেব । টাকার কথা বলছিলি, এখন কত চাই? বলে সে আমাকে তার কলকাতার ঠিকানা বোঝায় ।

## নির্জনে কান্না

তৃতীয় ঘণ্টা দিতেই চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। বিকাশ ট্রেনের জানলা থেকে বলল, কাল দেখা হচ্ছে!

আমি মাথা কাত করি।

গতি বাড়ছে। বিকাশ এক ঝটকায় দরজার কাছে এসে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, তোর দিদির নাম কী রে?

— কামিনী।

— আর ওই জেলেবউটার?

ট্রেনের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। আমার চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। মাথার মধ্যে আগুন লাফিয়ে ওঠে। পুলিনের পাইপগান এখন আমার হাতে থাকলে...ট্রেন আমার সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি লাফিয়ে শেষ কামরায় উঠে পড়লাম।

গার্ডের কামরা। চলন্ত গাড়ি থেকেই আমাকে নামিয়ে দিতে পারলে খুশি হয়। হ্যান্ডেল ধরে পাদানিতে নেমে দাঁড়িয়ে বললাম, সামনের স্টেশনে নেমে যাব।

ট্রেনের চাকায় আওয়াজ ওঠে, রক্ত নিন জীবন বাঁচান, রক্ত নিন জীবন বাঁচান। স্টেশনে থামতেই নেমে এগিয়ে গেলাম। কামরায় কামরায় জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুঁজি। এক মিনিট থেমে ট্রেন ছেড়ে গেল।

রেললাইন ধরে হেঁটে ফিরতে ফিরতে আমার হঠাৎ জ্যাঠার কথা মনে পড়ে কান্না পেয়ে গেল। চারদিকে শুধু মাঠ আর আকাশ। এখানে বুক উজাড় করে একটু কেঁদে নিলে আমার মা-বাবা তো আর জানতে পারবে না!

প্রথম প্রকাশ : অমৃত, ৯ ও ১৬ জানুয়ারি, ১৯৭৯

# শেতলের খিদে

শেতল চুপি চুপি নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, দেখল কালীপদ পুব-মুখো হয়ে পাশের উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। এত ভোরে পুব-মুখো! শেতলের কাপড়ের নীচে একগোছা ধানের শিস, পেটের কাছটা একটু একটু ফুলে আছে। দাঁড়ালেই কালীপদর চোখে পড়বার ভয়, সেসব ভুলে সে চোখ তীক্ষ্ণ করে কালীপদর মুখ দেখল। যা ভেবেছে, নাক লাল! দিনের প্রথম রোদ লাগাতে উঠে এসেছে। গ্রামের সাঁইতিরিশ জনের চোদ্দ জনই কুষ্ঠরোগী, শেতল আঙুলে গুনে রেখেছে। কালীপদকে নিয়ে পনেরো হল। ভয়ে সে সিঁটিয়ে গেল। কালীপদ তার ঠিক পাশেই থাকে!

শেতলের সবচেয়ে অসহ্য, নিজের মুখভরা বসন্তের দাগ। এমনিতে শুকনো, প্যাকাটির মতো চেহারা, কিন্তু অসুখকে তার খুব ভয়। গ্রামে কুষ্ঠ লাগতে দেখেই সে পালাবে ঠিক করেছিল। তার নিজের বলতে এই একটা মাটির ঘর। সাহস করে ছাড়তে পারেনি।

ঘরে ঢুকে কাপড়ের তলা থেকে কোমরে-গোঁজা ধানের গোছা নামিয়ে রেখে শেতল গভীরভাবে ভাবতে বসল। ধানে তার আর রুচি নেই। একবার অন্যমনস্কভাবে একটা ছড়া তুলে নিয়ে একটা ধান খুঁটে মুখে দিল। মিষ্টি দুধে ভরা। তখুনি থু-থু করে ফেলে দিল। পাশের বাড়িতে কুষ্ঠ, এখানকার কোনও জিনিস আর মুখে দেওয়া যায় না!

শেষ রাতে বেরিয়েছিল, সকালের হাওয়ায় তার ঘুম পাচ্ছে, বসে বসেই ঢুলতে লাগল। হঠাৎ চিত্তরঞ্জনের কথা মনে পড়ে সে সোজা হয়ে বসে। জায়গাটা ভারি পরিষ্কার, তকতকে রাস্তা, ঝকঝকে ঘরবাড়ি। দু-হাতে চোখ রগড়ে শেতল তখনই চিত্তরঞ্জনের রাস্তা ধরল।

হাঁটলে ঘাম হয়। তার ভুরু নেই, ঘাম গড়িয়ে চোখে ঢোকে। হাঁটতে হাঁটতে হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম চেঁছে ফেলে শেতল জিভ দিয়ে দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত বের করে চাটতে লাগল। খিদে পেলে সে নিজের মাড়ির রক্ত টেনে বের করে খায়। ভাত-টাতের খিদে তার আজকাল হয়ই না। একবার বর্ধমান স্টেশনে পকেট মারতে গিয়ে সে প্রচণ্ড মার খায়। ঠিক তিনদিন পরে ট্রেন থেকে একটা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে। পরদিন, সবে সূর্য উঠছে, শেতল তার ঘরে শুয়ে গায়ের ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে দেখল, একটা ভিখিরি নির্জন রাস্তায় তার পোটলা রেখে সামনের

ঝোপের মধ্যে পায়খানা করতে বসেছে। একটু পরে দূরে একটা গর্তে বৃষ্টির জল দেখে লোকটা যেই জলের দিকে এগিয়েছে, শেতল ব্যথা ভুলে দৌড়ে গিয়ে পোটলাটা নিয়ে ঘরে ঢুকেই তার মধ্যে যা পেল পেটে ঢুকিয়ে দিল। শুকনো ভাত গলায় আটকে তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, সেই অবস্থায়ও তার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। ভিখিরিটা তার পোটলা না পেয়ে চিৎকার করে চোরকে গাল দিচ্ছে। আর শাপমন্যি করছে। কয়েকটা গালাগাল আর অভিশাপ এমনকি শেতলও আগে কখনও শোনেনি। লোকটা প্রায় বিকেল পর্যন্ত ওইখানে বসে চিৎকার করল, মাঝে মাঝে গালাগাল থামিয়ে পোটলার জন্য বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদল, তারপর একসময় চলে গেল।

শেতলের ঘরে দরজা-জানলা নেই। সারা সন্ধে ঝিঁঝির ডাক শুনতে শুনতে সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, পৃথিবীতে দু-বেলা ভাত জোটানো ভারি শক্ত ব্যাপার। সেই থেকে সে কোনও দিন বন-বাদাড় ঘুরে মরা শালিকের ঝোল খায়, কোনওদিন ডাবের কুঁড়ি সেদ্ধ করে খেয়ে নেয়, যেদিন ধানের ছড়া পায়, চিবোয়। একদিন একটা মরা কাক খেয়ে তিনদিন ধরে বমি করেছিল। আজকাল সে প্রায় কিছুই খায় না, নিজের রক্ত ছাড়া। সারা বছরই তার দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে, জিভ লাগিয়ে টেনে নিলেই হল। একটু নোনতা নোনতা, ভারি সুস্বাদু। খাবার সময় তার মুখ দেখে মনে হয়, স্বপ্নের ঘোরে সে তার সবচেয়ে পছন্দের জিনিসটা তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে।

চিত্তরঞ্জনের বাজারে পৌঁছে শেতল দেখল, পাজামা আর হাওয়াই শার্ট পরা মোটা মতো একটা লোক দু-হাতে বাজার-ভর্তি দুটো থলে নিয়ে থপ থপ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। মুখ-গলা ঘামে জ্যাবজেবে। একটা ব্যাগ থেকে রুইয়ের ল্যাজ ঝাঁকুনি খেয়ে নাচছে। শেতলের তখন ভয় করবার সময় নয়, দাঁড়িয়ে ভাববারও তার সময় নেই, ঝাঁ করে সে ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে বলতে যাচ্ছিল, আপনার বাড়িতে কাজের লোক লাগবে? হঠাৎ চোখে পড়ল লোকটার পিছনে, বাঁদিকে ইলিশের স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে ফরসা টকটকে একজন মেয়েছেলে একটা ইলিশ তার পছন্দ মতো খণ্ড খণ্ড করে কাটিয়ে নিচ্ছে। অপূর্ব সুন্দরী। বাঁ-হাতে শাড়ির কুঁচি অল্প তুলে ধরেছে, ডান-হাত বাড়িয়ে মাছওলাকে নির্দেশ দিচ্ছে, কোথায় কটা টুকরো করতে হবে।

শেতল মোটা লোকটার পাশ কাটিয়ে মেয়েলোকটার পাশে গিয়ে দম নিয়ে কপালে জোর হাত ঠেকাল, পেন্নাম মাঠাকরুন। তারপর বিড়বিড় করে বলল, বাড়িতে আপনার কাজের লোক রাখবেন?

মহিলা শেতলকে দেখে ভুরু কুঁচকে বাঁ-পাশে এক-পা সরে দাঁড়াল।

ভিখিরি ভাবল নাকি? মহিলাটি লম্বায় শেতলের মাথা ছাড়িয়ে যায় । শেতল মুখ তুলে প্রাণপণে বলল, আমি ভিখিরি না । সবরকম কাজ জানি ।

শেতলের মুখে দুর্গন্ধ ভকভক করছে । ডানহাতে কোমরের রুমালটা নিয়ে নাক চেপে মহিলাটি বলল, আমার কাজের লোক আছে ।

শেতল নিরাশ হবার চেয়েও বেশি ভয় পেল । এমনিতেই বাজার-টাজারে তার দারুণ ভয় । মনে হয় এই বুঝি কোনও দোকানদার লাফ দিয়ে এসে তাকে চড়ঘুঁষি মারতে আরম্ভ করল । ভিড় দেখলেই শেতল স্পষ্ট দেখতে পায় লোকেরা তাকে তলপেটে লাথি কষাচ্ছে । চুলের মুঠি ধরে তার মুখ আকাশে তুলে ঘুঁষি মেরে তার ভুরু ফাটিয়ে দিচ্ছে । কল্পনাটা এত জীবন্ত হয়ে ওঠে যে শেতল ওইসব সময় হাত দিয়ে ঘন ঘন মুখ মোছে । নাকের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে দ্যাখে রক্ত পড়ছে কিনা ।

দায়ে পড়ে খুব সাহস করে সে বাজারে ঢুকেছিল, দূর থেকে মোটা লোকটাকে কষ্ট করে ব্যাগ বইতে দেখে তার আশা হয়েছিল লোকটা তাকে কাজ দেবে, এর মধ্যে এই মেয়েছেলেটাকে দেখে তার কী যে দুর্মতি হল! শেতল হন-হন করে, প্রায় লাফাতে লাফাতে ফাঁকা রাস্তায় পড়ে দেখল দূরে সেই মোটা লোকটা তখনও থপ থপ করে হেঁটে যাচ্ছে । একবার পায়ের পাতায় একটা ব্যাগ দাঁড় করিয়ে রেখে সে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বোধহয় রিকশা-টিকশা খুঁজল । শেতল জোরে পা চালিয়ে লোকটার সামনে এসে খুব আন্তরিকভাবে হাতজোড় করে বলল, পেন্নাম বাবু ।

মুখে বসন্তের দাগ, ভুরু নেই, নাকের নীচে ঠোঁট ফেটে দু-ভাগ— হাঁফাতে-হাঁফাতে ভদ্রলোকের ভুরু একটু কুঁচকে গেল, একেই বাজারে দেখলাম না? বাড়িতে কাজ চায় শুনে শেতলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে তখুনি তার হাতে ব্যাগ দুটো ধরিয়ে দিয়ে বললেন, দেশ কোথায়?

— বর্ধমানেই, গাঁয়ে ।

— গাঁয়ের নাম?

শেতলের নিজের গ্রামের কুষ্ঠখ্যাতি আছে, সে অন্য একটা নাম বলে দিল ।

চমৎকার একটা দোতলাবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ভদ্রলোক ঘাড় ঘোরালেন, দফায় দফায় দম নিয়ে বললেন, একটা ফটো তুলতে হবে । বিকেলে স্টুডিওয় নিয়ে যাব । তোমার নাম ঠিকানা আর ফটো থানায় রাখতে আপত্তি নেই তো?

শেতলের বুকটা গুড়গুড় করে উঠল, গলায় হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আমি তো চোর-ছ্যাঁচোর নই!

গ্রিলের দরজা ঠেলে ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলেন, বাঁদিকে ফুলের বাগান । অনেক রকমের গাছ, লাল সাদা গোলাপ ফুটে আছে । শেতল মুগ্ধ । ফুলের গন্ধে সে চুপি চুপি একটা নিশ্বাস টানছিল, ভদ্রলোক বললেন, তবে আর কী! তবে তো তোমার আপত্তি নেই, অ্যাঁ!

বাগানের ধার ঘেঁসে কাঁকর-বেছানো পথ । শেতলের পায়ে জুতো নেই, কাঁকর ফুটছে, ভদ্রলোকের কথায় তার চিনচিনে ভয়ের ভাবটা আবার চাগিয়ে উঠতেই সে চাপা দিয়ে বলল, না, আপত্তি কিসের?

— আমার বাগান পরে দেখাব । বাড়ির পিছনেও আছে । এখন ওপরে চলো, দেখি, কী-কী কাজ জানো ।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে শেতল চনচনে খিদে টের পায় । সে শব্দ না করে জিভ দিয়ে বাঁদিকের দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত টেনে নিল ।

সারাদিন শেতলকে চোখে চোখে রেখে সন্ধের দিকে ভদ্রলোক বললেন, ইংলিশ ক্যালেন্ডার মানথের পয়লা তারিখে তিনটে করে করকরে দশ টাকার নোট তুমি পাবে ।

শেতলের কাজের হাত পরিষ্কার । ভদ্রলোক খুশি । আজ যাব, কাল যাব করে ছবি তুলতে আর গেলেনই না । বউকে বললেন, লোকটা সৎ । একটু বোকা । বোকা না হলে কেউ ভালো চাকর হয় নাকি । মনে হচ্ছে, ওর ইহকাল আমাদের কাছে কাটবে ।

থলথলে চেহারা, বিরাট ভুঁড়ি, মাথার মাঝখান দিয়ে লম্বা টাক, অথচ বউটা অনেকটা সেই ইলিশমাছের মেয়েছেলেটার মতো । শেতলকে পেয়ে সেও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে মনে হয় । বোঝা যাচ্ছে না ছোট মেয়েটার মনের কথা । এত বয়েসের মেয়েছেলের এতটুকু মেয়ে! বেশি বয়সে বিয়ে হয়েছে, নাকি দেরিতে বিইয়েছে? মেয়েটা একটু বেশি রাগী । এর মধ্যেই একবার শেতলকে বলেছে, এক লাথি মারব ।

দুদিন পরে শেতল বুঝল লাথি মানে মেয়েটা জানে না । কিছু হলেই বলে লাথি মারব, আসলে দুম-দুম করে ঘুঁষি মারে ।

শেতল বিকেলবেলা জুতো পরাচ্ছিল, পায়ে ঢোকাতে গিয়ে একটু ঘষা লেগেছে কি লাগেনি, মেয়েটা আঃ করে উঠেই বলল, এক লাথি মারব! বলেই শেতলের মাথায় দুম

করে এক ঘুঁষি। একটুতেই তার রাগ আর কথায় কথায় ওই লাথি মানে ঘুঁষি। যাকগে কর্তাগিন্নি যখন খুশি, একটা পুঁচকে মেয়ে আর তার কী করবে!

সমস্যা একটাই, শেতল একদম খেতে পারে না। এক কাপ চা খেতেও তার ইচ্ছে করে না। অনেক কাল না-খেয়ে ডাল-ভাতে তার রুচি চলে গেছে। ও সব খিদেই আর নেই। এখন তার একটাই খিদে, পেলেই চুপি-চুপি জিভ লাগিয়ে টেনে নেয়। একটু নোনতা-নোনতা, চমৎকার। জিভে আর টাগরায় যতক্ষণ পারে নাড়াচাড়া করে খুব তৃপ্তির সঙ্গে গিলে নেয়। ভাত বড় পানসে।

ভাত খায় না, বউটা বিরক্ত। দুপুরের শোয়ে সিনেমায় যাবে, বাবু গেছেন আসানসোলে তার মদের দোকানে, তাড়াহুড়োয় খেয়ে উঠে বড় আয়নার সামনে বসেছে। এখন এক ঘণ্টা মুখে এটা-সেটা মাখবে, চোখে কাজল দেবে, চুলে ব্রাশ বোলাবে, ঠোঁটে রং লাগাবে, টিপ পরবে, আরও কী-কী। প্লেটে ভাত ফেলে উঠে গেছে, শেতল সাবধানে একটা-একটা করে প্লেট-টেvট তুলে নিচ্ছে, বউটা ডাকল, শেতল—

শেতল এঁটো হাত পিছনে রেখে ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

হাতে কাজল লাগাবার তুলির মতো সরু কী একটা, আয়নায় ঝুঁকে এক চোখে লাগাচ্ছিল, শেতলের পায়ের শব্দে সোজা হয়ে বসে বলল, আমার প্লেটে অনেকটা ভাত আছে। নষ্ট কোরো না, তুমি খেয়ে নিও।

শেতলের মাথায় ঘাড়ের দিকটায় চ্চন করে শব্দ হল, আমি ভাত খাই না।

— দুপুরেও রোজ রুটি খাও?

— আমার ভাত-রুটির খিদে হয় না।

বউটা আবার আয়নায় ঝুঁকে ছিল, পিঠ টান করে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, এখানে রোজ তবে কী খাও?

শেতল জিভ সামলায়, ওই যাহোক একটু মুখে দিই, খিদেই হয় না।

— তোমার কোনও অসুখ আছে না-কি? যা একখানা স্যান্ডো-মার্কা চেহারা বানিয়েছ!

বেরোবার আগে একটা একটা করে সব ঘরে চাবি দিয়ে শেতলকে বলল, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন খোলা রইল। ময়না নাচের স্কুল থেকে ফিরলে দুধ গরম করে দেবে, বিস্কুটে মাখন মাখিয়ে দেবে।

রাতে বন্ধ জানলার বাইরে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে শেতল শুনল বউটা বাবুকে বলছে, কম খাওয়া ভালোই, খরচ বাঁচবে। গ্রামের লোকগুলো যা খায়! কিষেণ খেতো, মনে আছে— একেক বেলা তিনজনেরটা! মুশকিল হচ্ছে, কম খেয়ে শেষে অসুখে না পড়ে। তা হলেই গেছি বাবা। যা চেহারা, দেখে ভয় করে, টিবি-ফিবি নেই তো?

বিরাট একটা হ্যাঁচ্চো দিয়ে বাবু বললেন, তুমি কি সারারাত আয়নার সামনেই বসে থাকবে? এখন ছাড়ো তো ওসব!

পরদিন দুপুরে খেয়ে উঠেই বাবু রান্না ঘরে ঢুকলেন। শেতল কী একটা ভাবতে-ভাবতে জিভ দিয়ে দাঁতের গোড়া চুষছিল, চোখের তারায় ভাবনার ছায়া চিকচিক করছে। বাবুকে দেখে থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল।

— কই তোর থালা দেখি।

— আজ্ঞে থালা তো নেই।

— নেই তো খাস কিসে?

— আমার খিদে হয় না।

ভেতরের ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বাবু বললেন, মায়া! কিষেণের থালাবাটি একে বের করে দাওনি?

বলতে-বলতে নিজেই নিচু হয়ে মিটসেফের তলা থেকে কলাইয়ের থালাবাটি-মগ বের করে আনলেন, এই তো! ধুলো পড়ে আছে। অ্যাদ্দিন খেলি কিসে?

— ওই একটু-আধটু— মোটে খিদে হয় না, হাতে করেই—

— ভাত-ডাল ঢাল। মাংস নে। চেটে-পুটে খাবি। পেটে না-খেলে কাজ করবি কী করে? আন, ভাত আন!

শেতলের তখন চনচনে খিদে, লোকটার সামনে জিভ নাড়াতে পারছে না, থালায় ভাত তুলতে-তুলতে রাগে তার কাটা ঠোঁটটা তিরতির করে উঠল। এক যুগ পরে ভাত খেয়ে দৌড়ে গিয়ে নীচের পায়খানায় হড়-হড় করে বমি করে দিল।

বাসন ধোয়ার শব্দে আবার বাবু এলেন, তোর থালা আলাদা ধুচ্ছিস তো? আমাদের প্লেটের সঙ্গে ছোঁয়াসনি যেন।

— আজ্ঞে, সে আমি জানি।

বাবু খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটছিলেন, থুঃ করে এক টুকরো মাংস ছিটিয়ে বললেন, একটু গরম জল দে তো, শেভ করব। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আজ একটু কাজ আছে।

জল দিয়ে, বাসন তুলতে-তুলতে শেতল মাড়ি থেকে বেশ খানিকটা রক্ত বের করে ফেলল। জিভে নিয়ে খাচ্ছে, বাবুর গলা কানে এল, শেতল! বাথরুম থেকে ডেটলের শিশিটা নিয়ে আয় তো, জলদি।

শেতল ডেটল নিয়ে ঘরে পা দিতেই তার বুকের মধ্যে কে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল! শিশি হাতে সে ঠিক একটা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ বাবুর থুতনিতে। জোঁকের মতো এঁটে আছে। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। একদম তাজা।

— রক্ত দেখে তোর মূর্ছা হয় নাকি? ডেটলটা দে।

শেতল ধাতস্থ হয়। চোখের দৃষ্টি এদিক-ওদিক করে লুকোয়। কাছে এসে ডেটলের শিশিটা টেবিলে রেখে চেষ্টা করেও থুতনি থেকে আর সে চোখ সরাতে পারে না।

বাবুর গলায় খাঁটি বিরক্তি, তুলো আনিস নি? তুই একটু বেশি বোকা। তুলো ছাড়া লাগানো যায়? ওই ড্রয়ারে আছে, বের কর।

তুলো ছিঁড়ে শেতল নিজেই ডেটলে ভেজাতে ভেজাতে উত্তেজনা চেপে বলল, আমি লাগিয়ে দিই?

— তাড়াতাড়ি কর।

শেতলের হাত কাঁপছে। সে ঝুঁকে চট করে মাঝের আঙুলে খানিকটা রক্ত তুলে নিয়ে আঙুলটা মুড়ে তালুর মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। তারপর তুলো দিয়ে কাটা জায়গাটা আস্তে-আস্তে মুছে দিল।

তার গলা কাঁপছে, এটা কি লাগানো থাকবে?

— জ্বলে যাচ্ছে! একেবারে র লাগিয়েছিস। থাক, ছেড়ে দে।

শেতল সোজা নিজের পায়খানায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ঘুলঘুলি দিয়ে অল্প আলো আসছে। আঙুলের ডগার রক্তটা তখনও শুকোয়নি, শেতল চোখের একদম সামনে নিয়ে রক্তের রং দেখল। নাকের কাছে আঙুল তুলে বড়-বড় নিশ্বাসে গন্ধ শুঁকল। মুখের কাছে নিয়ে একবার মাত্র জিভ ছোঁয়াল। তারপর আঙুলের ডগা চেটে রক্তটুকু সে জিভে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করল, গিলে ফেললে পাছে জিভ থেকে স্বাদটুকু মুছে যায়। খাওয়া হয়ে গেলে সে এমনভাবে আঙুলের ডগাটা চুষতে লাগল যে রক্তের ফিকে

দাগটুকুও পরিষ্কার হয়ে তার আঙুলের চামড়া কুঁকড়ে গিয়ে ধপধপ করতে লাগল। অনেকক্ষণ জল ঘাটলে যেমন হয়।

সারারাত শেতলের ঘুম হল না। নিজের রক্ত সে অনেক খেয়েছে, অন্যের রক্ত এই প্রথম। স্বাদই আলাদা! ঠিক মনে হয় জিভে এখনও লেগে আছে। মাঝরাতে তার খুব খিদে পেল। সে জিভ নাড়ল না। নিজের রক্ততে তার আর রুচি নেই। ভোর পর্যন্ত সে শুধু নতুন রক্তের স্বাদ মনে মনে নাড়াচাড়া করে কাটাল।

পরদিন সকালে ময়না স্কুলে যাবে, টেবিলে তার খাবার দিয়ে শেতল একটু দূরে দাঁড়িয়ে ফুটফুটে মেয়েটাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ বাবুর অফিসঘরে গিয়ে একটা পিন তুলে নিল। সে তার নিজের পায়ের আওয়াজকেও ভয় পাচ্ছে। লুকিয়ে ময়নার একপাটি জুতো নিয়ে সে নীচের পায়খানায় গেল। ছোট্ট জুতো। তলা থেকে পিন ফুটিয়ে ডগাটা ভেতরের দিকে একটুখানি বের করে রাখতে তার কপাল ঘেমে উঠল।

ময়নার খাওয়া হয়ে গেছে। কোমরের বেল্ট এঁটে নিয়ে সে গলা তুলে ডাকল, শেতল! শিগগির এসো। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

শেতল প্রথমে ডানপায়ের জুতো পরিয়ে দিল। খুব নিচু হয়ে ফিতে বাঁধছে, ময়না নিজেই আরেক পাটিতে পা গলিয়ে দিয়ে বলল, আ! মারব এক লাথি। তাড়াতাড়ি করো না।

সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েই জোরে একবার উঃ করে উঠল, তারপর এক ঝটকায় বাঁপায়ের জুতো খুলে ফেলে তার কচি গলা চিরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, ও মা, ও বাবাগো!

শেতল চট করে পিনটা খুলে পকেটে পুরল। তারপর, বিছে বিছে, ওই যে পালাচ্ছে, কাঁকড়া বিছে— বলে চেঁচাতে লাগল।

বাবা বাথরুম থেকে ছুটে এসেছিলেন, মা দৌড়ে এসে ময়নাকে বুকের মধ্যে নিয়ে বললেন, শিগগির ডাক্তারকে ফোন করো।

শেতল বিছের পিছনে ছুটোছুটি করে হাঁফাচ্ছিল, বলল, আমি বিষ ঝাড়তে জানি। ঝেড়ে দেব?

— যা পারো করো বাবা। এ কী সর্বনাশ হল আমার!

শেতলের জিভ লক-লক করে ওঠে। সে তক্ষুনি হাঁটু গেড়ে বসে ময়নার বাঁ পা দু-হাতে তুলে নিল। টান মেরে মোজা খুলে ফেলতেই পায়ের তলা থেকে টপটপ করে রক্ত

। শেতল চোখ বুজে তিনবার বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ার ভান করল, তারপর ঠিক যেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, সেইখানটায় মুখ লাগিয়ে চিৎ হয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়ল । সে শব্দ করে-করে জায়গাটা অবিরাম চুষতে লাগল । ময়না এতক্ষণে ব্যথার চেয়ে ভয়েই বেশি কাঁদছে । তার কচি পা শেতলের হাতের মুঠোয় । শেতল মাঝে মাঝেই জোরে চাপ দিয়ে রক্ত বের করে নিচ্ছে । তার মুখ রক্তে ভেজা । গলা দিয়ে গরম সুগন্ধি রক্তের স্রোত নেমে যাচ্ছে । দুধ-ঘি ননী-ছানা খাওয়া শরীর, এর স্বাদই আলাদা!

মিনিট তিনেক পর রক্ত বন্ধ হল । শেতল আরও বারকতক চুষে, কিছু না পেয়ে উঠে পড়ল ।

— মুখটা ধুয়ে ফ্যালো ।

শেতল চলে যেতে যেতে বলল, আর ভয় নেই । বিষ বের করে দিয়েছি ।

ডাক্তার এলেন আরও কিছুক্ষণ পর । সব শুনে সিরিঞ্জ ভরতে ভরতে বললেন, এদেশে ওইসব হাতুড়ের রাজত্বই চলবে ।

ময়নার বাবা এতক্ষণে গায়ে তোয়ালে জড়িয়েছেন, ভুঁড়ি ঢাকেনি, বললেন, যাই হোক, রক্ত পড়া তো বন্ধ হয়েছে ।

সারা দুপুর বৃষ্টি হয়ে সন্ধের দিকে পৃথিবী একটু ঠান্ডা । বাড়ির পিছনে বাগানের মাথায় ঘোলাটে চাঁদ উঠেছে । শেতল চায়ের পেয়ালা-টেয়ালা ধুয়ে রেখে নীচে নেমে এল । তার মনটা আজ ভারি খুশি । আবছা অন্ধকারে ফুলবাগানে ঢুকে সে গাছপালার মধ্যেই ঘুরে বেড়াতে লাগল । ফুলের গন্ধে চারদিক ভরে আছে, শেতল লম্বা নিশ্বাস টানে, ঠিক গরম রক্তের সুগন্ধ । মাথায় একটা নতুন চিন্তা আসছে । পেট ভরা থাকলে মাথা খোলে । একটা গোলাপের পাপড়ি দাঁতে কাটতে সে ছোট্ট একটা ঢেকুর তুলে ভাবল, রোজ ওরকম পাওয়া যায় না? নিজের রক্তে তার আর রুচি নেই । সে জিভ দিয়ে ছোঁয় না । বমি পায় ।

ওপরে ফোন বাজছে । শেতল একা-একা কথা বলে উঠল, আহা, যেন কত্তাল! জ্যোৎস্নায়, ফুলের গন্ধে, টেলিফোনের ঝনঝনে শেতলের আমেজ লাগে । সে উচ্চারণ করে বলল, রোজ এরকম... আঃ, এবার মচ্ছব লেগেছে রে!

মায়া ফোনে কথা শেষ করেই ডাকল, শেতল, ও-শেতল!

শেতল দরজায় এসে দাঁড়াল, আজ্ঞে, মা, আমায় ডাকছিলেন?

— হ্যাঁ বাবা । গোটা-দুই মুরগি পাওয়া যাবে এখন? বাবুর এক বন্ধু রাতে খাবেন, এখুনি ফোন করলেন । বড় মানী লোক ।

শেতল নিজের গুণে সকলের মন জয় করেছে । একা হাতে হাজারটা ঝামেলা সামলায়, মুখে কথাটি নেই । সৎ, বিশ্বাসী । কোনওরকম লোভ নেই । কাজকর্মও ভারি পরিষ্কার । তার সঙ্গে এঁরা আর রেগে কথা বলেন না, এমনকি গলায় স্নেহ লেগে থাকে ।

শেতল মাথা কাত করে বলল, এই দুটো বাড়ি পরেই একটা পোলট্রি আছে, ছাদের ওপর, মুরগি কি কচি দেখে নেব, না একটু বুড়ো?

— সে তুমি যা ভালো বোঝো ।

হাত বাড়িয়ে টাকা নেবার সময় মায়ার হাতে ছোঁয়া লাগাল । এই বয়েসেও মাখন । শেতল তখুনি সন্ধের চিন্তাটা পাকা করে ফেলল, এবার কাচের গেলাস ভেঙে রাখতে হবে । মেঝের রক্ত সে ছাড়া কে পরিষ্কার করবে?

বাগানের কোণে, লেবুগাছটার তলায় মুরগির পালক ছাড়াতে-ছাড়াতে শেতল কাটা ঠোঁট সামান্য বেঁকিয়ে হাসল, ন্যাকড়া নিয়ে খুব কাছেই থাকব, গরম-গরম চাই ।

মুরগি সেদ্ধ হচ্ছে । হাতের তেলোয় নিয়ে মশলার আন্দাজ করা শেতলের অভ্যেস । বাঁ-হাতের তেলোয় রসুনের কোয়ার হিসেব করতে-করতেও সে কান খাড়া করে রেখেছে, বাবুর বন্ধুটি কখন আসেন । নতুন মানুষের জন্য তার এখন খুব লোভ ।

শেষ পর্যন্ত আর এলেন না । শেতল নিরাশ হয় । তবে, যত রাত হবে ভেবেছিল, তার আগেই সব কাজ শেষ । শেতল অন্ধকার ছাদে উঠে গিয়ে বিড়ি ধরিয়ে পা টিপে-টিপে পায়চারি করে, নিচে না আওয়াজ যায়! বিড়ি তেতো । গলায় ধোঁয়া ঢুকে ভেতরটা ধুলো-ধুলো লাগছে । মেঘের আড়াল থেকে ফট করে ঘোলাটে চাঁদটা লাফিয়ে উঠতেই, ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে শেতল টের পেল, তার আর দাঁড়িয়ে থাকারও শক্তি নেই ।

রোজই তার জ্বর হয়, তার ওপর বুক জ্বলে, এতদিন এসব সে আমল দেয়নি । আজ একদম অন্যরকম । তার চোখের সামনে চাঁদ তারা নাচছে ।

শেতল টলতে-টলতে এসে নিজের ঘরের চৌকাঠের ওপর শুয়ে পড়ল । গোঙাতে-গোঙাতে বলল, জল!

মা বাথরুমে । ময়না শুতে যাবার আগে ক্যালেন্ডারের রঙিন পেলিক্যান দেওয়ালে সাঁটছিল, গোঙানি শুনে ঘাড় ফেরাল । তারপর কাছে এসে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে শেতলকে দেখল, তোমার জ্বর হয়েছে নাকি?

শেতল যেন ঘুমের ঘোরে কোঁকাচ্ছে । চোখ না খুলেই বলল, জল!

ময়না জল নিয়ে এসে ডাকল, শেতল, জল খাও। ও শেতল!

শেতল চোখ মেলে। টকটকে লাল। তার বুকের ভেতরটা শুকিয়ে খরখর করছে। ময়নার হাত থেকে গেলাসটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে খালি গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে দম নিল, জল!

— আরও খাবে? দাঁড়াও—

ময়না দৌড়ে গিয়ে খাবার ঘর থেকে জল ভরে আনে।

— আঃ, আস্তে-আস্তে খাও! ঠিক বিষম খাবে। ওর'ম চোঁ-চোঁ করে খাচ্ছ কেন? আর খাবে? একি! কী হয়েছে, কাঁদছ কেন? মা, দেখে যাও, শেতলদার চোখ দিয়ে কীরম বৃষ্টির মতো জল পড়ছে!

প্রথম প্রকাশ : অমৃত, ২০ এপ্রিল ১৯৭৯

# ভয়

.শষ রাতে একদল লোক হঠাৎ সুর করে হরিনাম শুরু করায় সত্যেনের ঘুম চটে যায় । ভোরের দিকটাই তার গাঢ় ঘুমের সময় । চোখ জ্বালা করছে, মাথা ভার । ট্রেন থেমে আছে । জানলা দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, স্টেশনের নাম পাঠশালা । প্লাটফরমে ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে বহুলোক অলসভাবে দাঁড়িয়ে আছে । দেখেই বোঝা যায়, তাদের কোনও তাড়া নেই । দূরে গ্রাম । আকাশে তখনও তিনটে তারা ।

কীর্তনের দলটা ছাড়া কামরা প্রায় ফাঁকা । সত্যেনের ঠিক সামনের সিটের মহিলা এরই মধ্যে মুখ-টুখ ধুয়ে বোধহয় একটু পাউডারও বুলিয়ে নিয়েছে । মুখটা ঘুমের পর একটু ভার-ভার, দেখতে মন্দ নয় । বাঁ-গালে আবছা মতো কয়েকটা ছিটছিট দাগ, বোধহয় লিভারের গোলমাল, ভুরু কুঁচকে প্লাটফরমের দিকে চেয়ে আছে । ছেলেটা দুহাতে তার মায়ের একটা বাহু জড়িয়ে ধরে কিছু বলছে, কীর্তন ছাপিয়ে শোনা যায় না । মহিলা বিরক্ত হয়ে ভেতরের দিকে মুখ ফেরাতেই সত্যেন চোখ সরিয়ে নেয় ।

সিগারেট মুখে নিয়ে এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে দেশলাই পেল না । হরেরাম হরেকৃষ্ণ পৌঁছেচে, একজন তো দুহাত তুলে বসে-বসেই দুলছে । ওদের কাছে দেশলাই চাওয়া যায় না । অথচ ওদের জন্যই তার ভোরের ঘুম মাটি । ধর্ম সত্যিই বড় অন্ধ ।

মহিলার স্বামী দু-হাতে দু-ভাঁড় চা নিয়ে ঢুকল, ধরো, ধরো, হাত পুড়ে যাচ্ছে ।

— আঃ! হাত ছাড়ো বুবু ।

— আগে বলো, পাঠশালা মানে কী?

মহিলাটি এক হাতে একটা ভাঁড় নিয়ে সিটের ওপর রাখল । তারপর ছেলের হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, সোজা হয়ে বসতে পার না? কতদিন বলেছি কুঁজো হয়ে বসবে না ।

ছেলেটা আরও ঘেঁসে মায়ের বাহু টেনে ধরে আরও কুঁজো হয়ে বসল । বলল, বসবো! তুমি আমাকে পাঠশালা মানে বলছ না কেন?

টান লেগে বুকের আঁচল খসে পড়ে । আঁচল তুলে ছেলের দিকে তাকায়, উঃ! এত বিরক্ত কর! কলকাতায় চলো, তোমাকে আমি স্কুল ছাড়িয়ে ঘরে বসিয়ে রাখব!

— আমি স্কুলে যেতে চাই না!

ভদ্রলোকের প্যান্টে চা পড়েছিল, টয়লেট থেকে ধুয়ে এসে রুমাল দিয়ে ভিজে জায়গাটা মুছতে-মুছতে বললেন, কতক্ষণ এখন থাকতে হয় দ্যাখো! পর-পর ফিশপ্লেট খুলে রেখেছে। কতক্ষণে মেরামত হবে কে জানে!

ভদ্রলোক চায়ে চুমুক দিলেন, এঃ, ঠান্ডা। কীর্তন তুঙ্গে উঠে নতুন করে মন্থর চালে শুরু হয়েছে। ভদ্রলোক সেই দিকে একবার চেয়ে নিয়ে স্ত্রীকে বললেন, তুমি বরং একটু শুয়ে নাও। বসে থেকে কোমর ধরে যাবে। ট্রেন ছাড়লে আর জায়গা পাবে না।

সত্যেনের মেজাজ পুরোপুরি খিঁচড়ে যায়। তার মানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানেই ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকবে। লাইন রিপেয়ারের কাজ কতক্ষণে শেষ হতে পারে, ভদ্রলোক সে-বিষয়ে কোনও ধারণা পেয়েছেন কিনা, জিজ্ঞেস করতে তার ইচ্ছে হল না। এই তার এক স্বভাব। মেজাজ খারাপ হলে কারও সঙ্গেই কথা বলতে ইচ্ছে করে না। এইসব সময় কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে কটা বাজে, সে উত্তর দেয় না, চুপ করে থাকে। এমনিতে অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলাই তার পেশা। মেডিকেল স্টোর, গ্রামের হাসপাতাল, এসব জায়গায় কথা বেচেই তাকে খেতে হয়। কিন্তু এখন ট্রেন কতক্ষণে ছাড়বে সেটা জানা তার খুবই দরকার, তবু কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল না। সামনের ভদ্রলোককে সিগারেট ধরাতে দেখেও সে দেশলাই চাইল না।

প্ল্যাটফরমে নেমে সে পান-সিগারেটওয়ালার কাছ থেকে দেশলাই কিনল। লোকেরা কেউ-কেউ প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে লাইন পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। ইঞ্জিনের কাছেও ভিড়। অনেকে এই সাতসকালেই সিঙাড়া-ডালপুরী খাচ্ছে। ভাব-সাব দেখে বোঝাই যায়, খুব শিগগির ট্রেন ছাড়বার সম্ভাবনা নেই। পাছে বিরক্তি বেড়ে যায়, সত্যেন স্টেশনের লোহার বেড়া ডিঙিয়ে বাইরে ফাঁকা মাঠের মুখে দাঁড়াল।

মাঠের ওপারে বাঁদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাঁশঝাড়। ডানদিকে গা-ঘেঁসাঘেঁসি কতগুলো মেটে বাড়ি। এই গ্রাম, তার আসা দূরে থাক, আগে কখনও দেখেইনি। এই রকম করে এই মাঠের ধারে এসে দাঁড়ানোরও তার কথা ছিল না! চারটে পাখি ঠিক তার মাথার ওপর দিয়ে চিংরিক চিংরিক করে ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল, সত্যেন খেয়াল করল, ঠিক এরকম কোনও পাখির ডাক সে আগে শোনেনি। সবটাই তার কাছে একেবারে আনকোরা নতুন। তার ওপর সবে ভোর হয়েছে। ভোরবেলা আচমকা নতুন একটা জায়গা চোখের সামনে পেয়ে গিয়ে সত্যেনের বুকের মধ্যে একটা চিনচিন ভাব আসে। সে টের পায়, তার মেজাজ ভালো হয়ে যাচ্ছে।

ভেতরটা ঘুরে দেখে এলে হয়। পিছন ফিরে প্ল্যাটফরমে চোখ বুলোল। লোকজনের তেমনই গা-ছাড়া ভাব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ট্রেন নিশ্চয় ছাড়বে না। সুটকেশ আর

ব্যাগটা ট্রেনে রয়ে গেছে । ওই মহিলাটি ট্রেন ছেড়ে নামবে মনে হয় না । চুরি হওয়া শক্ত । তবু পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে সে টস করে । হেড পড়লে এগোবে, টেল হলে পেছোবে । আধুলিটা হাত ফসকে কেঁচোর তোলা নরম মাটির স্তূপে কাত হয়ে গেঁথে যায় । চুলোয় যাক । তাছাড়া এখন তার ঝুঁকি নিতেই ভালো লাগছে । পয়সাটা ঘাসে মুছে নিয়ে পকেটে রেখে মাঠের মাঝামাঝি পৌঁছে সত্যেন পরিষ্কার বুঝতে পারল, তার এতদিনের জীবনের সঙ্গে এখন আর তার সম্পর্ক নেই ।

মাঠ পেরিয়ে প্রথম যে বাড়িটা দেখল, তার উঠোনে একটা মেয়ে ছাগল দুইছে । কাছেই সাত-আট বছরের আরেকটা খালি-গা মেয়ে ছাগলটার পিছনের ঠ্যাং দুটো শক্ত করে ধরে আছে । বড় মেয়েটির শাড়ি হাঁটুর ওপর তোলা, দু-হাঁটুর মাঝখানে একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি চেপে রেখেছে, সত্যেন পাশ থেকে তার একদিকের স্তনের খানিকটা দেখতে পেল ।

সিগারেট ফেলে সত্যেন মেয়ে-দুটোর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ছাগলটা গলা তুলে ডেকে উঠল । পা ঠুকে-ঠুকে পা ছাড়াবার চেষ্টা করছে ।

— আঃ! শক্ত করে ধর না! এই লক্ষ্মী, ওদিকে কী দেখছিস?

লক্ষ্মী সত্যেনকে দেখছিল । তাদের বাড়ির উঠোনে প্যান্ট-শার্ট পরা লোক, কোমরে চওড়া বেল্ট, পায়ে কীরকম জুতো, লক্ষ্মী অবাক ।

— ইস্টিশন পরে দেখিস । ও ট্রেন আজ আর যাবে নাকি! বলছি না, ঠ্যাং চেপে ধর ।

লক্ষ্মী আস্তে করে মুখ নামিয়ে বলল, দিদি, দ্যাখ—

মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে সত্যেনকে দেখেই বিরক্ত । খুব বিপদে পড়েছে । কাপড়-চোপড় ঠিক নেই, এদিকে পা আটকা । সত্যেন গলা পরিষ্কার করে বলল, ছাগলদুধ তোমরা বিক্রি কর?

মেয়েটা ততক্ষণে দুধের বাটি নামিয়ে রেখে পায়ের পিঠের শাড়ি টানছে, সত্যেনের কথার উত্তর দিল না । গলায় খাঁটি বিরক্তি নিয়ে লক্ষ্মীকে বলল, যা তো, বাবাকে ডেকে নিয়ে আয় ।

ছাড়া পেয়ে ছাগলটা দৌড়ে খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল । মেয়েটা এক দৌড়ে গিয়ে ছাগলটার শিং ধরে ফেলল ।

গায়ে কাপড়ের খুট জড়িয়ে লক্ষ্মীর পিছন-পিছন মাঝবয়েসী একটা লোক বেরিয়ে এল । চোখে সন্দেহ । সত্যেন তার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, আপনারা কি অল্প

খানিকটা ছাগলদুধ বেচবেন?

লোকটার তখনও সন্দেহ যায় না। সত্যেনকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, তা আপনার আসা হচ্ছে কোত্থেকে?

সত্যেন সিগারেট ধরিয়ে লোকটার দিকে প্যাকেট বাড়িয়ে দেয়, আমাদের ট্রেন এখানে আটকে গেছে। লাইন-টাইন সারিয়ে কখন ছাড়বে ঠিক নেই। আমার পেটের গোলমাল। একটু ছাগলদুধ পেলে—

লোকটা সিগারেট ধরায়, ধোঁয়া ছেড়ে বলল, দাম আজ একটু বেশি পড়বে। ভোর থেকেই তো গ্রামের সব দুধ-ডিম ইস্টিশানে উবে যাচ্ছে।

— সে ঠিক আছে। কিন্তু দুধ একটু গরম করে দিতে হবে। পোয়াটাক হলেই চলবে।

মেয়েদুটো ততক্ষণে আবার ছাগল দুইতে লেগেছে। লোকটা বলল, একটু সময় লাগবে। আপনি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করুন।

নিজেই একটা জলচৌকি এনে দাওয়ায় পেতে দেয়, বসুন।

লোকটাও কয়েক হাত দূরে মাটিতে উবু হয়ে বসে।

সত্যেনের অস্বস্তিভাবটা কেটে গেছে। বেশ লাগছে। যেন বিনা চেষ্টায় সে একটা নতুন জীবনে ঢুকে পড়েছে। দূরে বাঁশঝাড়ের মাথায় চিংরিক-চিংরিক শুনে সে কথা খুঁজে পায়, ওটা কী পাখি বলুন তো।

— আমরা বলি পিরীত-পাখি। জোড়ায়-জোড়ায় ওড়ে। সব সময় ওইরকম শিস দেয়।

লাভবার্ড-এর চমৎকার বাংলা! সত্যেন নায়কোচিত ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক দ্যাখে— আপনাদের এই জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগছে। ধরুন, আমি যদি এখানে থেকে যেতে চাই, একটু জমি কেনার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

লোকটা সিগারেট টেনে কাশছিল, বসে-বসেই অনেক দূরে, উঠোনের কিনারে খানিকটা কাশ ছুঁড়ে ফেলে বলল, কলকাতায় আপনার বাড়ি নেই?

— তা আছে। আচ্ছা, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করে এখানেই ঘর-বাড়ি তুলে থেকে যেতে পারি না?

বলেই সত্যেন বিব্রত হয়। লোকটা নিশ্চয় তাকে পাগল ঠাওড়াচ্ছে কিংবা বদমাশ-টদমাশ ভাবছে। ভাবুক গে, এই ভাবেই ভালো। স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলার স্বাদই আলাদা।

আর এই মাঠের মধ্যে বিয়ে-টিয়ের কথা বললেই বা ক্ষতি কী!

লোকটা কিন্তু একটুও চমকায়নি, দিব্যি শান্ত গলায় বলল, কলকাতায় আপনার বউ নেই?

সত্যেনের ইচ্ছে হল, বলে দেয় যে তার বউ আছে। তার ছেলে পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলে পড়ছে। আর তিন বছর পরে দেরাদুন ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে যাবে। আজ, এখানে, তার সব সত্যি কথা বলতে ইচ্ছে করছে। তার মন চাইছে, সত্য বই মিথ্যা বলিব না। একরকম জোর করে সে বলল, বিয়ে আর করা হল কই! অবশ্য আপনার মেয়ের তুলনায় আমার বয়েস একটু বেশি—

সত্যেন টের পায়, তার ভেতরটা কাঁপছে। লোকটা নিশ্চয় তাকে বড়শিতে বিঁধে খেলাচ্ছে। বলল, তাতে আর বাধা কী! সরস্বতীর মা আমার থেকে কুড়ি বছরের ছোট ছিল। তা তিনি আর নেই। এই বুড়ো বয়সে মেয়েদুটোকে আমার কাঁধে চাপিয়ে— কথা থামিয়ে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

ব্যাপারটা সত্যেনের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে। তার নেশা চড়ে গেছে, এখন আর থামার মানে হয় না। সে চট করে ভেবে নিল, যদি মেয়েটাকে বিয়ে করে এখানেই বাকি জীবন সে থেকে যায়, সেটা কি সত্যিই অসম্ভব? সঙ্গে সঙ্গে তার একটা দর্শনও তৈরি হয়ে যায়। এটা কি ঠিক নয় যে তার জীবনটা আগাগোড়া ভুল হয়ে গেছে! সে কি সত্যিই অন্তরে-অন্তরে একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ? কোথাকার কোন ওষুধ কোম্পানির স্যামপেলের ব্যাগ নিয়ে হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াতে কি তার জন্ম হয়েছে? এতদিনে তার সেতারের টংকারে দেশ কাঁপানোর কথা ছিল। বড়মামা নিজে ডাক্তার, একবর্ণ সেতার না-বুঝে দিব্যি সুখে জীবন কাটিয়ে গেলেন। ওষুধ কোম্পানির কাছ থেকে ঘুষ হিসেবে তার চাকরিটা জুটিয়ে না দিলে, আজ তার এরকম জীবন হয়? চাকরি হয়েছে, বউ হয়েছে, প্রোমোশান হয়েছে, ভাড়াটে সুদ্ধ একটা বাড়িও সে কিনে ফেলেছে, ছেলে হয়েছে, সবই হয়েছে। কিন্তু তার ওপর যেন অন্য একটা লোকের জীবন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জীবনের কথা সে ষোল বছর বয়েসে কই ভাবেনি তো! সত্যেন একেকটা বয়েসে একেকরকম দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেবেছে, আবার যদি সেই স্কুলের জীবন থেকে শুরু করা যেত! সেটা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু সারাজীবন একঘেয়ে একটা ভুল জীবনের জের টেনে চলতে হবে তারই বা মানে কী! পাঠশালা থেকে শুরু করা না যাক, এখন এই পাঠশালা গ্রামে নতুন আরেকটা জীবন কেন ফিরে শুরু করতে পারবে না?

সরস্বতী এক বাটি গরম দুধ তার সামনে রেখে চলে যাচ্ছিল, তার বাবা খেঁকিয়ে উঠল, হাতে দিতে পারিস না? মানী লোককে ওভাবে খেতে দেয়? ধিঙ্গি মেয়ে, এসব আর কবে শিখবি?

মেয়েটা ফিরে এসে দুধের বাটি সত্যেনের হাতে তুলে দেয় । লোকটা হা-হা করে ওঠে, এক হাতে না, এক হাতে না! বাঁ-হাত দিয়ে ও-হাতের কনুই ছুঁয়ে তারপর দে ।

সত্যেন ব্যস্ত হয়, ঠিক আছে, ঠিক আছে । ছেলেমানুষ—

— ছেলেমানুষ কী! কদিন পরে নিজের সংসার হবে, ছেলেমানুষ বললে হয়!

মেয়েটা দুধ দিয়ে চলে যাচ্ছে, একেবারে লাউডগার মতো সজীব । সত্যেন বাপের সামনে জোর করে ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয় ।

— তা বাবা, আপনারা শহরের মানুষ, এসব গ্রাম-গাঁ তো আপনার ভালো লাগবে না ।

— আমার লাগবে । জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগছে ।

— সে দু-একদিন । তারপর আর মন টিকবে না ।

— আপনি আমার ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না । আমি নতুন করে জীবন শুরু করতে চাই । এইখানেই, এটাই ঠিক জায়গা ।

— তা নয় থাকলেন, পেট চলবে কিসে?

— কলকাতায় আমার বাড়ি আছে । নীচের ভাড়াটে তুলে দিয়ে বাড়িটা বেচতে পারলে ভালো দাম পাব । লাখ-দুয়েকের বেশি ছাড়া কম নয় । মামলা করেছি, রায় আমার পক্ষেই হবে ।

সত্যেন কথাটা এই পর্যন্ত হুবহু সত্যি বলছে, ফলে তার কোনও জড়তা নেই, সে ভাবী শ্বশুরকে তার আর্থিক সঙ্গতির বর্ণনা দেয়, পুরো টাকাটা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিটে রাখলে ব্যাঙ্কই মাসে মাসে এখানে আমাকে টাকা পাঠিয়ে দেবে । মাসে প্রায় দু হাজার ।

লোকটা ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁক পাড়ে, ও নকে-সরে, একবার আয়, শিগগির আয় মা—

অনেকক্ষণ সহ্য করেছে, এতক্ষণে বুঝি তার মাথা খারাপ হল । আয়, আয়, শিগগির আয়— বলতে বলতে লোকটা সত্যেনের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আপনি সাক্ষাৎ ভগমান!

সত্যেন ভারি বিব্রত হয়ে পা সরিয়ে নেয় । লোকটা মেয়েদের দিকে মুখ তোলে, তার দু-চোখ বেয়ে জল পড়ছে, বাবু চান করবে, জল তুলে দে, শ্যামার বাড়ি থেকে আরও দুধ নিয়ে আয়, পায়েস হবে, ঘরটা ভালো করে নিকিয়ে একপাশে পরিষ্কার একটা বিছানা কর, কাচা কাঁথা-টাথা কী আছে দেখ— ও হো হো হো! তোর মা যদি আজ থাকত ।

লোকটা বালকের মতো কাঁদছে । সত্যেনের হাত ধরে তাকে ঘরে নিয়ে আসে, কাঁদতে কাঁদতে শীতলপাটি পেতে দেয়, এ আপনার নিজের বাড়ি । সরস্বতী, হাওয়া কর মা । আমি দেখি, দুমুঠো সরু চাল যদি পাই—

লোকটার পিছন পিছন লক্ষ্মী একটা ঘটি নিয়ে বেরিয়ে গেল । বোধহয় দুধ আনতে ।

সরস্বতী দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাওয়া করছে । ঘরে আর কেউ নেই । সত্যেন খপ করে তার হাত ধরে । ভেতরে ব্লাউজ-টাউজ কিছু নেই, শাড়ির ওপর দিয়ে বুকের ডৌল বোঝা যায়, সত্যেনের শরীরের মধ্যে ঝমঝম করছে.... না ঠিক হবে না, এবার তার অন্য রকম জীবন চাই । মেয়েটা ওই অবস্থায়ও দেওয়ালের দিকে মুখ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে । সত্যেন হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, হাওয়া করতে হবে না, বোসো । তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে ।

মেয়েটা আড়ষ্ট, মুখটা শক্ত করে তেমনই দাঁড়িয়ে আছে । সত্যেন এবার তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় । একেবারে মুখোমুখি । হাত নিসপিস করছে । ফস করে সিগারেট ধরিয়ে বলল, তুমি কাজ কর । আমি একটু গাছপালা আকাশ-টাকাশ দেখে আসি । জায়গাটা ভারি সুন্দর ।

বাইরে এসে একটা পুকুরে তার চোখ আটকে যায় । পরিষ্কার জল, তার মধ্যে আকাশ স্থির হয়ে আছে । অনেক নীচে দুটো চিল, জলের মধ্যে চিৎ হয়ে অতি ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছে ।

ঠিক এইখানেই সে বাড়ি তুলবে, এই পুকুরটার কাছে । চার কোণে চারটে, কি আটটা পিলার তুলে তার ওপর কংক্রিটের ছাদ ঢালাই করে তার ওপরে ঘর হবে, যেন মাচার ওপর বাড়ি, নিচটা চারদিক খোলা, সেখানে শুধু ফুলগাছ, মাঝখানে সবুজ ঘাসে ঢাকা বসবার একটু উঁচু মতো জায়গা থাকবে । দোতলায় তার খাওয়া-শোওয়ার ঘর, আর তার ওপরে, একেবারে আকাশ-ছুঁয়ে একটামাত্র ঘর । ওই ঘরে সে রেওয়াজ করবে । রোজ শেষ রাতে আহীরভৈঁরো বাজিয়ে সে সূর্যোদয়ের ঠিক আগে সারা আকাশ রাঙিয়ে দেবে । ভাবতেই তার শরীরে যৌন আনন্দের মতো একটা শিহরণ উঠল ।

বহুদূর থেকে ইঞ্জিনের টানা হুইশিল শুনে প্রথমে সে কিছুই মনে করতে পারল না। পরের মুহূর্তে সে ভীষণ ভয় পেয়ে হঠাৎ মাঠ ভেঙে দৌড়তে লাগল। মাঝ বরাবর এসে সত্যেন দেখল, প্ল্যাটফরম ফাঁকা, সবাই ট্রেনে উঠে পড়েছে। দ্বিতীয় হুইশিল পড়ল। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে তৃতীয় হুইশিলের মাথায় সত্যেন লোহার বেড়া ডিঙোতে গিয়ে প্যান্টের পা ছিঁড়ল। লাফ মেরে সামনের একটা চলন্ত কামরায় উঠে পড়ে হাঁপ নিতে নিতে সত্যেন ভাবল, উঃ, আরেকটু হলে...কাল তার মামলার তারিখ!

এত হাঁপাচ্ছে, এখন পনেরো মিনিট সিগারেট খাওয়া যাবে না।

প্রথম প্রকাশ : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ এপ্রিল ১৯৭৮

# শোধ তোলা

একে তো খেয়ে উঠে একটা সিগারেট নেই, তার ওপর কাল বাসে অপমান হয়ে প্রদীপের মেজাজ খিঁচড়ে আছে । কাল সে নীলুবাবুর সঙ্গে বাসে উঠেছিল, লোকটা তিন-চারটে স্টপ পরেই শুধু নিজের টিকিট করে নেমে গেল । মাসের শেষ দু-একটা দিন, আর পরের মাসের পয়লা, প্রদীপ বরাবরই একটু আগে-আগে বাসস্টপে চলে আসে । ওই সময় তার হাতে একটা পয়সা থাকে না । সে পর-পর বাস ছেড়ে দেয় আর কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দ্যাখে । চেনা কাউকে পেলে তবেই সে বাসে ওঠে । প্রাইভেট বাসের কন্ডাক্টরগুলো তো একেকটা চিল, কিংবা জ্যোতিষী । ওই কটা দিন সিগারেট খাওয়াও পুরোপুরি অদৃষ্টের হাতে । কেউ হয়তো একটা দিল । কখনও সে নিজেই চেয়ে নেয় । বিরক্ত হয়ে দিচ্ছে বুঝেও সে খুব মনোযোগ দিয়ে সিগারেট ধরায় ।

অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে । হিসেবমতো অনেক আগেই তার বেরিয়ে পড়ার কথা । এখনও গেলে হয়তো বাস স্টপে কাউকে পাওয়া যায় । কালকের অপমানে খুব ক্ষেপে আছে, বিরক্তিতে মুখ বেঁকা, সে জুতোর দিকেই গেল না । পাশের ঘরে বাবা ফপ-ফপ করে তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ করছে, প্রদীপ পা টিপে-টিপে বাবার বালিশের পাশ থেকে দুটো বিড়ি তুলে নিল । মাথাটা আজ একটু বেশি কাঁপছে । চোখ বুজে স্তোত্রের তালে-তালে দুলছে, টের পায়নি ।

উনুন থেকে কাগজ জ্বালিয়ে বিড়ি ধরাতে গিয়ে আরেকটু হলেই প্রদীপের গোঁফ পুড়ে যাচ্ছিল । সহদেব কয়লার গামলা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতেই প্রদীপ গম-গম করে ওঠে, দেশলাই একটা জায়গামতো রাখতে পার না?

সহদেবের আজকাল হাত কাঁপে । চোখেও ভালো দ্যাখে না, ডান চোখে ছানি । একটা ছেলে । হার্টে ছ্যাঁদা । হাসপাতালে পড়ে থাকে । শ্লেষ্মাজড়ানো গলায় বলল, বাবুকে সকালে বিড়ি ধরিয়ে দিয়েছিলুম । ওখানেই রয়ে গেছে ।

অফিসে যাবে না ঠিক করে বিছানায় উঠতে যাচ্ছে, দেখল মেঝেয় একটা দু-টাকার নোট । সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল । এমনিতে তার জীবনে দুর্ভাগ্যে ভরা । কদাচিৎ কখনও সামান্য ভালো কিছু ঘটলে সে খুশি হয় । মাসের ঠিক শেষ দিনটায় একদম ছপ্পর ফুঁড়ে দু-টাকা! নোটটা হাতে নিয়ে এই প্রথম সে দু-টাকার রং ভালো করে দেখল ।

টেরাকোটা। জানলা দিয়ে উড়ে এল নাকি! একটু দেরি হয়েছে, তা হোক, প্রদীপ তক্ষুনি পায়ে চটি গলিয়ে বাসস্টপে।

মনে মনে সে দু-টাকার ছোট্ট একটা বাজেট করে ফেলল। যাওয়া-আসা ষাট পয়সা। কাল মাইনে। কাল শুধু যাওয়ার খরচ। তিরিশ পয়সা। হাতে রইল একটাকা দশ। তার মানে আজ এক প্যাকেট সিগারেট... কিংবা টিফিনে ডিম-রুটি, সঙ্গে একটা কলাও হয়ে যাবে।

টিকিট করার সময় কন্ডাক্টরকে নোটটা দিয়ে বলল, দু-টাকার নোট। দেখে নাও।

কালকের কন্ডাক্টরকে পেলে ভালো হতো। ঠিক যে, সে মিথ্যে বলেছিল টিকিট হয়ে গেছে, কিন্তু সামান্য তিরিশ পয়সার জন্য— এদিকে যাই রোজ ঝুলে-ঝুলে, কই সেজন্য তো কেউ তার কাছে কোনওদিন ক্ষমা চায়নি!

অফিসে ঢোকবার মুখে সে দশ পয়সা দিয়ে একটা সিগারেট কিনে নিল। অল্প ঘেমেছিল, ড্রয়ারে সিগারেটটা রেখে রুমাল দিয়ে মুখটুখ মুছে বাঁ পাশের টেবিলের সমীরকে বলল, আজ মাইরি একটা একশো টাকার নোট কুড়িয়ে পেলাম। কী করা যায় বলতো?

সমীর কাগজে ছক কেটে একটা অঙ্কের ধাঁধা কষছিল, ঠিক মতো মেলাতে পারলে টিভি সেট পাওয়া যাবে, মুখ না তুলে বলল, একশো টাকায় আজকাল কিছুই করা যায় না।

সামনের টেবিল থেকে সঞ্জয় বলে উঠল, কুড়িয়ে পেয়েছেন? আমাকে ধার দেবেন? খুব দরকার। কাল রাতে বাবার স্ট্রোক হয়েছে।

প্রদীপ একটা চিঠি খুলে ফাইল করছিল, সঞ্জয়কে দেখে নিয়ে বলল, যাঃ!

সঞ্জয় টেবিল ছেড়ে উঠে এল, বিশ্বাস করুন। পিজিতে ভর্তি করেছি। আজ শুধু টাকার জন্যই অফিসে এসেছি।

সঞ্জয়ের বয়েস খুবই কম। মাস-চারেক আগে ঢুকেছে। তার গলার স্বর শুনেই বোঝা যায় সে মিথ্যে বলছে না। প্রদীপকে মুখ নামিয়ে চিঠি পড়তে দেখে সে আবার বলল, টাকাটা পেলে খুব উপকার হয়। কাল মাইনে পেয়ে অর্ধেকটা ফেরত দিতে চেষ্টা করব। না হলে মাসে-মাসে কুড়ি টাকা করে— প্রদীপ লিখতে লিখতে বলল, আমি টাকা ধার দিই না।

সঞ্জয়ের রোগা ফরসা মুখ কালো হয়ে গেল।

দাসদা দূর থেকে এই দিকে চেয়েছিলেন, বললেন, এটা কিন্তু এ-জি-এম-এর মতো হল ভায়া! নাও, একটা সিগারেট খাও।

প্রদীপ বলল, আমার আছে।

একটু পরে সিগারেট ধরিয়ে সুখটান দিতে দিতে প্রদীপ টের পেল ঘরের অনেকেই তাকে একটু অন্য চোখে দেখছে। ওরকম করে বলাটা ঠিক হয়নি। টাকা নিয়ে ইয়ার্কি করতে যাওয়াই তার ভুল হয়েছে। আসলে দু-টাকার নোটটা পেয়ে তার খুব আরাম লেগেছিল। খুব তৃপ্তি করে পেট ভরে খেলে যেমন হয়। ঢেকুর তোলার মতো একশো টাকার কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

টিফিনের সময় বাইরে যাচ্ছে, ডেসপ্যাচের রত্না ঘোষের সঙ্গে দেখা। কারও হয়ত আসবার কথা, গেটে অপেক্ষা করছে। মুচকি হেসে বলল, খাওয়াচ্ছেন তো? আপনার স্টার খুব ভালো যাচ্ছে। এবার একটা প্রেম-ট্রেম করুন। রাজকন্যে লেগে যেতে পারে।

প্রদীপ হঠাৎ রেগে গেল, দু-পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে বলল, আমি আপনাকে একটা সিগারেট খাওয়াতে পারি!

রত্নার মুখের ভাব বদলে যায়। একটু হাসবার চেষ্টা করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কলা এক জোড়া পঞ্চাশ পয়সা, সেদ্ধডিম একটা পঞ্চাশ। কী খাবে ভাবতে ভাবতে একটু দূরে ফুটপাতের লটারির দোকান চোখে পড়ল। এক টাকা দিয়ে সে একটা হরিয়ানার টিকিট কিনে পকেটে রাখল। মাসের শেষ দিকে কবে আর সে টিফিন করে? তাছাড়া কুড়িয়ে পাওয়া টাকা, হয়ত এটাই তার সৌভাগ্যের সূচনা, দেখা যাক না কী হয়। প্রথম পুরস্কার তিন লাখ টাকা!

বাবার বিড়িটা একেবারে শেষ করে প্রদীপ অফিসে ফেরে। তীর্থঙ্কর আর নুরুল ক্যান্টিনের দরজায় দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল, তীর্থঙ্কর হই-হই করে ওঠে, আজ শালা তোমায় ছাড়ছি না। উঃ, কতদিন মাল খাইনি মাইরি!

প্রদীপ কাছে এসে হাত বাড়ায়, সিগারেট দে—

তীর্থঙ্করের সিগারেট থেকে ধরিয়ে নিয়ে তার মাথার ওপর ধোঁয়া ছাড়ে, তোকে মাল খাওয়াবার লোক অনেক আছে। আমায় নিয়ে আবার টানাটানি কেন বাবা?

— তুই কুড়িটা টাকা বার কর, তোকে টানাটানি করে আর সুখ কী!

প্রদীপ বলতে যাচ্ছিল, একশো টাকার কথাটা বানানো, তার আগেই নুরুল বলল, ওভাবে অন্যের টাকা মেরে দেওয়া আপনার উচিত হয়নি।

— মেরে দেওয়া? মেরে দিয়েছি মানে?

— যার টাকা তাকে খুঁজে টাকাটা ফেরত দেওয়া উচিত ছিল।

তীর্থঙ্কর নুরুলের কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল, কার টাকা রে? টাকা কি কেউ পেট থেকে পয়দা করে?

প্রদীপ সিগারেট পায়ে মাড়ায়, আপনার মতো কাকা-ফাকা মন্ত্রী থাকলে সবাই ওরকম ভালো-ভালো কথা বলতে পারে।

প্রবাল একটু দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। বুকের ওপর দু-হাত ভাঁজ করা। দু-মাস আগে তার বউ আর একমাত্র ছেলে স্কুল থেকে ফেরার পথে লরির তলায় রিকশাসুদ্ধু পিষে যায়, তারপর থেকে সে একরকম বোবা। প্রদীপ তার পাশ দিয়ে যাবার সময় একবার দাঁড়াল। প্রবালের চোখ একদম ফাঁকা। এরকম বোবা চোখের দিকে তাকালে বুক শিরশির করে। প্রদীপ একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, রাস্তায় দু-টাকা কুড়িয়ে পেলে আপনি ঠিক কী করতেন?

প্রবাল তার থেকে সাত-আট বছরের বড়, এখন দাড়ি রেখে, লম্বা চুলে, আরও বয়স্ক দেখায়, প্রদীপের কথায় খুব মৃদু এক ধরনের হাসে, আমার তো কিছু করার নেই ভাই।

নিজের টেবিলে পৌঁছে চেয়ার টেনে বসতে-বসতে প্রদীপ একবার সামনের টেবিলটা দেখে নিল, সঞ্জয় চলে গেছে।

তাকে দেখে দাসদা উঠে এলেন। তার সামনের চেয়ারে বসে বললেন, কই ভায়া, একটা সিগারেট খাওয়াও তো।

— নেই।

— সেকি! এর মধ্যেই ফিক্সড ডিপোজিট করে দিলে নাকি?

ব্যানার্জিবাবু দুটো ফাইল নিয়ে ঘোষসাহেবের ঘরে যাচ্ছিলেন, বললেন, ভালো করেছ প্রদীপ। একশো টাকা পঁচিশ বছরে প্রায় তেরোশোয় গিয়ে দাঁড়াবে।

প্রদীপ হঠাৎ চেয়ারে হেলান দিয়ে পকেট থেকে চিরুনি বের করে আস্তে আস্তে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বলল, ভাবছি ফিক্সড ডিপোজিটেই টাকাটা রেখে দেব। সুদে বাড়বে।

ব্যানার্জিবাবু লাহিড়ীর টেবিলের পায়ায় হোঁচট খেয়ে থেমেছিলেন, ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, আমাকে দু-খিলি ভালো পান খাইয়ো কিন্তু।

— দাসদা, আপনি টাকাটা পেলে কী করতেন?

— অনেক দিন ফুর্তি-টুর্তি করিনি, যা একখানা বাজার পড়েছে!

দাসদা ঝুঁকে আসেন, সত্যি বলব? আমি হলে ওই টাকায় একদিনে যতটুকু যা হয়— বয়েসও তো হয়েছে, আর কদিনই বা ওসব—

নিরঞ্জনবাবু কোনের টেবিল থেকে ডাকলেন, প্রদীপ মিত্র, টেলিফোন।

প্রদীপ চেয়ার ঠেলে উঠতে যাচ্ছে, সমীর বলল, এ ঘরে আঠেরোজন তো? আঠেরোটা চিকেন চাওমিন আনিয়ে সবাইকে খাইয়ে দে। একশো টাকায় এর বেশি হয় না।

সমীর টিফিনের সময় ধাঁধা নিয়ে ডুবে ছিল, একটু আগে কৌটো খুলে মাখন রুটি বের করেছে।

ফোনের কাছে পৌঁছতেই নিরঞ্জনবাবু বললেন, সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে সেকশনসুদ্ধু লোক যা কাণ্ড করছে!

বিমল দত্ত পাশ থেকে বলে উঠলেন, শুধু সেকশন কী বলছেন, সারা অফিসে চাউর হয়ে গেছে। লটারি-টটারি হলে তবু কথা ছিল!

নুরুল মুখ ফিরিয়ে ফ্যানের হাওয়া বাঁচিয়ে সিগারেট ধরায়।

প্রদীপ কিছু না বলে রিসিভার হাতে নিয়েছে, নিরঞ্জনবাবু বললেন, নোটটা দেখে নিয়েছ তো? আজকাল শুনি জাল নোট-টোট অনেকে রাস্তায় ফেলে দেয়।

প্রদীপ বলল, হ্যালো?

ওদিক থেকে নারীর গলায় হ্যালো হয়েই লাইন কেটে গেল।

শ্রাবণী, না ছোট পিসীমা? প্রদীপ ব্যস্ত হয়ে বলল, হ্যালো? হ্যালো?

শুধু ডায়াল টোন শোনা যায়। প্রদীপ চেঁচিয়ে বলল, হ্যালো? কে, শ্রাবণী? হ্যাঁ, প্রদীপ বলছি। কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না, জোরে বলো। অ্যাঁ? কবে? না, আজ পারব না। কাল সকালের ট্রেনে ভেলোরে যাচ্ছি। হ্যাঁ। ডাক্তার বলছে মাথায় একটা অপারেশন করলে বাবা একদম ভালো হয়ে যাবে। তা তো লাগবেই। হাজার দশেকে হয়ে যাবে। দুর! ধার করা আমি ঘেন্না করি। নিশ্চয়ই। আমি ট্রাংক কল করব।

প্রদীপ জানে আঠেরো জোড়া চোখ তার মুখে সেঁটে আছে খুব চেঁচিয়ে বলল, ও, শোনো! আজ সকালে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছি। রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম। বাঃ, লোকেরা লটারি পায় না! অ্যাঁ? বাঃ, পড়ে ছিল, একটু ঝুঁকে, নিচু হয়ে, হাত দিয়ে তুলে নিলাম। অ্যাঁ? নিশ্চয়ই। একটা টিভি দেখে এসেছি, একটা গাড়ি কিনছি, একদম নতুনের মতো, প্রাইমার পদ্মিণী! নিজেই চালাব। ড্রাইভিং আটচল্লিশ ঘণ্টায় শেখা যায়। অ্যাঁ? নিশ্চয়ই। আগে প্লেনে কাশ্মীর। তারপর সতেরো দিনে গোটা ইউরোপ। পঁচিশ হাজার পঁচিশ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট রাখছি। তিন লাখ দশ হাজার পাব। অ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তাই নাকি? ও হো হো হো হো হা হা হা হা হো হো! প্রদীপ দুহাতে রিসিভার চেপে ধরে হাসতে থাকে। হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরার যোগাড়। প্রাণপণে হাসি থামিয়ে বলল, শোনো, তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, টাকা কেন পাব না! বললাম তো, পঞ্চাশ হাজার। ওই গাড়ি-টাড়ি, ইউরোপ যাওয়া, ফিক্সড ডিপোজিট— ওসব কিছুই করছি না। তোমাকে একটু নাচালুম। অ্যাঁ? মাথা আমার খারাপ হবে কেন? ফেরত দিয়ে দিয়েছি। কাকে আবার? যার টাকা তাকে, রাস্তাকে। আবোল-তাবোল মানে? পাঁচশোটা একশো টাকার নোট নিজের হাতে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে রাস্তার কাদায় ফেলে দিয়েছি।

ঘটাং করে রিসিভার নামিয়ে রেখে প্রদীপ ঘাম মুছতে মুছতে নিজের সিটে এসে বসল।

দাসদা বললেন, কী ব্যাপার হে?

নাড়ুবাবু অন্যের ব্যাপারে কখনও মাথা ঘামান না, আলপিন দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিলেন, বললেন, সুযোগ এভাবেই আসে। জীবনটা এবার বদলে নাও প্রদীপ।

সমীর বলল, আজকাল গাঁজা-টাজা খাচ্ছিস নাকি? দেখি, নাড়ি দেখি! কী সব বকে গেলি—

শিবু হালদার একটু নার্ভাস ধরনের লোক, সব সময়েই ভয়ে মরেন, দুহাত মুঠো করে টেবিলের ওপর ঝুঁকে বললেন, ডাকাতির টাকা নয় তো? কাল পরশু— দুদিনে দুটো ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়ে গেল। পালাবার সময় ওদেরই একটা বাণ্ডিল পড়ে যায়নি তো?

প্রদীপ কারও কথার উত্তর দিল না। কে একজন গলা তুলে বলল, গুল দিতে হলে এরকমই দিতে হয়। গাটস আছে।

প্রদীপ তাকাল না, চোখ নামিয়ে রেখে সে পকেট থেকে চিরুনি বের করে অনেকক্ষণ ধরে মাথা আঁচড়াল। তারপর টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে খুঁতখুঁতে মুখ করে চিরুনিটা ভালো করে মুছে বলল, দাসদা, একটা সিগারেট খাওয়ান।

বাড়ি ফিরে চায়ে চুমুক দিল, চিনি দেয়নি।

— সহদেব। চায়ে চিনি দিয়ে যাও।

সহদেব খালি হাতে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল।

— চিনি, চিনি, দু চামচে চিনি নিয়ে এসো!

সহদেবের গলায় সারা বছর শ্লেষ্মা, ঘর-ঘর করে বলল, চিনি নেই। পরশু র্যাশন উঠবে।

সহদেব হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল। প্রদীপ অবাক, তার ঘোলাটে ছানি-পড়া চোখ লাল, দু চোখের তলা ফুলে গেছে। বোঝাই যায়, সারাদিন কেঁদেছে। কী ব্যাপার? বাবার কিছু হয়নি তো? বলল, কাঁদছ কেন?

জুবুথুবু সহদেব গা ঝাঁকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, আমার টাকা হারিয়ে গেছে দাদাবাবু! আজ হাসপাতালে যাবার কথা, বদু আঙুর খেতে চেয়েছিল। একটা দু-টাকার নোট। ঘোষেদের বাড়ির চাঁদুর কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম।

প্রদীপ ঝাঁকুনি খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সহদেবের কাঁধে হাত রাখে। তার মন ছি-ছি করে ওঠে। কাল মাইনে পেয়ে টাকাটা ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি লটারি ওঠে সবটাই সহদেবের।

শোক একধরনের সাহস দেয়, সহদেব কাঁদতে কাঁদতেই বলল, এই ঘরেই পড়ে গেছিল, আমি জল দিতে এসেছিলাম। লালচে, নতুন নোট, আপনি দেখেননি?

প্রদীপের মাথার মধ্যে ঝনঝন করে ওঠে। একবার বাসে দশ টাকার নোট দিয়ে প্রদীপ ভাঙানি না নিয়েই ভুল করে নেমে পড়ে, একবার দ্বিগুণ দামে সে দিদির বাচ্চার জন্য বেবিফুড কেনে, তার প্রথম মাসের পুরো মাইনে পকেট মার হয়ে যায়, সেসব তাকে ফেরত দিয়েছে?

প্রদীপ চেয়ারে বসে পড়ে খুব শান্ত গলায় বলল, আমি দেখলে তো কার টাকা তোকেই জিজ্ঞেস করতুম।

বলে সে খুব আস্তে আস্তে তেতো চায়ে চুমুক দিতে লাগল।

প্রথম প্রকাশ : অমৃত, আগস্ট ১৯৭৮

# মানুষ-মুনিষ

সুদেব সকলের বড় । তার কান্নার ধরনও আলাদা । বুক চাপড়াচ্ছে, নিজের চুল ধরে টানছে, একবার একটানে পট-পট করে জামার সব বোতামই ছিঁড়ে ফেলল ।

দুপুরে ধুতির ওপর শার্ট চড়িয়ে বি-ডি-ওর অফিসে গিয়েছিল সারের তদ্বিরে । ফেরার পথে সন্ধেবেলা ময়নাদের বাড়ি সবে তাস নিয়ে বসেছে, তাস বাঁটা হচ্ছে, সেও ওই ফাঁকেই একবার উঠে গিয়ে নেবুতলায় ময়নাকে গালটাল টিপে এসেছে, এসে ময়নার বাপের কাশি আর রোজকার সেই একশিশি মধুর জন্য কাঙালপনা শুনতে শুনতে নিজের ভাগের তাসে চোখ রেখেছে, এমন সময় পলাই কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, বড়দাদাবাবু, আপনার মা মরে গেছে গো!

তার তাস ভালোই পড়েছিল, ময়নাকে রাতে নেবুতলায় আরেকবার পাবারও কথা ছিল, সব মাথায় উঠল ।

সুদেবের গলা শুনে অনেক দূর থেকেও চেনা-আধচেনা লোকজন ছুটে এসেছে । সুদেব কাঁদতে কাঁদতে প্রত্যেকের চোখে একবার করে চোখ রাখছে । যেন সকলের কাছে পালা করে জানতে চাইছে, কেন, কেন, কেন আমার মা মরে গেল?

সুদেবের বউ সুদেবকে চেঁচিয়ে উঠতে দেখে সেই যে একবার কেঁদে উঠেছিল, তারপর আর কাঁদেনি । সে সমানে সুদেবকে গাল পাড়ছে । সুদেব যত কাঁদে, সেও ততই তাকে গালাগাল দেয় । সুদেব কাঁদতে কাঁদতে পুকুরের দিকে দৌড়ে যেতেই তার বউ পিছন থেকে গিয়ে তাকে জাপটে ধরে দুম-দুম করে পিঠে কিল মারতে লাগল ।

সুদেবের পরের ভাই ভূদেব পাশের গাঁয়ে নতুন ইটখোলা করেছে । ভোরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত করে । ইটখোলার কাছেই একটা মদ-গাঁজার দোকানে সন্ধে থেকে নেশা করে সাত-আট মাইল রাস্তা সে ঠিক সাইকেল চালিয়ে ফিরে আসে । তখন দূর থেকে তার খোলা গলায় শ্যামাসঙ্গীত শোনা যাবেই । কোনও কোনও দিন বাড়ি ফিরতে মাঝরাত পেরিয়ে যায় । আজ একজন মুনিষ গেছে তাকে খবর দিতে ।

ভূদেবের পর জয়দেব । সে কখনও সন্ধেবেলা বাড়ি থাকে না । ঝড়জলের দিনেও সে ঠিক বেরোবে । কোমর সোজা করতে পারে না । হাঁটবার সময় হাত দুটো সামনের দিকে ঝলঝল করে । একটু দূর থেকে দেখলে মনে হয় চার পায়ে হাঁটছে । নিজেদের বাগানের

ফলমূল, পুকুরের মাছ-কাছিম চুরি করাই তার পেশা। শীতকাল কপি-বেগুন। গ্রীষ্মকালে আম-কাঁঠাল, শশা-তরমুজ। যখন যেমন। কাঁঠাল, আনারস চুরি করে সে বাগানের মধ্যেই গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখে। ওপরে ডালপালা, পাতাটাতা বিছিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে চুরি করে ধরা পড়ে গিয়ে দাদাদের হাতে তো মার খায়ই, ছোট ভাইরাও তার গায়ে হাত তোলে। যতই মার খাক, সন্ধে হলেই সব ব্যথা-ট্যথা ভুলে এক ফাঁকে সে বেরিয়ে পড়ে। মাটির ওপর ঝুঁকে, প্রায় উবুড় হয়ে হাঁটে। হাত-দুটো সামনের দিকে ঝোলে। ঠিক একটা মার-খাওয়া ধূর্ত শেয়ালের মতো সে অন্ধকারে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। ফল পাড়ে। কোঁচে গিঁথে মাছ মারে। তারপর বাজারে গিয়ে বেচে দেয়। বাজারের কাছেই একটা খোলার ঘরে তার বউ আছে। সন্ধে থেকে সার বেঁধে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে সেও সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকে। জয়দেব বউয়ের জন্য ঠোঙা ভরা গরম সিঙাড়া ফুলুরি-বেগুনি কিনে নিয়ে যায়। বাকি টাকার সবটাই বউয়ের হাতে তুলে দিয়ে, সে হাসে। ওই একটা সময় সে পিছনের দিকে ঘাড় ভেঙে মাথা তুলতে চায়। আজ সে বেরিয়ে যাবার ঠিক পরেই তার মা মারা গেছে। কাছাকাছি থাকলে নিশ্চয়ই বড়দার বীভৎস কান্না শুনতে পেত! একমাত্র তাকেই কেউ খবর দিতে যায়নি।

বারান্দার কোণে বর্শাটা নেই। মহাদেবের ঘরের কুলুঙ্গিতে পাঁচ শেলের টর্চটাও নেই। সহদেব আর মহাদেব গেছে খরগোশ শিকারে। এদিককার বন-জঙ্গলের সব খরগোশ শেষ, আজকাল প্রায়ই তারা দূরের ঝোপঝাড়ে যায়। আজ কোনদিকে গেছে, কখন ফিরবে, কেউ জানে না। তাদের খবর দিতে তিনদিকে তিনজন মুনিষ পাঠানো হয়েছে। মা হঠাৎ চোখ বুজবে, কেউ ভাবেনি!

যেসব মুনিষ তেঁতুলতলার পুকুরে পাটগাছের আঁশ ছাড়াচ্ছিল, তারা সুদেবের আকাশ-ফাটানো কান্না শুনে ছুটে এসেছে। দুজন অল্পবয়সী মুনিষ মাঠ থেকে ফিরেই গোয়ালে ঢুকে ভাগাভাগি করে সাতটা গরু দোয়াচ্ছিল, তারা প্রথমে মেজবউয়ের কান্না শুনে ভেবেছিল মেজদাবাবু আজ হয়ত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। এখন বড়দাবাবুর চিৎকার কানে যেতে উঠোনে এসে তাদের মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

সুদেব একবার দাওয়ায় উঠে মায়ের মৃতদেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, একবার উঁচু দাওয়া থেকে লাফ মেরে উঠোনে পড়ে চিৎকার করে কাঁদছে।

মুনিষদের কারও চোখের পাতা পড়ছে না। সুদেবকে তারা এভাবে কাঁদতে দেখবে কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি। মুনিষরা দম বন্ধ করে দেখল, বড়দাবাবু কাঁদতে-কাঁদতে খুব কাতরভাবে তাদের চোখে একবার চোখ রাখছে।

পলাই বিকেল থেকে কাঁঠালতলায় সারের জন্য গোবর জড়ো করছিল, হাতে-পায়ে গোবর নিয়েই সে সুদেবের খোঁজে দৌড়েছিল, তার হাতের কনুই পর্যন্ত গোবর শুকিয়ে খরখর করছে, ওই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুদেবের কান্না দেখতে লাগল।

বউদের মধ্যে বেশি কাঁদছে মেজবউ। আরও অনেকেই কাঁদছে। সুদেবের তুলনায় আর সকলের কান্নাই বেশ ঢিমে। কেউ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কেউ কাঁদছে ইনিয়ে-বিনিয়ে। সুদেব একদম আলাদা। মনে হচ্ছে শুধু তারই মা মারা গেছে।

বর্ষার শেষেও আজকাল যখন-তখন হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। একটু আগেও লেবুবাগানে, সজনে গাছে জোনাকির ঝাঁক টরটর করছিল, চিড়বিড়িয়ে বৃষ্টি নামতেই সব অদৃশ্য। বড়-বড় ফোঁটা সোজা গায়ে এসে বেঁধে। প্রতিবেশীদের অধিকাংশই যে যার ভিটের দিকে দৌড় লাগাল। কেউ কেউ উঠোনের চারপাশে এ-চালায় ও-চালায় মাথা গুঁজেছে। মুনিষরা তেমনই এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে। তারা জানে, আজ তাদের রাত কাটবে শ্মশানে।

মৃতদেহ উঁচু দাওয়ায় শোয়ানো ছিল। মায়ের মুখে-টুখে জলের ঝাপটা লাগছে, সুদেব বিছানাসুদ্ধ সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, তার কাকা বলল, থাক, একটু জুড়োক।

এই সময় দেখা গেল, দূর থেকে একটা শেয়াল বা কুকুর বৃষ্টির মধ্যে খলবল খলবল করতে করতে ছুটে আসছে। উঠোনের কাছাকাছি এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার ঝলঝলে দু-হাতে দুটো তাল। ভূদেবের বউ তাকে দেখতে পেয়ে নতুন করে ডুকরে উঠে বলল, জয়দেব রে! তোমাদের মা আর নেই!

ভূদেবের বউয়ের কান্নার আওয়াজ কম, কিন্তু মর্মান্তিক। এত বড় বাড়িতে একমাত্র শাশুড়িই তাকে মাতাল ভূদেবের হাত থেকে বাঁচাতে পারত। এই বয়েসেও রাতে শাশুড়ির বুকের কাছে শুতে পেলে সে আর কিছু চায় না।

জয়দেবের ওপর তার একটু বিশেষ মায়া। বিশেষ করে সব ভায়েরা মিলে যখন ওই পঙ্গু ছেলেটাকে ধরে মারে, তার সহ্য হয় না। সে বুক নিঙরে দিয়ে বলল, মরবার সময় মা তোমায় বড্ড কাছে চেয়েছিল গো!

এসব মায়া-মমতার কথা শুনেও জয়দেবের এখন আর এগোবার উপায় নেই। তাল নিয়ে সে কিছুতেই বড়দার সামনে যেতে পারে না। উঠোনের বাইরে বৃষ্টির মধ্যে দু-এক মুহূর্ত থমকে থেকে সে ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে নিল, তারপর বাঁদিকের বনবাদাড়ে ঢুকে মিলিয়ে গেল।

বাড়ির ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা তালপাতার ডোঙা-মাথায় উঠোনে এসে জড়ো হয়েছে। আশপাশের বাড়ির মেয়ে-বউরা এসে তাদের নিয়ে যাচ্ছে। আজ তারা সেখানেই খাবে। আজ বাড়িতে উনুন জ্বলবে না। বড়রা কেউ খাবেও না।

যাদের কেউই এসে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে না, সুদেবের বউ তাদের একেকজন মুনিষ দিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করছে। নিজের তিন ছেলে এক মেয়েকে এতক্ষণ কারও সঙ্গে যেতে দেয়নি। একজন মুনিষকে দিয়ে এদের খগেন জ্যাঠার বাড়ি পাঠিয়ে দিল। যাবার সময় সঙ্গের লোকটাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, বলিস— ঘি দিয়ে মুগের ডাল খেতে এরা ভালোবাসে।

এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে আঁচলের তলা থেকে একটা চকচকে বেগুন বের করে দিয়ে বলল, একটু ছাঁকা তেলে ভেজে দিতে বলিস।

খগেন জ্যাঠার কাছে খুব গোপনে তার কিছু টাকা রাখা আছে!

বৃষ্টি থেমে গিয়ে ফের ঘোলাটে চাঁদ উঠেছে। প্রতিবেশী পুরুষরা বেশ যত্ন করে খাটিয়া বানাচ্ছে। ছ-সাত ক্রোশ রাস্তা, বাঁধন-বুনোন মজবুত না হলে চলবে কেন!

সুদেব তখনও কাঁদছে। মাঝে একটু ঝিমুনি এসেছিল, আবার নতুন করে শুরু করেছে। এর মধ্যে এক ফাঁকে সে একজন মুনিষকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়েছে খই আনতে। আলাদা একটা দশ টাকার নোট দিয়েছে, পয়সায় ভাঙিয়ে আনতে। নাদুকে নোটটা দিয়ে বলে দিয়েছে, এক নয়া আজকাল আর পাওয়া যায় না। তবে দু-পয়সার বেশি নিবি না। প্রথমে সবটা এক টাকা করে নিস। তারপর দরকার হলে দশ দোকানে ঘুরে খুচরো করবি।

এখন তার কান্নার মধ্যে একটা কথাই ফিরে ফিরে আসছে। মা নেই, এবার সংসার কে দেখবে? সংসার এবার ভেসে যাবে।

কাঁদতে কাঁদতেই সে দূর থেকে ভূদেবের গান শুনে একটু ঢিমে দিল। মাঠ থেকে হঠাৎ-হঠাৎ উলটো-পালটা হাওয়া আসছে। ভূদেবের দরাজ গলার গান স্পষ্ট শোনা যায়— এত খেয়েও সাধ মেটে না, এবার কালী তোমায় খাব। তুমি খাবে লেজ-মুণ্ডু মা, আমি পাঁঠার মাংস খাব।

ভূদেবের বউ শোকের মধ্যেও ভুরু কোঁচকাল। অন্যদিন মানুষটা ঠিক-ঠিক শ্যামাসঙ্গীতই গায়। বেসুরো হলেও কথা ঠিক থাকে। কীসব মাথা-মুণ্ডু বকছে।

ভূদেবের বউয়ের আর শান্তি নেই । সব সময় সে ভয়ে কাঁপে । তার জীবনে আরও কী খারাপ ঘটতে পারে ভেবে সারাক্ষণই সে সিঁটিয়ে থাকে । ভিজে হাওয়ায় ভূদেবের প্রলাপ শুনতে শুনতে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, তার এবারের জীবন এইভাবেই একদিন শেষ হয়ে যাবে ।

ভূদেব গান বদলেছে । এবারও মনগড়া কথা মিশিয়ে গাইছে । একটু পরে তার সাইকেলের শব্দ শোনা গেল । ওই তো আসছে । দু-চাকা কাদায় মাখামাখি । চোখ লাল । সাইকেল থেকে নেমে, দাঁড়াতে পারছে না । পা টলোমলো । সামনে খাটিয়া পেয়ে তার ওপর ধপাস করে বসে পড়ল ।

সুদেবের বউ কাকি দিদি হা-হা করে দৌড়ে এল । দিদি বলল নাম, নাম— নেমে আয়! এক ফোঁটা জ্ঞানগম্যি হল না তোর!

সুদেবের কাকি জামার কলার ধরে টানতে-টানতে তাকে তুলে দিয়ে বলল, মড়ার খাটিয়ায় কেউ বসে!

ভূদেব একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, সে হতভাগী কই? শ্মশানে নিয়ে গেছে?

দিদি কিছু বলতে গিয়ে এবার কেঁদে ফেলল ।

ভূদেব বড় একটা হাই তুলে বলল, যখন বেঁচে ছিল আমায় জ্বালিয়েছে— এবার মরে গিয়ে জ্বালাবে ।

সুদেব প্রায় লাফ মেরে তার কাছে এসে হুঙ্কার দিয়ে বলল, থাবড়িয়ে মুখ ভেঙে দেব বাঁদর! আর একটা কুকথা বলবি তো মেরে শেষ করে দেব শুয়োর!

ভূদেবের দু-চোখ দু-টুকরো আগুনের মতো জ্বলছে । রাগে তার নেশা প্রায় কেটে গেছে । সে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে দু-হাতে সুদেবের গলা টিপে ধরে তাকে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলল, বড্ড মায়া! অ্যাঁ, বড্ড মায়া! আজ ওই ছেনালির সঙ্গে সহমরণে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব! তবে আমার নাম ভূদেব বিশ্বাস!

লোকজন ছুটে এসে কোনওরকমে ভূদেবের হাত না ছাড়িয়ে দিলে কী হত বলা যায় না । সবাই মিলে দুজনকে দুদিকে টেনে নিয়ে গেল । ছোটকাকা ভূদেবকে বলল, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ভূদু? নিজের মাকে নিয়ে কেউ ওরকম বলে? শত্তুর মরলেও তো কেউ ওরকম করে বলে না । হাজার মাথা খুঁড়লেও ইহজীবনে আর কি মাকে পাবি?

তার গলা বুজে আসছিল । ছোটবেলা থেকে ওই বৌদিই তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে ।

ভূদেব হঠাৎ সব বুঝতে পারে। ছোটকাকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, কাকা! আমার মা মরে গেছে? আমি ভেবেছিলাম— ও! হো হো হো!

ভূদেব হাউ হাউ করে কাঁদে।

আর রাত করা ঠিক হবে না। পথ কম নয়। তার ওপর বৃষ্টি-বাদলার কথা জোর করে কিছু বলা যায় না। সহদেব-মহাদেবের জন্য আর কত অপেক্ষা করা যায়! যে-তিনজন তাদের খোঁজে গিয়েছিল, একে-একে সকলেই ফিরে এসেছে। চেনা-অচেনা মাঠে বনে খেতে খুঁজেছে, দেখা পায়নি। দু-ভাই আজ খরগোশ মারতে কোন দুনিয়ায় গেছে কে জানে।

বিনোদ বৈরাগী সন্ধে থেকে বসে-বসে তামাক খাচ্ছিল, মুখের সামনে থেকে হুঁকোটা সরিয়ে বলল, সবার ভাগ্যে থাকে না। ছাই হবার আগে বাপ-মাকে একবার চোখের দেখা দেখবার ভাগ্যি সবার হয় না।

সুদেব ভূদেব দু-জনেই কাঁধ দিয়েছে। পায়ের দিকটা কাঁধে নিয়েছে দু-জন জ্ঞাতি। ছোটকাকা চলেছে আগে-আগে। তার হাতে খইয়ের ধামা আর খুচরো পয়সা।

শবযাত্রীরা উঠোন পেরিয়ে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে চলেছে। পিছন পিছন যাচ্ছে চোদ্দজন মুনিষ। অন্যদিন ভোর থেকে কাজ করে সন্ধেবেলা তারা যে যার ঘরে ফিরে যায়। আজ আর তাদের বাড়ি যাওয়া নেই। কেউ তাদের কিছু বলেনি, তারা নিজে থেকেই জানে, আজ তাদের শ্মশানে যেতে হবে।

পদ্মপুকুর ছাড়াতেই বাঁদিকের ঝোপ-জঙ্গল থেকে ভূদেবের মুখের ওপর টর্চের আলো এসে পড়ল। তার কপাল বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। সারা গা ঘামে ভেজা। কাকা পিছনে মুখ ফিরিয়ে বলল, সহদেব-মহাদেব আসছে।

বাহক ও মুনিষরা এবার একটু জোরে বলল, বল হরি হরি বোল। সুদেব ভূদেব দুজনেই গলা মেলাতে গিয়ে কেঁদে ফেলল।

চাঁদ এখন অনেক স্পষ্ট। মাঠভরা জোনাকি। সহদেব মহাদেব বাঁদিক থেকে টর্চ মারতে মারতে ঝোপঝাড় ভেঙে রাস্তায় উঠেই দাঁড়িয়ে গেল। সহদেব হাতের টর্চ নেভাতে ভুলে গেছে। তার বাঁহাতে দুটো খরগোশ। একসঙ্গে ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে নিয়েছে। একটার কান দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। আরেকটার মাথা দু-ফাঁক হয়ে রক্তে মাখামাখি। মহাদেবের হাতে বর্শা।

সহদেবের টর্চ এর-ওর মুখে ছটফট করতে করতে তার মায়ের মাথায় স্থির হয়ে গেল। অন্ধকারে ঝোপের মধ্যে খরগোশ দেখলে দূর থেকে সে ঠিক এমনি করে খরগোশের চোখে পাঁচ শেলের টর্চ ফ্যালে। খরগোশ আর নড়তে পারে না। মহাদেবের হাতে বর্শা দুলে ওঠে। তার টিপ ফস্কায় না।

জঙ্গলে জ্যোৎস্নায় নিঝুম গ্রামের পথে নতুন করে রোদন শুরু হয়। সহদেব কাঁদে— মা রে, এ তুই কোথায় চললি?

খাটিয়া নামানো হয়েছিল। মহাদেব তার মায়ের মুখের ওপর ঝুঁকে দু-হাতে মায়ের মুখ ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে ডাকে, ও মা, মা রে!

মহাদেব বর্শা ফেলে দিয়েছে। সহদেবের হাতে তখনও খরগোশ-দুটো ধরা। এবার তারা কাঁধ দেবে।

সহদেব পাশের ঝোপে খরগোশ দুটো ছুঁড়ে দিতে যাচ্ছিল, কাকা বলল, ফেলিস না। ওই মুনিষদের দে। ওদের তো আর অশৌচ নেই। গরিব মানুষ, তৃপ্তি করে খাবে। তোর মায়ের আত্মারও তাতে কল্যাণ।

সহদেব কাছেই তুঁতেকে পেয়ে খরগোশ তার হাতে দিতে গেল।

কাকা বলল, যা, দৌড়ে গিয়ে তোর বাড়িতে রেখে আয়। কাল সকলে মিলে ভাগ করে খাস।

তুঁতে এক পা পিছিয়ে গিয়েছিল। আমতা-আমতা করে বলল, আমার ঘরে রোজ শেয়াল ঢোকে।

সহদেব পলাইয়ের দিকে খরগোশ-দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নিয়ে যা।

পলাই হাত বাড়ায় না। সে নেবু, ভূধর, কনুদের দিকে তাকিয়ে অজুহাত খোঁজার চেষ্টা করে।

— কী হল রে! ধর—

পলাই তবু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এত শোকের মধ্যেও সুদেব হঠাৎ অসম্ভব গম্ভীর গলায় হুঙ্কার দিল, পলাই!

মুনিষদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তার মধ্যে থেকে নাদু গলা তুলে বলে উঠল, ও-খরগোশ আমরা কেউ খাব না বাবু, ওতে পেত্নী লেগেছে!

সহদেব রাগের চোটে খরগোশ-দুটোকে খুব জোরে ছুড়ে দিল । গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে সে-দুটো সোজা পদ্মপুকুরে পড়ে ঝুপুস করে শব্দ হল ।

খাটিয়া আবার কাঁধে উঠেছে । এবার চারকোণে চার ছেলে । কাকা খই আর পয়সা ছড়াতে ছড়াতে এগোচ্ছে । পিছনে শব-বাহকের দল ।

তুঁতে আর পলাই বিড়ি খাবে বলে ইচ্ছে করেই একটু পিছিয়ে পড়েছিল । নাদুও দাঁড়াল । থক করে খানিকটা শ্লেষ্মা ফেলে বলল, বুড়ি বেঁচে থাকতে কোনওদিন একটা মাছের কাঁটা পাতে দিল না, সে মরেছে বলে খরগোশের ভোজ! থুঃ!

পলাই পর পর কটা লম্বা টান দিয়ে বিড়িটা তুঁতের হাতে দিয়ে বলল, যা হাড়কিপটে বুড়ি! আমরা খরগোশ ছুঁলে ঠিক পেত্নী হয়ে ঘাড় মটকাতো!

সবে কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় তিনজনেই একসঙ্গে শুনল, পিছনের পদ্মপুকুরে ঝপাস করে কী-একটা লাফিয়ে পড়ল । হয়ত সেই শেয়াল বা কুকুরটা । খরগোশ দুটোর লোভে নয় তো?

হরিধ্বনি অনেক দূর চলে গেছে । তারা জোরে পা চালাল । প্রায় দৌড়চ্ছে ।

প্রথম প্রকাশ : অমৃত, ১৯৭৮

# ঠাকুরদার বাড়ি

ছটা নারকেলগাছে জ্যোৎস্না ঘাই দিচ্ছে। আমার ঠাকুরদার বাড়ির এই জ্যোৎস্না আমি চিনি। ষোল বছর বয়েস পর্যন্ত বছর-ভর এই এক পূর্ণিমাই আমি দেখেছি।

জ্যোৎস্নায় চকচকে পিতলের গাড়ুটা দোতলার চৌবাচ্চার গা-ঘেঁসে তেমনই আছে। আমার ঠাকুরদার শেষ রাতের নিত্যসঙ্গী। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস।

বড় জ্যাঠাবাবুর গাড়ু গোলগাল। এখন বৈদ্যবাটিতে তাঁর নিজের বাড়িতে। যদিও তিনি বা তাঁর ছেলেরা আর গাড়ু নেন না, বাথরুমে জলের ট্যাপ আছে। তাঁর পাঁচটিই ছেলে। একজন বিদেশে, একজন হলদিয়ায়, একজন পুণায় ক্যামেরা ঘোরানো শেখে। বাকি দুজন এখনও বউ নিয়ে পৈতৃক ভিটেয়।

মেজো জ্যাঠা চন্দননগরে বাড়ি করে উঠে গেছেন।

আমি সেজোজনের একমাত্র ছেলে। গোল পার্কে ওয়ান বেডরুমের ফ্ল্যাটে স্ত্রী ও এক মেয়ে নিয়ে নির্জনবাস করি। বাবা-মা উত্তরপাড়ায় একতলা ভাড়া দিয়ে অর্ধেক-তোলা দোতলায় আকাশ ধরে ঝুলে আছেন।

নকাকা যাত্রার পার্ট করতেন। ঠাকুরদা মারা গেলে কাকা-জ্যাঠারা আজ ইনি কাল উনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান। নকাকা প্রৌঢ় বয়েসে কাকিমা ও তিন মেয়ে নিয়ে বর্ধমানে এক প্রাক্তন জমিদারের পুকুর-জমি তদারকির কাজ জুটিয়ে চলে গেছেন।

রাঙাকাকা স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক। শ্রীরামপুরেই রেললাইনের ওপারে বাড়ি তুলেছেন। বিরাট বৈঠকখানা। তাতে একসঙ্গে অনেক ছাত্র পড়ানোর সুবিধে।

নতুন কাকাকে আমার ছেলেবেলায় পুজো-প্যান্ডেলে আফ্রিকা ও পৃথিবী আবৃত্তি করতে শুনেছি। তারপর রেলের চাকরি। ঠাকুরদার পরে খালি ঘরে তালা দিয়ে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে যান।

একুশ বছর পর আমি শ্রীরামপুরে এসেছি। ছেলেবেলার বাড়িতে। ছেলেবেলার বাড়ি মানে আমার ঠাকুরদা ও তাঁর আট ছেলের বাড়ি। ঠাকুরদার লম্বাটে গড়নের গাড়ুটা দেখলাম মণিকাকা ব্যবহার করছেন। পোস্ট-অফিসের কেরানি, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পৈতৃক বাড়িতেই রয়ে গেছেন।

বড় জ্যাঠাবাবুদের পাশাপাশি দুটো ঘরেও তালা । ঝুল বারান্দায় মরা মাধবীলতার শুকনো শিরা-উপশিরা আজও দড়ি বেঁধে টেনে রাখা আছে ।

সাত ঘর ছোঁয়া রাজপথের মতো যে বিরাট বারান্দায় আমরা আঠেরো-কুড়িটি বালক-বালিকা দুবেলা পাঠশালা জুড়তাম, সেটার কোণে-কোণে এখন মাকড়শা-আরশোলার কলোনি । ওয়্যারিং ঝুলে গেছে । সন্ধে থেকে অন্ধকার ।

একতলার বারান্দায়, ঠিক এটারই নীচে, একসঙ্গে আঠাশ-তিরিশটা পাত পড়ত । এখন একটা মাত্র জিরো পাওয়ার টিম-টিম করে, না-হলে ঘরের দরজা খুঁজে পাওয়া যায় না ।

এক পাশে ঝুনো নারকেলের স্তূপ । ছটা গাছের সারা বছরের নারকেল! বাগদিপাড়ার গয়ানাথ এসে নিয়ে যাবে । নারকেল-বেচা টাকা থেকে নিজেদের দু-ভাগ কেটে রেখে মণিকাকা ছ-ভাইয়ের নামে-নামে মনি অর্ডার পাঠাবেন । প্রতি বছর পাঠান ।

কিছু নারকেল আর কিছু জ্যোৎস্না নিয়ে ওই গাছকটাই যা আগের মতো । আর সব বদলেছে । এই বাড়ি কি সেই বাড়ি? বাসিন্দার সংখ্যাও সাড়ে তিন । মণিকাকা, ছোটকাকা, তাঁর স্ত্রী ও একটি মেয়ে । অত বড় বাড়িতে একটি মাত্র শিশু!

আমার ঠাকুরদার নাম সূর্যকান্ত কাব্যতীর্থ । আসল পদবী চক্রবর্তী । ও-রকম শুদ্ধউচ্চারণ স্বাস্থ্যবান হেড পণ্ডিত আমি দ্বিতীয় দেখিনি । সৎ হয়েও তিনি স্কুল থেকে রিটায়ার করে একতলাকে দোতলা করেছেন । সকাল থেকে সন্ধে নিজে মিস্ত্রিদের সঙ্গে থেকেছেন, এক মুঠো বালি থেকে এক কণা সিমেন্ট খসতে দেননি ।

শুধু বাড়ি তৈরির ব্যাপারেই নয়, বাড়ির সব কাজেই তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান সুপারভাইজার । সবদিকে তাঁর নজর । তাঁর শাসনে তাঁর পুত্রবধুরা একটি সরষেদানার অপচয়েও সন্ত্রস্ত থাকতেন । তিলেক অপচয় তিনি সহ্য করতে পারতেন না ।

ঠাকুরদার একটা জেদ ছিল । তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কোনও ছেলের আলাদা বাড়ি তো দূরের কথা, আলাদা হেঁসেলও চলবে না । যৌথ পরিবারের লোকবলের দিকটা তাঁর কাছে খুব বড় ব্যাপার ছিল । তিনি স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্ররা বংশানুক্রমে এই বাড়িতেই জীবন কাটাবে । কোন প্রতিবেশীর বাড়িতে কোন ছেলে বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে শুনলে দীর্ঘ বারান্দায় তাঁর খড়ম পায়ে পায়চারি শোনা যেত অনেকক্ষণ । তিনি তিনতলার ভিত দিয়েছিলেন ।

ঠাকুমার শ্রাদ্ধে ধূপধুনোর ধোঁয়ার মধ্যে আমার বাবা-জ্যাঠাদের আটটি মুণ্ডিত মস্তককে উদ্দেশ্য করে ঠাকুরদা বলেছিলেন, আমার শ্রাদ্ধেও আমি পরলোক থেকে তোমাদের এই রকম একত্রিত দেখতে চাই । লোকবলই শ্রেষ্ঠ বল ।

বলে তিনি পুত্রবধূদের দিকে একবার বিরূপ চোখে তাকিয়েছিলেন ।

ভোরবেলা গরু বের করা ছিল মণিকাকার কাজ । গোয়ালঘর থেকে বাইরের চাতালে । বাতাবিতলায় । ভোরে ঠাকুরদার সংস্কৃত মন্ত্রের সঙ্গে হাম্বা-হাম্বা আমার এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে জামাইষষ্ঠীতে এক রাতের জন্যও মামার বাড়িতে থাকতে আমার একটু অসুবিধে হত ।

মণিকাকা নিজে খড় কাটতেন, খোল ভেজাতেন । চাতালের বাঁধানো মাটির গামলায় গরুর জাবনা দিয়ে দাঁতন মুখে সোজা গঙ্গায় । তারপর বড় জ্যাঠাইমার রান্না ভাত ডাল মাছের ঝোল ও মেজজ্যাঠাইমার সাজা পান খেয়ে পোস্টঅফিসে ।

বড়দের আপিশ, ছোটদের ইস্কুল, অতএব রান্না শুরু হত শেষরাতে । বড় জ্যাঠাইমা উনুনে ভাত চড়িয়ে রান্নাঘরের মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতেন । ভাত ফোটার শব্দে ঠিক তাঁর ঘুম ভেঙে যেত ।

আলো ফুটলে তিনি রাঙাকাকার হাতে বাজারের থলে ধরিয়ে কানে ফর্দ পড়িয়ে দিতেন । রাঙাকাকা ঠাকুরদার কাছ থেকে বরাদ্দ টাকা নিয়ে বাজারে যেতেন । বাজার এলে অন্য বউয়েরা শিল-নোড়া নিয়ে বসে যেতেন । গয়লা এসে গরু দুইয়ে দিত ।

জলখাবার, আপিশের ভাত, ইস্কুলের ভাত, ছেলেদের টিফিন, নিজেদের খাওয়া—সবশেষ হতে বেলা আড়াইটে-তিনটে ।

ওবেলার রান্নার দায়িত্ব একেক দিন একেক জনের পালা করে । তখন বড় জ্যাঠাইমার ছুটি । সন্ধে হতেই তিনি আমাদের আঠেরো-কুড়িজনকে ডেকে নিয়ে পড়াতে বসতেন বারান্দায় । আমার ছোট দু-কাকাকে তিনিই কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন । আমার মা আমাদের সকলকে ছবি আঁকা শেখাতেন, তাঁর আঁকার হাত ছিল চমৎকার । হাতের লেখা সুন্দর করতে আমরা তাঁর কাছেই শিখেছি । আমার, বড়দার (বড় জ্যাঠাবাবুর বড় ছেলে) ও কেতকীর (মেজো জ্যাঠার মেয়ে) হাতের লেখা দেখিয়ে আমার মা তাঁর জায়েদের কাছে গর্ব করতেন ।

অসুখ-বিসুখে সেবা করতে ন-কাকিমার জুড়ি ছিল না । শুধু তাঁর সেবা-যত্নের লোভে আমি ছেলেবেলায় অনেক দিন মনে মনে জ্বর চেয়েছি । ন-কাকার চাকরি ভাল লাগত না, তিনি তিনবার চাকরি ছেড়েছেন । যাত্রা করতেন বলে কাকিমাকে অনেক দুঃখ সইতে হত । বিশেষ করে ঠাকুরদাকে লুকিয়ে রিষড়ায় কি ভদ্রেশ্বরে সারারাত যাত্রা করে এসে যেদিন তিনি ভোরে ঠাকুরদার কাছে ধরা পড়ে যেতেন, সেদিন তাঁর ও কাকিমার লাঞ্ছনার শেষ থাকত না । ঠাকুরদার বকুনি তো মেঘগর্জন, শুনে আমরা ছোটর দল যে যার বিছানায় ঘুম

ভেঙে ভয়ে ও উত্তেজনায় উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম। ঠাকুরদা কাকিমাকেও বকতেন, কেন তিনি আগেই ঠাকুরদাকে জানিয়ে দেননি।

একদিন, সেও ভোরবেলা, ঠাকুরদা প্রাতঃকৃত্য সেরে, শুচি বসনে, পুবমুখো আসনে, উদাত্ত স্বরে স্তোত্র পাঠ করছেন, এমন সময় নীচে আরও উদাত্ত, আরও জলদ কাবুলির গলার শোনা গেল। নীলকান্তবাবুকে ডাকছে। নীলকান্ত ন-কাকার নাম।

ঠাকুরদা পড়েই চলেছেন, তবে খুব দ্রুত, কাবুলিটাও উত্তরোত্তর গলা চড়াচ্ছে, হঠাৎ খিড়কির দরজা দিয়ে ন-কাকাকে পালাতে দেখে স্তোত্র পাঠ থেমে যায়। পঁচাত্তর বছরের ঠাকুরদা সাত লাফে সিঁড়ি ভেঙে বাঘের থাবায় ন-কাকার ঘাড় ধরলেন।

— বাড়িতে কাবলি কেন?

ন-কাকা ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া চোখে ঠাকুরদার দিকে শুধু চেয়ে আছেন।

— টাকা নিয়ে কী করেছিস? টাকার তোর দরকার পড়ল কিসে?

ন-কাকার মুখে কথা নেই।

— তোর বাবা বেঁচে নেই? রোজগেরে দাদারা নেই? তুই গেছিস কাবলির কাছে টাকা নিতে!

বাঁ হাতে চুলের মুঠি ধরে ডান হাতে তিনি ন-কাকার গালে ঠাস-ঠাস চড় কষাতে লাগলেন। সেদিন বড় জ্যাঠাবাবু, মেজ জ্যাঠা, আমার বাবা ও রাঙাকাকাও ঠাকুরদার চড়-ঘুঁষি খেয়েছিলেন। তাঁরা ন-কাকাকে বাঁচাতে এসেছিলেন। মণিকাকা গরুর জাবনা মাখা হাতে ছুটে এসেছিলেন, ঠাকুরদার চড় থেকে মুখ বাঁচাতে তাঁর সারা মুখে খোল-ভূষি লেপে যায়।

ন-কাকা কাকিমাকে রুপোর মল কিনে দিয়েছিলেন। সে দায়িত্ব তাঁর নয়।

এমার্জেন্সি ভাণ্ডার থেকে ঠাকুরদা সেদিন কাবলির টাকা মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

নানা খাতে ঠাকুরদা আলাদা-আলাদা টাকা রাখতেন। ওষুধ-ডাক্তার, অতিথি-অভ্যাগত, রোববারের মাংস ও বাড়তি বাজার ইত্যাদি। সংসার খরচের জন্য তিনি শুধুমাত্র রোজগেরে ছেলেদের কাছ থেকে তাদের আয়ের মাত্র ২৫ শতাংশ নিতেন। তাছাড়া প্রত্যেক মাসে মাথাপিছু পাঁচ টাকা নিয়ে পোস্টঅফিসের ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনে রাখতেন, ভবিষ্যতে কোনও নাতনির বিয়ের খরচ কম পড়লে ওই টাকা থেকে কাজ চালানো যাবে। তাঁর নিজের শ্রাদ্ধের খরচ পোস্টঅফিসে সুদে বাড়ছিল।

রোববার বা যে-কোনও ছুটির দিনে খাবার বারান্দাকে মনে হত নেমন্তন্ন বাড়ি। সেদিন বাড়ির সব বউ একসঙ্গে পরিবেশন করতেন। বড় জ্যাঠাইমা রান্নাঘরে বসে গামলায় একেকটি পদ তুলে দিতেন, আর মাছি তাড়াতেন। রাঙাকাকিমার তেমন কাজে খ্যাতি ছিল না। একটু কুঁড়েও ছিলেন। সাজতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর গানের গলা ছিল। বিয়ের আগে নাকি দুয়েকবার রেডিওয় অতুলপ্রসাদ গেয়েছিলেন। তিনি শুধু লেবুটা নুনটা দিয়ে যেতেন। খুব বেশি হলে, জলের জগ। নতুন কাকা একদিন খাবার পাতে কচি, রসহীন লেবু পেয়ে খাওয়া ছেড়ে উঠে যান। খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর খুব খুঁতখুঁতুনি ছিল। পরে একদিন ওই রাঙাকাকিমার হাতেই তাঁর সঞ্চয়িতার পাতা ছিঁড়ে যাওয়ায় তিনি রাঙাকাকিমাকে খোঁটা দিয়ে কথা বলেন। সেই থেকে রাঙা-কাকাদের সঙ্গে তাঁর কথা বন্ধ। যেদিন রেলের চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছেন, আমি তাঁর ব্যাগ, সুটকেশ রিকশায় তুলে দিচ্ছি, রাঙাকাকিমা তাঁর জানলা থেকে আমাকে হাতছানি দিলেন, কাছে যেতে বললেন, ও কোথায় যাচ্ছে রে?

— তুমি জানো না?

— আমাকে কিছু বলে, না জানায়! সুটকেশ-টুটকেশ নিয়ে কোথায় চলল?

— রেলের চাকরি পেয়েছে, শিলিগুড়ি যাচ্ছে।

ততদিনে আরও অনেকেই বাড়ি ছেড়েছেন। বড় জ্যাঠাবাবু বৈদ্যবাটিতে।

মেজো চন্দননগরে। আমার বাবা উত্তরপাড়ায় জানলা বসাচ্ছেন। তখনও ঠাকুরদার শ্রাদ্ধের পর বছর ঘোরেনি।

নতুনকাকা পরের বছর এসে বউ-ছেলেকে নিয়ে যান।

এই নতুনকাকাই যেদিন কাগজে তাঁর আই এস সির রেজাল্ট দেখে এসে ছোট বৈঠকখানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে উঠেছিলেন, সেদিন তাঁর সব বৌদি মিলে যেভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন তার কোনও তুলনা হয় না। অনেকটা রামায়ণ-মহাভারতের যুগের মতো। ঠাকুরদা তাঁর এই আদরের ছেলেটিকে বেকার অবস্থায় বিয়ে দিয়েছিলেন, হাত খরচের টাকাও বরাদ্দ করেছিলেন, কিন্তু নতুন বউয়ের মনে বেকার স্বামীর জন্য কোনও গ্লানি জমতে দেননি তাঁর বৌদিরাই। কোনও ইন্টারভিউয়ের পর বাড়িতে পিওন এলে সবাই লাফিয়ে উঠেছেন, বুঝি নতুন ঠাকুরপোর চাকরি হল।

সেই মন, সেই যুগ একদিন ঝরে যায়। ঠাকুরদার শেষ ক-বছর ভাইয়ে-ভাইয়ে, বউয়ে-বউয়ে তিক্ততা, হাজারও খিটিমিটি রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সামান্য দুধের ভাগ নিয়েও ঈর্ষা দেখেছি। মেজো নিশ্চয়ই ওর ছেলের জন্য আজ এক পো দুধ বেশি সরিয়েছে!— এই সন্দেহও শুনেছি। আমি কি সারা জীবন শুধু হেঁসেল নিয়েই পড়ে থাকব! কেন, মেজো কি একদিন উনুন ধরাতেও পারে না? একবেলা বাসন মাজলে সেজোর কি ছবি আঁকার আঙুল নষ্ট হয়ে যাবে? রাঙা কী অত গানের গলা দেখায়! দিনভর ছেলেদের পিছনে এমন গলা ফাটাতে হলে দেখা যেত! বড়রই বা অত গুমর কিসের? বাবা তো দেখছি সব চাবিই একে-একে ওর আঁচলেই বাঁধছেন! ভিমরতি!

তারপর শুরু হয় এঘরে হরলিকস, ওঘরে মাখন, সেঘরে জ্যাম-জেলি— আলাদা আলাদা বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা।

ও কেন এত কম টাকা দেবে? সে কেন বসে বসে খাবে? ও কেন সারা রাত আলো জ্বেলে রাখে? সে কেন সারা সন্ধে বন্ধু নিয়ে বৈঠকখানা আটকে রাখে? ও কেন অত ভোরে বেরোয়, সে কেন অত রাত করে ফেরে, আমার বউয়ের অন্য কাজ নেই? এক ধরনের হীনতায় বাড়ি ম-ম করে। অশান্তিতে বাড়ি থম মেরে থাকে।

বড় জ্যাঠাবাবু একদিন ঠাকুরদাকে বললেন, আপনি এসব বুঝতে চান না, কিন্তু ছেলেরা বড় হয়েছে, রোজ রোজ এত অশান্তি ওরা সহ্য করবে কেন?

রাঙাকাকা একদিন বললেন, আপনি চোখ বুজে থাকেন কিন্তু এরকম পরিবেশে মেয়েদের মানুষ করা শক্ত!

নতুনকাকা বললেন, বাবা! আপনি যদি সম্মতি দেন, আমি রেণুকে নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিই, বাড়ির সবাই যখন তাই চাইছে!

ছোটকাকা অনার্সে গোল্ড মেডেল পেয়ে সংস্কৃতে এম-এ পড়ছিলেন, বললেন, বস্তিতে থেকে সংস্কৃত চর্চা হয় না। তার চেয়ে পড়াশুনো ছেড়ে দোকানে খাতা লেখাও ভালো। বড়দা মেজদারাও তো চায়, পড়া ছেড়ে যাহোক একটা চাকরি করি। লেখাপড়া তো শুধু ওদের ছেলেদের জন্য। বেশ, তাই হবে!

শেষদিকে ঠাকুরদাও আর তেমন দাবাথাপা ছিলেন না। তাঁর পেশী শিথিল, মন ঝিমনো, বেশিরভাগ সময় একা চুপচাপ বসে বসে শুধু ভাবেন। কখনও খড়মের খট খট শোনা যায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আগের মতোই শেষ রাতে ওঠেন, কাপড়ের খুট গায়ে দিয়ে পায়খানা যান, শুচি বসনে পুবমুখো হয়ে সংস্কৃত স্তোত্র পড়েন, বাজারের টাকা বের করে দেন। কারও বাড়ি ফিরতে দেরি হলে যথারীতি বার বার উঠে এসে খোঁজ নেন, ফিরেছে কিনা।

তাঁর ঘুম কমে গিয়েছিল । মাঝরাতে তাঁর ঘরের সামনের জ্যোৎস্না ভেঙে চৌবাচ্চার দিকে যেতে যেতে আমি অনেক দিন শুনেছি, তিনি একা ঘরে কার সঙ্গে কথা বলছেন । অত রাতে, একা কার সঙ্গে? ঠাকুমার সঙ্গে কি?

ছেলেদের অনুনয় করেন, আমি বেঁচে থাকতে তোরা আলাদা হোসনি । আর তো কদিন ।

তারপর খড়মের খট-খট ।

মারা যাবার আগে তিনি উইল করে যান, বাড়ির কোনও অংশ ভাড়া দেওয়া যাবে না । পার্টিশান তোলা যাবে না ।

সময়ের উলটো স্রোতে তিনি তাঁর স্বপ্নের খেয়া বইতে চেয়েছিলেন । ভেবেছিলেন এইসব শর্তের দড়ি-দড়ায় ছেলেদের এক জায়গায় বেঁধে রাখবেন ।

ওই সময়টা ঠাকুরদা ঘন ঘন নস্যি নিতেন । ওটিই তাঁর বড় নেশা, আর দু-বেলা দু-খিলি পান । শেষ দিকে দাঁত ছিল না, নতুন কাকিমা পান থেঁতো করে দিতেন ।

বাড়িতে চা হত কোনও অতিথি, কি বাড়ির কোনও জামাই এলে । সারা বাড়িতে অতজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, আমি কোনওদিন কাউকে সিগারেট খেতে দেখিনি ।

আমরা ছোটরা একদিন সিগারেট খেয়ে মণিকাকার কাছে শাস্তি পাই । দল বেঁধে মাহেশে রথের মেলায় গিয়েছিলাম, সেখানে স্কুলের কালীচরণের প্ররোচনায় দুটো কাঁচি কিনে আমরা আঠেরোজন একটা করে টান দিয়ে খুব কেশেছিলাম । বড়দের চেনা-জানা কেউ দেখে থাকবে, বাড়ি ফিরতেই মণিকাকার মুখোমুখি । তিনি ওত পেতে ছিলেন । শাস্তি ঠিক হয়, পরদিন স্কুল থেকে ফিরে ছাদে আমাদের বলখেলা বন্ধ ।

গরুর চাতালের বাতাবি লেবু দিয়ে ছাদে ফুটবল খেলা আমাদের বিকেলের সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল । এখন মনে হয়, বিকেলের বিরাট ছাদটাই ছিল আসল আকর্ষণ । এই ছাদ থেকে কতদিন রামধনু দেখেছি । ছাদের এক কোণে মঞ্চ বেঁধে আমরা বাড়ির ছেলেরা অবাক জলপান, লক্ষ্মণের শক্তিশেল করেছি । বুড়োরা আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । কাকি-জ্যেঠিরা আমাদের সাজিয়ে দিয়েছেন । ন'কাকা হতেন প্রম্পটার ।

ছাদ বলতে, সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে পৌষসংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানো । শ্রীরামপুরে ওটাই ছিল ঘুড়ি ওড়ানোর বড়দিন । আকাশ ঘুড়িতে-ঘুড়িতে ছেয়ে যেত । ঘুড়ি ওড়ানোয় বাড়ির বড়দের উৎসাহ ছোটদের চেয়েও বেশি ছিল । ঘুড়ি ওড়ানো, প্যাঁচ খেলা, ঘুড়ি দিয়ে

কাটা-ঘুড়ি লটকে আনার রীতি-পদ্ধতি নিয়ে তাঁদের চিন্তা, গাম্ভীর্য, নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ পুরো ব্যাপারটাকে আমাদের চোখে বেশ মর্যাদাবান করে তুলত ।

পৌষসংক্রান্তির কদিন আগে থেকে বাড়িতে লাটাই পালিশ করা, ঘুড়ি বানানো, সুতো কেনার হিড়িক পড়ে যেত । তার ওপর ছিল ছাদজোড়া সুতো মাঞ্জা দেওয়ার উত্তেজনা । সবুজ বোতল গুঁড়িয়ে মিহি করা, শিরীষ ভেজানো, এইসব আয়োজনে বড়দের সঙ্গে সারাক্ষণ আমরা সেঁটে থাকতাম । সে এক রোমাঞ্চ!

তারপর পৌষের শেষ দিনটিতে ভোর থেকে আমরা পাখি হয়ে সারা আকাশ চক্কর দিয়ে ফিরতাম । মাঝে মাঝে নিচে নেমে নলেন গুড় দিয়ে গরম গরম চিতুই পিঠে খেয়ে আবার আকাশে । কখনও পুলিপিঠে, কখনও পাটিসাপটাও ব্যস্ত ছোঁয়ে তুলে নিয়েছি ।

মা-কাকি-জ্যাঠাইমাদের সেদিন চুলে চিরুনি বোলাবার সময় হত না । আগের রাত থেকেই শুরু হয়ে যেত চাল বাটা, নারকেল কোরানো, রাঙা আলু সেদ্ধ করা, হরেক কাজ ।

সারাদিন খড়মের খট খট তুলে সকলের পিঠে খাওয়া তদারক করে বেড়াতেন ঠাকুরদা ।

খড়মের খট খট শব্দে আরেকটা বার্ষিক আনন্দের কথা মনে পড়ে । খড়ম সেখানে হরিষে বিষাদ ডেকে আনতো । আমাদের বাড়িতে কালীপুজোয় বাজি পোড়ানো হত ধুম করে । বাজি মানে শুধু তুবড়ি । কাকারা প্রতি বছর তুবড়ির আরও ভালো ফর্মুলা বার করতেন । বসন তুবড়ি, উড়ন তুবড়িতে তাঁদের হাত-যশ অন্য পাড়াতেও রটেছিল । মুস্কিল বাধত ছুঁচোবাজি নিয়ে । ঠাকুরদার কড়া নিষেধ ছিল, ছুঁচোবাজি বানানো চলবে না । কাকারা লুকিয়ে বানাতেন । আমাদের কাজ ছিল, খড়মের খট খট শুনলেই খবরের কাগজ দিয়ে ছুঁচোর মশলা ঢেকে গা দিয়ে আড়াল করে বসা । ছুঁচো পোড়ানোও হত লুকিয়ে-চুরিয়ে ।

সন্ধে হতেই বাড়ির উঠোনে, ছাদে পর পর অনেকগুলো তুবড়ি জ্বালানো হত । চারদিক আলোয় অলঙ্কৃত হয়ে উঠত । তারপর কাকারা ব্যাগে বাছাই করা তুবড়ি নিয়ে আশপাশের প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জ্বালাতেন । আমরা ছোটরাও সঙ্গে যেতাম! সেই আলোর ফুলকি আমি এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই । বুকের চামড়ায় ছ্যাঁকা দেয় ।

ভোররাতে স্তোত্র পড়তে পড়তে ঠাকুরদা হঠাৎ থেমে যান । বাড়ির সবাই জেগে উঠে দেখেন, তাঁর মাথা পুবমুখো প্রণামের ভঙ্গিতে মাটিতে ঠুকে রয়েছে । গা ঠান্ডা ।

তাঁর আট ছেলেকে এক ছাদের নিচে থাকার দায় থেকে মুক্তি দিয়ে ওই শেষবার তিনি আটটি মুণ্ডিত মস্তক একত্রিত দেখেছিলেন ।

ধূপধুনোর ধোঁয়ায় ছোটকাকার চোখে জল এসেছিল, পুরোহিতের উচ্চারণ শুধরে দিয়ে বললেন, আমার বাবার শ্রাদ্ধে ভুল সংস্কৃত আমি সহ্য করতে পারব না । সময় নিয়ে মন্ত্র পড়ূন!

ছোটকাকা এখন ওখানকার সবচেয়ে প্রাচীন বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষক । কানাডায় অধ্যাপনার ডাক এসেছিল, তিনি যাননি । পৈতৃক বাড়ির বেশিটাই জরা ও উইয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে ছোট একটা অংশে তাঁরা দুভাই থাকেন । তিনি, তাঁর স্ত্রী ও এক মেয়ে । ঠাকুরদার ঘরে চিরকুমার মণিকাকা । দুজনেরই সামান্য আয়, বাড়ি সারানোর স্বপ্ন দেখা ছেড়েছেন । আর কেউ তো খোঁজ নেন না ।

আমি এসেছিলাম আমার মেয়েটাকে দেখাশোনা করার যদি একটা লোক পাওয়া যায় । আশপাশের চেনা-জানা কাউকে পেলে ভালো । বিশ্বাসী, নিজের লোকের মতো থাকবে । মেয়ে দেখবে । বাড়ি পাহারা দেবে । আমার স্ত্রী সামনের মাস থেকে কলকাতা টি ভিতে খবর পড়ার কাজ পেয়েছেন । একা বাড়িতে বাচ্চা রেখে কাজে যাওয়া সম্ভব নয়, আবার এই দুর্মূল্যের বাজারে একার আয়ে সংসার চালানোও অসম্ভব ।

ছোটকাকা বললেন, এখানে চলে আয় ।

— তাই কি হয়?

বলে আমি বাইরে এসে সিগারেট ধরাই । কাকাদের সামনে অনেকক্ষণ সিগারেট খেতে পারিনি ।

প্রথম প্রকাশ : অমৃত, ৫ আগস্ট, ১৯৭৭

# .নৌকোবদল

দিলু দুপুরে হরিণের মাংস খেয়েছে, ভালোমতো হজম হয়নি, পেটটাও একটু ভুটভাট করছে, ডাঁও করে একটা ঢেঁকুর তুলে বলল, অলি খবরদার! তুই যাবি না ।

অলি, যার ভালো নাম অঞ্জলি, এই গাঁয়ের সবচেয়ে সুন্দর তো বটেই, সবচেয়ে লম্বা মেয়ে । গোসাবা যাবে বলে ড্রেস দিয়ে শাড়ি পরেছে । পিঠে লম্বা বিনুনি । নদীর উঁচু বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল । বাঁধের কাছেই একটা বাইন গাছের ডালে নৌকো বাঁধা । জামাইবাবুর কথায় শুকনো এঁটেলমাটিতে ঠপ ঠপ করে পা ঠুকতে ঠুকতে বলল, যাবই, আমি যাবই । ইস, আমি কোথাও যাব না, না!

তার মাথার পিছনেই সূর্য অস্ত যাচ্ছে । ঠিক মনে হয় আকাশে আগুন ধরে গেছে ।

দিলু নীচ থেকেই মুখ তুলে সাংঘাতিক চোখে তাকিয়ে বলল, তোর নাচ আমি বার করছি— গিয়ে দ্যাখ!

অঞ্জলি ভয়ও পেয়েছে, আবার দুঃসাহসও ছাড়তে পারছে না, সে বোধহয় নৌকোর দিকেই তরতর করে নেমে যাচ্ছিল, গোসাবার মানুষ বোঝাই দিয়ে বড় একটা নৌকোকে এদিকেই আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল । গিরিকে সে প্রথমেই দেখতে পেয়েছে । আর তার গোসাবায় যাবার দরকার নেই ।

দিলু নীলকণ্ঠকে তাগাদা দিল, তোমার কী মতলব বলো তো? সন্ধে লেগে যাচ্ছে, এরপর আর লক্ষ্মণকে পাবে? একবার নেশায় বসে গেলে তখন হাজার টানাটানিতেও নড়বে না ।

মাঠে বিকেল থেকেই লোক আসতে লেগেছে । আশপাশের গাঁয়ের মানুষ তো বটেই, দূর-দূর গাঁ থেকেও লোক আসছে । ওপারের দ্বীপ থেকে নৌকো বোঝাই করে মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চা-বুড়ো আসছে । এই সময় দোকান ফেলে ওঠা নীলকণ্ঠের পক্ষে প্রায় অসম্ভব । সারা বছর তার বাড়িতেই তার দোকান । সামান্য টুকটাক বেচাকেনা । বছরে এই দুয়েকাবরই যা বড়মাপের দোকানদারি । গ্রামে এরকম যাত্রাগানের আসর-টাসর বসলে সে মাঠে দোকান দেয় । বড় ছেলেকে ক্যানিং পাঠিয়েছে, সিগ্রেট, পাউরুটি, কেক-বিস্কুট আনত । বিকেলের লঞ্চের সময় পার হয়ে গেল, এখনও ছেলে ফিরল না । সেই এক দুশ্চিন্তা, তার ওপর অন্যের হাতে দোকান ফেলে যাবার ভয় । নীলকণ্ঠ খদ্দেরের পানে

খয়ের লাগাচ্ছিল, বিরক্তি নিয়ে বলল, শরীর বুঝে খেতে পারে না! ও বুড়োকে দেখেই আমার খটকা লেগেছিল । বাঁশি বাজাতে বুকের দম লাগে! হাভাতে মড়া, পেট ঠেসে হরিণ খেয়ে এখন চিত্তির!

নীলকণ্ঠ নিজে বৈষ্ণব । বাড়ি থেকে কখনও ডিম বিক্রি করে না । মাঠে, যাত্রার আসরে অন্য কথা । আগুন আগুন তিনটে মুরগির ডিম ছাড়িয়ে দিয়ে খুচরো পয়সা গুনে রাখতে দিলুর দিকে মুখ তোলে, তোমাদেরও বলিহারি! দেশে আর যাত্রার দল পেলে না!

দিলু ডাঁও করে ঢেঁকুর তোলে, মাংস তো আমরাও খেয়েছি!

— তখন থেকে গুব-গুব ঢেঁকুর তুলছ! আসলে যাত্রা দলের বাঁশি-বাজিয়ে লোকটার ওপর নীলকণ্ঠ চটে আছে । লোকটা শেষবেলায় লোভের বশে ভুরিভোজ করে বার বার দাস্ত-বমি করে বিছানা নিয়েছে । ওই বুড়োর জন্যই এখন তাকে গোসাবায় ছুটতে হবে । লক্ষ্মণকে ধরে আনতে হবে । বুড়োর বদলে সেই বাঁশি বাজাবে । এ-তল্লাটে লক্ষ্মণের মতো বাঁশি-বাজিয়ে আর কে আছে! তার বাঁশির কাছে পাখিরাও হার মানবে । নৌকো বিকেল থেকেই তৈরি । দিলু যাবে, মোহন যাবে, নীলকণ্ঠকে তো যেতেই হবে । আরও কিছুক্ষণ জোয়ার থাকার কথা । গুণ টানতে হতে পারে । তরমুজকেও তাই দলে নেওয়া হয়েছে । গুন টানায় ওস্তাদ । এক ধামা মুড়ি পেলেই হল । সবাই তৈরি । শুধু নীলকণ্ঠ না গেলে লক্ষ্মণ কিছুতেই আসবে না । এ গ্রামে ইহজীবনে তার আর পা দেবার কথা নয় । নীলকণ্ঠই তাকে ওই কড়ার করিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল । এখন তাকেই গিয়ে সাধাসাধি করতে হবে । তার ওপর ভয়, সন্ধেবেলা একবার নেশার জিনিস নিয়ে বসলে আর তাকে তোলা যাবে না ।

ইস্কুলবাড়িতে নট-নটীদের সাজগোজ চলছে পুরোদমে । প্রত্যেকটা জানলায় ভিড় । গ্রামের মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে । জানলা দিয়ে চোখ বড় বড় করে সাজসজ্জা দেখছে ।

তরমুজ একবার সাজঘরের জানলায় গিয়ে উঁকি দিচ্ছে, একবার বাঁধের কাছে নীলকণ্ঠের দোকানে এসে দাঁড়াচ্ছে । সে একটু উত্তেজিত । স্বয়ং অধিকারী এসে নীলকণ্ঠদের তাগাদা দিয়ে গেল । যে বাঁশি বাজাবে তার সঙ্গে একবার মহড়া না দিলেই নয় । তার নিজের লোক যে তাকে এভাবে পথে বসাবে কে জানত! পায়ের কেডসের নিচে সিগ্রেটের টুকরোটা ডলে দিতে দিতে বলল, ফিরে গিয়ে এই অপদার্থটার আর আমি মুখ দেখব ভেবেছেন!

নীলকণ্ঠ টাকাপয়সার হিসেব নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে । মিনিটে-মিনিটে এটা-ওটার দাম গুনে নিচ্ছে, গুনে-গুনে খুচরো ফেরত দিচ্ছে । প্রতি মুহূর্তে সাবধান থাকা দরকার ।

বড়ছেলেও এখনও ফিরল না । অধিকারীর কথায় সে ঝেঁঝে উঠল, অধিকারী ওমনি-ওমনি হওয়া যায় না! দরকার হলে আড়বাঁশিও মুখে নিতে হবে, আবার গানও ধরতে হবে!

নীলকণ্ঠ যৌবনে যাত্রা করত । দলও করেছিল একবার । অভাবে পড়ে দল ভেঙে যায় । যাত্রা ছিল তার প্রাণ । তার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান । কোনও দিন পান-তামাকও সে ছোঁয়নি । নেশা বলতে ওই যাত্রাই । ওটাই ছিল তার একমাত্র সাধ-আহ্লাদ ।

সেটা মিটল না দেখে নীলকণ্ঠ তার নেশাটা বদলে নিল । যাত্রা-টাত্রা ছেড়ে সে খুব মন দিয়ে টাকা-পয়সা করতে লাগল । সে যে কিসের ব্যবসা করে না, চট করে বলা মুস্কিল । অন্যদিন এতক্ষণে সে ভাত খেয়ে ঘুমোতে গেছে । প্রথম রাতটা ঘুমিয়ে নিয়ে রাত দশটা বাজতে-না-বাজতেই সে রোজ উঠে পড়ে । সারারাত জেগে বসে থাকে । টাকাপয়সা পাহারা দেয় । বাইরে একটা খরগোশের পায়ের শব্দ হলেও চেঁচিয়ে ওঠে, কে যায়?

এদিকে বাঁশির লোক না পাওয়া গেলে যাত্রাই হয়ত বন্ধ । রাতভর তার বিক্রি-বাটা হবার কথা । সব শিকেয় উঠবে । মাঠে ভিড় বাড়ছে । নৌকো ভরে ভরে লোক আসছে । ছেলেটার টাকা-পয়সা মার যায়নি তো? পরের লঞ্চ রাত ন-টায় ।

নীলকণ্ঠ একবার শেষ চেষ্টা করে । অধিকারী তার খোঁচা হজম করে ফিরে গিয়েছিল । দোকানে যে-লোকটা জিলিপি ভাজছিল, নীলকণ্ঠ তাকে হাঁক দিয়ে বলল, বেশ লাল দেখে চারখানা দিলুকে দে । দুটো পয়সা তুমি কম দিও দিলু!

দিলু চটে ওঠে, জিলিপি কে খাবে? তুমি থাকো! আমরা যাচ্ছি! লক্ষ্মণ না আসতে চাইলে বেঁধে আনব! মেরে অজ্ঞান করে নিয়ে আসব! চল, তরমুজ! এসো মোহনদা ।

কী অদ্ভুত জেল্লাদার একেকজনের সাজ! তরমুজ এসব ছেড়ে এখন আর যেতে পারে না । এর মধ্যেই সে একবার বাঁধের ওদিকে নেমে নদীর স্রোত ছুঁয়ে পরীক্ষা করে এসেছে । গলা খাঁকরে বলল, এখুনি জোয়ার নেবে যাবে । ভাঁটা শুরু হবে । আমি জল ছুঁয়ে দেখেছি । নৌকো ছন-ছন করে ছুটবে । গুন টানার দরকার হবে না ।

দিলু নিজেকে সামলাতে না পেরে ঠাস করে তরমুজের গালে এক চড় কষাল! অন্য যে কেউ হলে মাথা ঘুরে পড়ত । তরমুজ ফিক করে হেসে ফেলে ডানহাত বাড়াল ।

এর একটা ইতিহাস আছে । তরমুজের মা-বাপ, বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি, কিচ্ছু নেই । থাকার মধ্যে এক সাংঘাতিক খিদে । খাবার জন্য তার ফন্দি-ফিকিরের শেষ নেই । অসম্ভব দুষ্টু বুদ্ধি । প্রায়ই তার ফন্দিফিকির ছল-চাতুরি ধরা পড়ে গিয়ে সে গ্রামের লোকের হাতে মার খায় । তার মা ছিল এদিককার বিশ-পঁচিশটা গ্রামের জগজ্জননী । সকলের বরাভয় । দিন নেই, রাত নেই, সবসময়ই কোনও না কোনও গ্রামে কারও না কারও সেবা করে

বেড়াচ্ছে । গ্রামে রোগ-ব্যাধির শেষ নেই । তরমুজের মায়ের সেবা-কাজেরও ক্ষান্তি নেই । মরবার দিন পর্যন্ত অন্য মানুষের শিয়রে কাটিয়েছে । লতাপাতা শেকড়বাকড় বেটে ওষুধ খাইয়েছে । মাথায় জল দিয়েছে । কারও বুকে হাত বুলিয়ে দিয়েছে । ওই মায়ের এই ছেলে! এবাড়ি-ওবাড়ি, এখেত-ওখেত ঘুরে চুরি করে খেতে গিয়ে মার খায় । মা-ই কি কম মেরেছে! মারা যাবার সময় বিশ গ্রামের মানুষ ভিড় করে দেখতে এসেছে, তরমুজের মা এর-ওর যতজনের পারল হাত ধরে ধরে অনুনয় করল, আমার ছেলেটার খিদে আমি সইতে পারি না । মরে গিয়েও শান্তি পাব না । তোমরা ওকে মেরো, দোষ করলে মারবে বইকি, কিন্তু তার পর ওকে খেতে দিও । পেট ভরে খাইও । ও যেন ভরা পেটে মরে ।

সেই থেকে গ্রামে নিয়ম হয়ে গেছে, তরমুজকে কেউ মারলে সে ওকে তখনকার মতো খেতে দেবে । পেটপুরে খাওয়া । যতক্ষণ না ও নিজে থামবে, ততক্ষণ খাবারের যোগান দিয়ে যেতে হবে । গতবছর সুন্দরবনের এইসব গ্রামে প্রচুর তরমুজ ফলেছিল । বিরাম দাসের হাতের বাঘথাবড়া খেয়ে তরমুজ বিরাম দাসের খেতের চুরাশিটা তরমুজ শেষ করে । সেই থেকে তার তরমুজ নাম । আগে তার নাম ছিল বাঁকাচাঁদ । মা ডাকত বাঁকা । গত এক বছর কেউ আর তাকে ও-নামে ডাকে না ।

তরমুজকে চড় মেরেই দিলু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল । হাত বাড়াতে দেখে সে হঠাৎই চিৎকার করে উঠল, খবরদার, কাঁদবি না! গলা টিপে শেষ করে দেব!

তরমুজকে যত জোরেই মারো, সে কাঁদবে না । ফিক করে হেসে ডান হাত বাড়িয়ে দেবে । তখন কেউ যদি তাকে খেতে না দেয় বা ওই ধরনের কিছু বলে, সে আকাশ ফাটিয়ে কেঁদে ওঠে । বর্শাবেঁধা বুনো জন্তুর মতো কাঁদে । মুখে খাবার না যাওয়া পর্যন্ত সে ওইরকম কেঁদে যাবে ।

তরমুজের মুখে তখনও হাসি । মনে হয়, এই বুঝি হাসি মুছে ফেলে কেঁদে উঠবে । ডান হাত তেমনই বাড়ানো ।

নীলণ্ঠ তখনও চেষ্টা ছাড়েনি । সে ভেবেছিল দিলুকে জিলিপি খাইয়ে তাকে পাঠিয়ে অধিকারীকে ডেকে আনবে । তার আর আশা নেই । সে হালুইকরকে জিলিপির কড়াই নামিয়ে রেখে দোকানে এসে বসতে বলল । বার-বার করে বুঝিয়ে দিল, কাউকে একটা বিড়িও বেচবি না । আমি না আসা পর্যন্ত বেচাকেনা বন্ধ । খেয়াল রাখিস!

অধিকারী তার বাঁশি-বাজিয়েকে গেলাস-গেলাস বাতাসা-জল খাওয়াচ্ছে । কপালে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছে । যদি উঠে বসে । যদি এ যাত্রা বিপদটা কাটিয়ে দেয় । নীলকণ্ঠের মনে হল, ইহজীবনে এই লোক আর বাঁশি বাজাবে না ।

নীলকণ্ঠ একটু দূরে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বলল, তা, আপনার দলে আর কেউ বাঁশি বাজাতে পারে না?

অধিকারী চোখ তুলে নীলকণ্ঠকে একবার দেখল। তারপর তাকে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে বলল, হ্যাঁ, কী বলছিলেন?

নীলকণ্ঠ প্রশ্নটা আরেকবার শোনাল।

অধিকারী মস্ত এক টিপ নস্যি দু-নাকে সমান-সমান ভাগ করে দিয়ে নাক মুছে বলল, একজন আছে, সে তো মহিষাসুর! সে কখন বাঁশি বাজাবে?

নীলকণ্ঠের বুকের মধ্যে ঝমঝম শব্দ হল। মেদিনীপুরের কাঁথিতে সে যৌবনে মহিষাসুর-বধ করেছিল। সে নিজে হয়েছিল মহিষাসুর। মিনিটখানেক তার চোখের সামনে থেকে এই যাত্রার আয়োজন, এই দোকানদারি, এই সুন্দরবন একদম মুছে গেল। শুধু কাঁথির সেই আসরটা আট-দশটা হ্যাজাক হয়ে জ্বলছে। কানে তার নিজেরই গলা। যৌবনের গমগমে মহিষাসুর স্বরলহরী।

নীলকণ্ঠ ঘোর কাটিয়ে হাল্কা হাসল, তাহলে একজন মহিষাসুর পেলেও আপনার চলে যায়, কী বলেন? হয় বাঁশি, নয় মহিষাসুর!

— না, সে হয় না। একটু থেমেই আবার বলল, তা মহিষাসুরই বা পাচ্ছি কোথায়?

— শক্ত, আরও শক্ত। মহিষাসুর তো আর যে-সে হতে পারে না।

নীলকণ্ঠ ফিরে যাচ্ছিল, মাঝমাঠ থেকে আবার অধিকারীর কাছে গিয়ে বলল, বাঁশি বাজাবার ভালো লোক পাবেন, কুড়িটা টাকা খরচ করতে হবে।

— কুড়ি টাকা?

— তা তো লাগবেই। বাঁশি-বাজিয়ে তো আমাদের দেবার কথা না— কী বলেন?

— বাঁশি ছাড়াই আমি পালা নামাব! অধিকারী নস্যি নেয়। তারপর কী ভেবে একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে দিল, ঠিক আছে, একটু তাড়াতাড়ি করুন। একটা মহড়া দিতে হবে।

তরমুজের গলাচেরা কান্না শুরু হয়েছে। দিলুর ঊরু দুটো দু-হাত দিয়ে প্রাণপণে জাপটে ধরে সে চিৎকার করে কাঁদছে। নীলকণ্ঠ দোকানে এসে গোটা ছয়েক জিবেগজা নিয়ে তরমুজের মুখের হাঁয়ের মধ্যে গুঁজে দিতেই কান্না বন্ধ।

— চলো দিলু, লক্ষ্মণকে নিয়ে আসি।

সে নিজের ফতুয়ার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে নিজেরই দোকানের ক্যাশ বাক্সের মধ্যে রাখতে রাখতে তার হালুইকরকে বলল, তরমুজের জন্য দশ টাকা দিয়ে গেলাম। মুড়ি দিস বেশি করে। জিলিপির গরম রস দিস। জগজ্জনীর ছেলে। জলকষ্ট দিস না।

যাবার সময় তরমুজের পিঠে হাত বোলায়, একটু আস্তে আস্তে খাস আর নাদুর দিকে একটু নজর রাখিস— পয়সা-টয়সা না সরায়।

কথাটা নাদু, অর্থাৎ সেই হালুইকরের সামনেই বলল।

দিলুর হাঁটুর কাছে তরমুজের নখ বসে গিয়ে অনেকক্ষণ জ্বলছিল। সে অবাক হয়ে নীলকণ্ঠর কাণ্ড দেখছে। নীলকণ্ঠ সেটা লক্ষ করে বলল, বাঁশি বাজিয়ের খরচ, অধিকারী টাকাটা দিল। তাই দিয়ে আমি তোমায় দায়মুক্ত করলাম। না কী বলো?

তরমুজ জোয়ার-ভাঁটার হিসেব সত্যিই বোঝে। ভাঁটার টানে নৌকো চলেছে তরতর করে। দিলু-মোহন দাঁড়ে বসেছে। নীলকণ্ঠ ধরেছে হাল। তবে নৌকোয় ভার একটু কম চাপলে আরও জোরে যেত। তারা তিনজন ছাড়াও, এ গ্রামের আরও কয়েকজন নৌকোয় উঠে বসেছে। তারাও অন্য কাজে গোসাবায় যাবে। বা ওদিককারই কোনও গ্রামে। নৌকো যাচ্ছে দেখে উঠে পড়েছে।

সূর্য একটু আগেও নদীর জল, আকাশ সব লাল করে রেখেছিল। সেই আগুন মুছে গিয়ে আকাশে দ্রুত অঙ্গারের রং ধরছে। দু-দিন পর অমাবস্যা। আজকাল সন্ধের মুখেই জানান দিচ্ছে।

দিলু দাঁড় মারতে মারতে তাড়া লাগায়, চড়ায় ঠেকে যাবে নীলুদা! সাবধান!

নীলকণ্ঠর মুঠোয় হাল একটু ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে নড়ছে, তার অনেক রকম চিন্তা। দিলুর তাড়া খেয়ে জোরে জোরে মোচড় দিয়ে হাল ঘোরায়। অনেকক্ষণ থেকে তার বুকের মধ্যে যেন একটা খিঁচ লেগেছে। পেরেক ফুটছে। নীলকণ্ঠ মুঠোয় জোর পায় না।

উল্টোদিক থেকে একটা নৌকো আসছে। অন্ধকারে আলোর দুলুনি দেখে মোহন হাঁক পাড়ে, কে যায়? কার নৌকো?

ঢেউ, হাওয়া, অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে উত্তর ভেসে আসে, আমি লক্ষ্মণ! তোমরা কে?

দিলু পিছনে যতটা পারে ঘাড় ঘুরিয়ে চিৎকার করে বলল, নৌকো ভেড়াও। আমরা নীলকণ্ঠ, দিলু, মোহন। অন্ধকারে তার ঢেঁকুর শোনা গেল।

নীলকণ্ঠর মাথা বেয়ে ঘাম নামছে। কপাল মুখ ঘামে ভেজা। হাতে একদম জোর পাচ্ছে না। হাঁটুর জোর খুলে গেল নাকি? বুকে অসম্ভব কষ্ট!

লক্ষ্মণের গলা সে শুনেছে কিনা বোঝা গেল না। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, দিলু হাল ধর। বলেই সে হাল ছেড়ে দিল। লোকের ভিড়ে তাদের পায়ের কাছে ফাঁক-ফাঁক পাটাতনের ওপর কোনওরকমে শুয়ে পড়ল।

দিলু দাঁড় ছেড়ে ওঠার আগেই বদু হাল ধরল।

দিলু দাঁড়ে বসে বসেই বলল, কী হল তোমার, নীলুদা?

সাড়া না পেয়ে আবার হাঁক পাড়ল— লক্ষ্মণ, নৌকো ভেড়াও। আমরা আসছি, নৌকো ভেড়াও।

লক্ষ্মণ গাঢ় গলায় কথা ছুড়ে দেয়— নৌকোয় আমার বাবা আছে। সময় নেই, এখন ভেড়াতে পারব না।

মোহনও কথা ছুড়ে দেয়— তোকে বাঁশি বাজাতে হবে। কুসুমখালিতে। দাঁড়া, আমরা যাচ্ছি।

ওদিকের নৌকো থেকে এবার অন্য কেউ কথা বলল, লক্ষ্মণের বাবাকে নিয়ে আমরা ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।

একটু পরে দুদিকের দুটো নৌকো কাছাকাছি হয়। লক্ষ্মণদের নৌকোয় চারদিক ঘিরে দশ-বারোজন লোক বসে আছে। মাঝখানে লম্বালম্বি বিছানা। লক্ষ্মণের বাবা বুকে দু-হাত রেখে শুয়ে আছে। চোখ খোলা, মাথা ফিরিয়ে দিলুদের কথা শুনছে। নৌকোর একধারে হাঁড়ি-কড়া, নানা মাপের কৌটো। চালের টিন। কদিন থাকতে হয় কে জানে, একেবারে সংসার সাজিয়ে নিয়েছে।

যদু হাল ঘুরিয়ে নৌকো দুটোকে গায়ে গায়ে লাগিয়ে দিয়েছিল। দিলু সাবধানে, লক্ষ্মণদের নৌকো একদম না দুলিয়ে এদের নৌকোয় উঠে এসে লক্ষ্মণের বাবার কপালে হাত রাখল। তারপর লক্ষ্মণের দিকে চোখ তুলে বলল, কী রকম অবস্থা? তুমি আমাদের ওখানে একটু নামতে পারবে না?

লক্ষ্মণের মুখ-চোখ বসে গেছে। বাবার অসুখ নিয়ে আজ সারাদিনই তার ওপর খুব ধকল যাচ্ছে, বোঝা যায়। সে শুধু বলল, তুমি পাগলের মতো কথা বলছ! কাল রাত থেকে আমরা ঘুমোইনি। এক মিনিট এখন নষ্ট করতে পারব না।

লক্ষ্মণের মার মুখ ঘোমটায় ঢাকা। ডান হাতে ঘোমটা একটু সরিয়ে বলল, লক্ষ্মণের বাপের এই অবস্থা, এখন কি বাঁশি বাজাবার সময়?

দিলু কথা বদলে বলল, নীলুদারও কী হল। দিব্যি হাল ধরেছিল, হঠাৎ শুয়ে পড়েছে।

লক্ষ্মণের বাবা পাশের নৌকোর দিকে অনেকখানি ঘাড় ঘোরাবার চেষ্টা করল। তার চোখ পিট-পিট করছে।

মোহন ঝুঁকে ঝুঁকে নদীর জল নিয়ে নীলকণ্ঠর মুখে মাথায় ছিটিয়ে দিচ্ছিল। লক্ষ্মণকে শুনিয়ে বলল, একদম হুঁশ নেই। অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কুসুমখালিতে সবাই অপেক্ষা করে আছে। অধিকারী আবার বাঁশিবাজিয়ের টাকাও দিয়ে দিয়েছে। দিলু নিমেষে সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে মরিয়া হয়ে লক্ষ্মণকে বলল, তোমাকে কুসুমখালিতে নামিয়ে দিয়ে আমি এই নৌকোতেই থেকে যাচ্ছি। আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। বাসন্তীতে তো?

লক্ষ্মণ কিছু বলবার আগেই তার বাবা মৃদু কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলে উঠল, তুমি যাও লক্ষ্মণ! আমি ভালো হয়ে গেছি। কাল সকালে তুমি বাসন্তী চলে এসো।

আজই পাঠানখালি থেকে লক্ষ্মণের দিদিকে আনা হয়েছে। তারও কেমন মনে হল, বাবার বিপদ কেটে গেছে। নৌকোর একধারে সে কেরোসিনের স্টোভে আদা দিয়ে চা বানাচ্ছিল, এদিক ফিরে বলল, আমি সকালে দেখেই বুঝেছি লক্ষ্মণ মিছিমিছি অত ভয় পাচ্ছে। তুমি আসলে বাবা আমাকে দেখতে চেয়েছিলে। তুমি ঠিকই জানতে একেবারে মরবার মতো ব্যামো তোমার এটা নয়।

অদ্ভূত ব্যাপার, লক্ষ্মণের বাবার মুখে খুব ক্ষীণ, খুব লাজুক, খুব ছেলেমানুষী একটা হাসি ফুটল।

লক্ষ্মণ পাশের নৌকোয় গিয়ে নীলকণ্ঠকে পরীক্ষা করে বলল, ও নৌকোয় নিতে হবে। গা ঠান্ডা, অবস্থা ভালো নয়।

সবাই মিলে ধরাধরি করে নীলকণ্ঠকে লক্ষ্মণদের নৌকোয় তোলা হলে বিছানা দুপাশে যেটুকু গুটিয়ে রাখা হয়েছিল, মেলে দিয়ে সেইখানে তাকে শোওয়ানো হল। লক্ষ্মণের বাবা ডানদিকে একটু সরে গেল। দুজনেই সমান মাপের। নদীর বুকে নৌকোর ওপর একচিলতে বিছানা দুজনে সমানভাগে ভাগ করে নিল।

দিলুদের নৌকোয় যারা নিজেদের কাজে গোসাবা যাচ্ছিল তাদের ওইখানেই ডাঙা ধরিয়ে দিয়ে নৌকো কুসুমখালির দিকে ফিরল।

দুটো নৌকো কুসুমখালিতে নোঙর করতে কয়েকজন অল্প জলে লাফিয়ে নেমে পড়ল। দিলুদের নৌকোর সবাই নেমে গেল। নীলকণ্ঠ তো আগেই লক্ষ্মণদের নৌকোয় চলে এসেছে।

লক্ষ্মণের সঙ্গে গোসাবার আরও অনেকেই কুসুমখালিতে নেমেছে। রোগী একটু সুস্থ হতেই সকলের মন থেকে ভার নেমে গেছে। তারা এবার যাত্রা দেখবে।

লক্ষ্মণ কাদা ভেঙে বাঁধের দিকে এগোচ্ছে, তাদের নৌকো থেকে তার দিদি বলে উঠল, দাঁড়া রে লক্ষ্মণ, আমিও আজ পালাটা দেখব।

আগেই সে বাবাকে বুঝিয়েছে।

ছেলে চলে গেল, মেয়ে চলে গেল, লক্ষ্মণের বাপ তার নৌকোর বাকি আত্মীয়দের একজনকে কাছে ডেকে বলল, আমি ভালো হয়ে গেছি। একটু ধরাধরি করে আসরের একধারে আমাকে শুইয়ে দাও। কাল সকালে বাসন্তী গেলেই হবে।

লক্ষ্মণ দিলু মোহনদের আবার নৌকোয় ডাকা হল। সকলে মিলে অনেক বোঝানো সত্ত্বেও লক্ষ্মণের বাপের মত পাল্টাল না। লক্ষ্মণের মা ঘোমটার মধ্যে থেকেই বলে উঠল, ওই জেদ নিয়েই তুমি একদিন শেষ হবে!

তাকেও নেমে পড়তে হল। নৌকোয় রইল শুধু নীলকণ্ঠ আর মোহন আর লক্ষ্মণদের নৌকোরই দুজন। তারা নীলকণ্ঠকে নিয়ে বাসন্তী যাবে ডাক্তার দেখাতে।

সেই দুজন দাঁড় মারতেই নীলকণ্ঠর শরীর ঝাঁকুনি খেল। সে এখন অন্যের নৌকোয় শুয়ে দোল খাচ্ছে।

নীলকণ্ঠর নিজের নৌকো ডাঙায় তুলে দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। ক্রমে সেটা ছোট হয়ে আসছে। অন্ধকারে তার নৌকো কখন বদলে গেছে সে একদম টের পায়নি।

প্রথম প্রকাশ : যুগান্তর, ১৯৮০

# হলদি নদীর তীরে

হলদি নদী নিয়ে বেশ একটা আলোচনা জমে উঠেছিল, সমীর হঠাৎ বলে উঠল— ওসব চাকরির কথা এখন রাখ তো! আমি বলব, হলদি নদী মাঈ কী, তোরা বলবি— জয়!

সমীরের অল্পেই নেশা হয়ে যাবে । তার গলার স্বর বদলে গেছে । গেলাসসুদ্ধু হাতটা সামনের দিকে তুলে ধরে চেঁচিয়ে সুর করে বলল— হলদি নদী মাঈ কী—

কেউ 'জয়' বলবার সুযোগ পেল না । তার আগেই হলদি নদীর দমকা হাওয়ায় প্লেট-ভর্তি পাঁপড়ভাজা উড়ে গিয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল ।

এক মুহূর্ত সবাই স্তম্ভিত । তারপরই পাঁচজন একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল ।

এদের মধ্যে শুধু মনোরঞ্জন হলদিয়ায় চাকরি করে । তার নিজস্ব কোয়ার্টার ও মোটর সাইকেল আছে । অন্য চারজন মনোরঞ্জনের বন্ধু । আজ বিকেলেই কলকাতা থেকে এসেছে । আজ আর কাল সবাই মিলে হলদিয়ায় হইহই করে পরশু সকালের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যাবে ।

মনোরঞ্জন বন্ধুদের নিজের কোয়ার্টারে তোলেনি । তার কারণ, কয়েকদিন হল তার এক মামাশ্বশুর বহু বছর পরে হঠাৎ তাঁর ভাগ্নীর কুশল সংবাদ নিতে এসেছেন । তাছাড়া বউয়ের একেবারে চোখের সামনে এই ধরনের আসর বসাবার সাহসও তার নেই । বন্ধুদের সে হলদি নদীর ধারে তার কোম্পানির রেস্টহাউসে থাকার বন্দোবস্ত করেছে । বিকেলে বন্ধুদের নিয়ে একটা গ্রিক জাহাজ দেখতে গিয়েছিল, তারপর সন্ধে হতেই, পানীয় সহযোগে আড্ডা ।

হাসতে হাসতে সোমেশের চোখে জল এসে গিয়েছিল । ওই অবস্থায় সে কোনওরকমে বলল, ভাবা যায়! ভাবা যায়!

নিখিল হাওয়া বাঁচিয়ে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছিল, বলল, এই না হলে নদীর হাওয়া!

শুভই শুধু হাসছে কম, খাচ্ছে বেশি । গ্লাসে ছোট ছোট দু-তিনটে চুমুক দিয়ে সে গুনগুন করে উঠল— হাওয়ায় প্লেটের পাঁপড় উড়াইয়া নিল রে—

রঙ্গ-তামাসা যত বাড়ে, রাতও ততই বাড়তে থাকে ।

সমীর উঠে বাথরুমে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, চুপ! চুপ! সবাই চুপ! নদীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস?

আওয়াজটা নদীর, না হাওয়ার, না জল-হাওয়ার মেশামেশি শব্দ, বোঝা যায় না। সকলেই কান পেতে বোঝবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ ঘরের মধ্যে উৎকট শব্দ করে অ্যালার্ম ক্লক বেজে উঠল।

মনোরঞ্জন বেয়ারাকে খাবারের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে নীচে গিয়েছিল, ঘড়িটা তখনও বেজে চলেছে লাফ মেরে ঘরে ঢুকেই সে এদিক ওদিক খুঁজে একটা দেওয়াল-আলমারির পাল্লা খুলে এক হ্যাঁচকায় ঘড়িটা বের করে অ্যালার্ম বন্ধ করে দিল।

মলয় আর নিখিল একসঙ্গে বলে উঠল, কার ঘড়ি?

দৌড়ে এসে মনোরঞ্জনের হাঁফ ধরে গেছে। মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ও-পাশের স্যুইটে আজ আমার বসের একজন ভি আই পি গেস্ট আসার কথা। এই আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে! আমার একদম মনে ছিল না।

এসেছে কিনা আগে তাই দ্যাখ!

বলে শুভ খালি গেলাসে হুইস্কি ঢেলে দিতে লাগল।

এই সময় বেয়ারা মুরগির পকোড়া নিয়ে আসতেই মনোরঞ্জন তার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল— যিশু! পাশের স্যুইটে গেস্ট এসেছে কিনা জানিস?

ঘোষ সাহেবের গেস্ট তো? সে তো সামনের শনিবার।

ঠিক জানিস?

যিশু একটা সাদা ন্যাপকিনে পকোড়া ঢেকে এনেছিল, ন্যাপকিনটা পাট করে কাঁধে রাখতে রাখতে বলল, আমার কথা যদি স্যার বিশ্বাস না করেন—

না না, তোমায় বিশ্বাস করি, তোমায় বখশিশও করব—

যিশু এবার হেসে ফেলল— পুরো বাড়িটায় আপনারাই স্যার আছেন। আর ওই ঘড়িটা।

মনোরঞ্জন চাগিয়ে ওঠা বিরক্তি চাপবার চেষ্টা করে বলল, কার এটা?

আমার স্যার। নীচে চুরি যাবার ভয়। তাই সারাদিন ওপরে রাখি।

সাহেবরা এলে নীচে নিয়ে যাই । আজ একদম ভুলে গেছি । কিন্তু পাগলাঘণ্টি বাজল কী করে তাই ভাবছি ।

মনোরঞ্জনের বন্ধুরা হো হো করে হেসে ওঠে ।

যিশু পাঁপড় কুড়িয়ে নিয়ে হাত বাড়ায়— দিন স্যার— ঘড়িটা—

মনোরঞ্জন এতক্ষণে নিচু হয়ে নিজের গেলাস তুলে নেয়— যা ভাগ! দৌড়ে ঠান্ডা জল নিয়ে আয়— জগ ভরে আনবি ।

সমীর চেঁচিয়ে ওঠে— হলদি নদী মাঈ কী পানি লাও!

রাত যত বাড়ে, হাসি-তামাসাও তত বাড়তে থাকে ।

একসময় রাত শেষ হয়ে আসছে দেখে মনোরঞ্জন কোয়ার্টারে ফিরতে চাইলে চার বন্ধু ওকে ধরে বসিয়ে দিল ।

মনোরঞ্জন বলল, ঠিক আছে, ছাড়, নদীর দিকের জানলাটা বন্ধ করে দিই । তোদের শীত করছে না?

সোমেশ জড়ানো গলায় বলল, শীত? তোর শীত করছে! বল তো কেন শীত করে? ভয়ে । তোর বসের ভয়ে তোর শীত করছে ।

মনোরঞ্জন বন্ধুদের তুলনায় সামান্যই মদ খেয়েছে । এক তো মামাশ্বশুর, তার ওপর ইরা! এতটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে সে ভাবেনি ।

মনোরঞ্জন জানলা বন্ধ করতে গিয়ে সেই যে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, আর ফেরে না ।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সেটা খেয়াল হতে নিখিল টলমলে পায়ে জানলার সামনে গিয়ে ঠিক একটা জন্তুর মতো চিৎকার করে উঠল । হলদি নদীর জলে, বহু দূরে, কে একটা নিখুঁত আগুনের গোলা বসিয়ে দিয়েছে ।

পাঁচজনই জানলায় । কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা নেই । ওই নাকি সূর্যোদয়!

শুভ হঠাৎ সোমেশের কাঁধে বিরাট একটা চাপড় মেরে বলল, ধুস! ওরকম সানরাইজ হচ্ছে আর আমরা কি না ঘরে বসে মদ খাচ্ছি! চল শালা নদীতে!

বলে সে একটা বোতল থেকে সরাসরি গলায় হুইস্কি ঢেলে দিল । তারপর যে যার গেলাস ভরে নিয়ে টলতে টলতে নদীর ধারে প্রায় জলের কাছে গিয়ে বসে পড়ল । কেবল

মনোরঞ্জনের হাতে গেলাস ছিল না। সে গেস্টহাউস থেকে আসবার সময় মোটর সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে নদীর ধারে এনে রাস্তার ওপর এক পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে ঢালু নদীতীরে গা এলিয়ে দিল।

অনেক দূরে নদীর এপারে একটা লোক জাল ছুড়ে মাছ ধরছে। লোকটাকে দেখাচ্ছে ঠিক ছবির মতো। দূর থেকে শুভ বলল, চল, লোকটার সঙ্গে একটু মজা করা যাক।

বলেই সে আর সোমেশ মুখের কাছে দু-হাতের চোঙা বানিয়ে হাঁক পাড়ল— ও দাদা! কী মাছ ধরলে? চাঁদা নাকি?

লোকটা চমকে উঠে ওদের দিকে তাকাল। তারপর একটানে জালটা তুলে নিয়ে দৌড়ে পালাল। যেখানে গিয়ে থামল সেখানে তাকে ফুটখানেকের একটা পুতুল ছাড়া কিছু মনে হয় না।

লোকটা মনে হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দম নিল। তারপর নতুন করে জাল গুটিয়ে জলের ওপারে গোল করে ছুড়ে দিল।

জাল ছুড়তে দেখেই এবার ওরা চারজন একসঙ্গে দু-হাতের চোঙায় মুখ রেখে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল— ও দাদা, কী মাছ উঠল? চাঁদা নাকি?

এবারও লোকটা এদের দিকে তাকিয়েই জাল তুলে দৌড় দিল। লোকটাকে দৌড়তে দেখে শুভরা চারজন হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল।

দৌড়তে দৌড়তে, অনেক দূরে নদী যেখানে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে, লোকটা সেখানে হারিয়ে গেল।

সমীর হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ব্যাটা যাবে কোথায়? আমি মনোর মোটর সাইকেল নিয়ে যাচ্ছি— তোরা পিছনে আয়।

হলদি নদীর তীরে তখন এক অপরূপ ভোর হচ্ছে। ঠিক তখনই বিকট আওয়াজ করে সমীরের মোটর সাইকেল ছুটল নদীর তীর বরাবর।

সোমেশ, নিখিল, শুভ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে লক্ষ করল মনোরঞ্জন ঘুমিয়ে পড়েছে। শুভ নদী থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে মনোরঞ্জনের মুখের ওপর ছুড়ে মারতেই সে ধড়ফড় করে উঠে বসল।

তারপর চোখ রগড়ে ওদের তিনজনের দিকে দুয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল, সমীরকে দেখছি না! শুতে গেছে?

শুভ বলল, সে ভারি মজার ব্যাপার— চল, দেখে আসি!

হলদি নদী যেখানে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে সেখানে পৌঁছে ওদের চোখে পড়ল মোটর সাইকেলটা রাস্তার ধারে দাঁড় করানো আছে। নীচে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে সেই লোকটা। ওদের দিকে পিছন ফিরে প্রাণপণে জাল টেনে তোলার চেষ্টা করছে। রোগা কালো শরীরটা বাঁকিয়ে যেভাবে সমস্ত শক্তি দিয়ে লোকটা জাল তুলছে, তাতে মনে হয় মস্ত বড় মাছ পড়েছে।

সমীর হয়ত কাছে-পিঠেই কোথাও গেছে— সোমেশ, শুভ, নিখিল মুখের সামনে দু-হাতের চোঙা বানিয়ে আচমকা লোকটার কান ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল— ও দাদা! কী মাছ উঠল? চাঁদা নাকি?

লোকটা ওদের দিকে মুখ ফেরাতেই ওরা আবার একই কোরাস গাইল। এবার আরও জোরে।

লোকটা কিন্তু এবার আর জাল তুলে দৌড় দিল না। দাঁতে দাঁত চেপে জালটা টেনে তুলছে আর তারই মধ্যে একবার করে ঘাড় ঘুরিয়ে শুভদের দিকে তাকাচ্ছে। তার দুচোখে আগুন ধক ধক করছে।

শুভরাও উত্তরোত্তর মজা পেয়ে আরও জোরে গলা মিলিয়ে গাইল— ও দাদা! কী মাছ উঠল? চাঁদা নাকি?

লোকটা এবার ঘাড় ঘুরিয়ে বলল— হাঙর ধরেছি বাবুরা!

জালটা আরেকটু উঠে আসতেই আষ্টেপৃষ্ঠে জালে জড়ানো সমীরকে স্পষ্ট চেনা গেল!

শুভদের নেশা কেটে গেছে। চারজনই লাফ মেরে রাস্তা থেকে নেমে এল। লোকটা শান্ত গলায় বলল, আমার দোষ নেই। বাবু আমাকে খামোখা তাড়া করতে গিয়ে পা পিছলে জলে পড়েছেন। জাল ছুড়তেই জড়িয়ে ধরলেন কিনা, না হলে এ-জালে দু-কেজি মাছও ওঠে না।

প্রথম প্রকাশ : আজকাল শারদীয় সংখ্যা, ১৯৮৫

# ছোঁ

## ভাগাড়ের দু-দিক

ভাত খেয়ে উঠে শীত শীত লাগে। উমা রোদে পিঠ দিয়ে হাঁটুর ওপর বাঁ-গাল রাখতেই ভাগাড়ের ওপারের ঝকঝকে রেলিংওলা বাড়িগুলো চোখের কাছাকাছি চলে আসে। ঠিক মনে হয় মস্ত বড় একটা ফটো। অনেকটা সিনেমার মতো। কাত হয়ে দেখার ফলেই হয়ত, ফটোটা একদিকে একটু হেলে আছে।

উমার কিছু করবার নেই। বসে-বসে রোদ পোহায় আর মাঝে মাঝে দু-হাঁটুর ওপর গাল বদলায়। একবার এ-গাল একবার ও-গাল। এবার ডান গাল রাখতেই বাঁদিকের ডোবা, মাঠ, শ্যাওলা-পড়া শিবমন্দির, এলোমেলো কুঁড়েঘর, টিন-টালির চালা চোখে পড়ে। গলায় দড়ি গাছটার ঠিক পিছনেই একশো বছরের পুরনো একটা পাকা দালান। মাটি থেকে বুকসমান উঁচু ভিত, তার ওপরে ইটের গাঁথনি, মাথায় রীতিমতো কড়ি-বরগার ছাদ। ওই মন্দির আর ওই দালান আর কবেকার কোন সিঙ্গিদের লম্বা পোড়ো-বাড়িটাই ভাগাড়ের এদিকে একমাত্র পাকাবাড়ি। আর সব হয় মাটির, নয়তো মুলি বাঁশের ছ্যাঁচা বেড়ার। মাথায় খড়ের কালচে ছাউনি, নয়তো টিন বা টালি।

গাল পাল্টাতেই ফের সেই ঝকঝকে ঘরদালান। কোথাও কোথাও রুপোলি রেলিং, রোদ ঠিকরোচ্ছে। কী থেকে কী হয়! জলা জায়গাটা দেখতে দেখতে কী হয়ে গেল! দশ বছর আগেও ওখানে সারাদিন কাঠের পাটায় কাপড় আছড়ানোর ছটছটাং শব্দ উঠত। এখনও চোখ বুজলে উমা কাপড়ের পাক খেয়ে লকলকিয়ে আকাশে উঠে যাওয়া দেখতে পায়। এখন আর ধোপাডাঙা নামটাও কেউ বলে না। ছোটরা জানেই না।

গাল পাল্টাতে গিয়ে বেকায়দায় পিঠে খিঁচ ব্যথাটা চাগিয়ে উঠল। ঘন-ঘন হাঁটুর ওপর এ-গাল ও-গাল করা উমার প্রায় মুদ্রাদোষ। নতুন হয়েছে। এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিষ্কর্মার মতো বসে থাকার অভ্যেসটাও তার নতুন। আগের শীতে শুরু হয়েছিল; ঠিক শীতে নয়, বসন্তে। ঠিক-ঠিক হিসেব ধরলে, শীত-বসন্তের মাঝামাঝি সময়টায়। তা-ই। তখন শিমুলফুল প্রায় ঝরে গেছে। আমগাছে বউল এসেছে। পায়ের কাছেই এই সজনেগাছটায় সবে কচি কচি খাড়া বেরচ্ছে।

এবার প্রথমে গলায় দড়ি গাছ। গাছটার ঝোপড়া মাথায় উমা চোখ বোলাল। আসলে চালতাগাছ। চির অফলা। একটা চালতাও কেউ কোনওদিন ফলতে দেখেনি। কে ওর ডালে কবে গলায় দড়ি দিয়েছিল কেউ জানে না, নামটা সবাই মেনে নিয়েছে। এ-নাম আর মুছবে না।

হাঁটুর হাড়ে চোয়াল টাটাচ্ছে। উমা দু-হাত ভাঁজ করে জোড়া হাঁটুর ওপর বাহু রেখে সেই ফোঁকরে বাঁ-গালটা গুঁজে দিতেই তার মন দারুণ খুঁত খুঁত করে উঠল। গাল গরম! তার মানে বেলা পড়ে আসছে। প্রথম প্রথম সে বেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখলেই জ্বরের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত। রোদ গেলেই তার ঠিক জ্বর আসবে। এখন উল্টো। জ্বরটা তার একরকম সয়ে গেছে। এখন জ্বর এলেই সে অন্যরকম ভয় পায়। জ্বর আসছে মানে বেলা পড়ে আসছে। তার মানে একটু পরেই অন্ধকার। আজকাল তার নতুন ভয় অন্ধকারের।

পিঠ-কোমর ধরে গেছে। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে উমার পিঠের ব্যথাটা শিরদাঁড়ার ভেতরের দিকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দপ-দপ করতে লাগল। সেই সঙ্গে গলা খুস-খুস করে কাশি। এক-আধ ঘণ্টার আগে থামবে না। কাশতে কাশতে গলাটা ভিজে-ভিজে লাগতে উমা চোখ বুজে ভাগাড়ের দিকে যতটা পারে দূরে থুঃ করল। রক্ত ফেলবার সময় উমা চোখ বুজে ফেলে।

মানকচুগাছের ছায়া মুছে গেছে। উমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাশে। ঘরের দিকে ফিরতে পারছে না, যদি আরও রক্ত ওঠে! এখানেই রক্ত ফেলবার সুবিধা।

একটু আগেই ধোঁয়ায়-হিমে জড়িয়ে বাঁদিকের খানিকটা জায়গা সাদা মতো দেখাচ্ছিল, এর মধ্যেই ঝাপসা। ঝুপ-ঝুপ করে অন্ধকার নামছে। ভাগাড়ের ওপারে বড় বড় কাচের জানলায়, বারান্দায় আলো ফুটছে। কাছে দূরে পাঁচ-ছটা বাড়ি থেকে পাঁচমিশেলি ইংরিজি বাজনা ভেসে আসছে। এবার শ্যামা ফিরবে।

উমার পিছনে মনসার বেড়াটা নড়ে উঠল। একটা শেয়াল বেড়া ফাঁক করে গলা অব্দি মুখ বাড়িয়ে থমকে গিয়ে উমার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

## শীত-বসন্ত

বসন্ত শামুক পুড়িয়ে চুন করছে, উঠোনের আরেক মাথায় কাঁচা উনুনে শীত বছরের প্রথম রস জ্বাল দিচ্ছে। সাত গাছের রস। কাঠের আঁচে, আস্তে আস্তে রং গাঢ় হচ্ছে। জ্বলন্ত একটা কাঠ উনুন থেকে বের করে একটা বিড়ি ধরিয়ে শীত কাঠটাকে আর উনুনে

ঢোকাল না। উঠোনে আছড়ে-আছড়ে নিভিয়ে দিল। একটু পরে আরেকটা কাঠ বের করে ফেলল। তারপর সরু দেখে তিনটে শুকনো ডাল উনুনের তিন দিক দিয়ে গুঁজে দিল। উনুনে কাঠ গোঁজা, ঠিক সময় বুঝে কাঠ ঠেলে দেওয়া, জ্বলন্ত কাঠ বের করে নিয়ে ধিকিধিকি আঁচ তৈরি করা— গুড় জ্বাল দেবার এরকম শতেক রীতি আছে শীতের। একদম তার নিজস্ব। ভাগাড়ের ওপারের মা-দিদিমণি-বৌদিদের কাছে শীতের হাতের নলেন কি দানাগুড়ের খুব চাহিদা। পাশাপাশি ক-বাড়ি ঘুরেই তার কলসি খালি হয়ে যায়। গুড়ের সুখ্যাতি করে ঠিকই, তবে কোমর বেঁধে দর-দাম করতেও ছাড়ে না। কী গলা কাটা দাম রে বাবা— মুখে লেগেই আছে। শীত কাটবে তোমাদের গলা! আসলে পাঁচটা পয়সা কম দিতে পারলেও ওদের সুখ। কঞ্জুসের দেবী একেকটা! ধিকিধিকি একটা কাঠ উনুনে গুঁজে দিতে-দিতেই শীত মুখ ফিরিয়ে প্রায় লুকিয়ে থুতু ফেলল। গরম গুড়ের গন্ধ ছাপিয়ে শামুকপোড়ার দুর্গন্ধ নাকে লাগছে। বসন্তের কাছে আজ কটা টাকা ধার চাইবে, তাই লুকিয়ে থুতু ফেলতে হল। নাহলে শামুকপোড়া গন্ধ নিয়ে দু-ভাইয়ে প্রায় রোজই ঝগড়া লাগে।

উঠোনের ধারে পাশাপাশি দুটো ঘরে দুজনের আলাদা সংসার। শীত ছোট, বসন্ত বড়। বড় মানে, মিনিট কয়েকের। যমজ ভাই।

কাঠ ঠেলতেই আগুনের ফুলকি উঠে কালো ছাই হয়ে আকাশে ওড়ে। শীত হাতের তেলোয় মুখ আড়াল করে বসন্তর দিকে ফিরে গলা খাঁকরায়— বেচা-কেনা কেমন?

বসন্ত বিড়ি ধরাচ্ছিল, ধোঁয়া টেনে বলল, গুড় তো নয়।

শীত কথা পেয়ে গেছে। টাকা মনে হয় মিলবে। গলায় উৎসাহ নিয়ে বলল, ভাগাড়পারের নন্দীবাবু বলছিল মেলা চুন কিনছে। দেশে বন্যা লেগেছিল না? গাঁয়ের পুকুর কুয়ো এখনও শোধন করা হচ্ছে। জলে বস্তা-বস্তা চুন ঢালছে।

বসন্ত আগুন ছেড়ে উঠে এল। বিড়িতে জোরে জোরে তিনটে টান দিয়ে বিড়িটা শীতের হাতে দিয়ে বলল, দর কী দিচ্ছে?

ভালোই দেবে। তবে, কথা ওই, নন্দীবাবুকে একটু টাকা খাওয়াতে হবে।

— কত?

— তা দু-চার কুড়ি খেয়ে যদি দু-চার শো ওগরায়, তোর লোকসান কিসের?

— নগদ?

শীত ঠিক বুঝে নেয় । তার মানে নগদ দাম পাবে কিনা জানতে চাইছে । উত্তেজনার সময় বসন্ত বেশি কথা বলে না, দুটো-একটা শব্দেই কাজ সারে ।

শীত আগুনের আঁচে আড়চোখে বসন্তের আঙুলের খাঁজে দগদগে হাজা দেখতে-দেখতে বলল, ধরে পড়লে কি আর দেবে না! কলকাতার ব্যাপারীরা তো সারা বছর ঘোরায় । জলে জলে হাতের চ্যায়রা কী করেছিস?

টাকার কথাটা কীভাবে তোলা যায়, শীত সুযোগ খোঁজে । হাত একদম ফাঁকা । এদিকে সন্ধে বয়ে যাচ্ছে । সন্ধেবেলাটা একটু নেশা না হলে শীতের চলে না । দু-পা গেলেই হোড়ের দোকান । বসন্তকে ভালো মতো বাগে আনতে হঠাৎ সে আস্ত একটা বিড়ি এগিয়ে দিল ।

## নয়া রাস্তা

গলায় দড়ি গাছটার বিশ-তিরিশ হাত দক্ষিণে নতুন রাস্তার কাজ চলছে । পিচ-বাঁধানো বিরাট চওড়া রাস্তা হবে । তেরো মাইল লম্বা । আগের স্টেশন থেকে শুরু হয়েছে । শেষ হবে পূর্ব কলকাতার বড় রাস্তায় । সামনের বছর থেকে সরাসরি কলকাতা অব্দি বাস চলবে । সরকারি বাস । এখন সারাদিনে দুটো মাত্র মিনি চলে, সেটাই অন্তত পাঁচগুণ বাড়াবে । আসল সুবিধে ভাগাড়পারের বাবুদের । কাঁচা রাস্তায় তাঁদের মোটরগাড়ির টায়ার খারাপ হয়ে যাচ্ছে ।

রাস্তার ধারে মাঠে সারি সারি তাঁবু পড়েছে, ওইসব জায়গায় এবছর ধান হয়নি । খেতের ওপর এখানে-ওখানে চায়ের দোকান উঠেছে ।

সবচেয়ে বড় দোকান ভাগাড়পারের খোকন হোড়ের । তিনতলা বাড়ির ছেলে । বাপ বড় কোম্পানিতে মস্ত চাকরি করে । ঝকঝকে গাড়ি চড়ে অফিস যায় । বাড়ির দেওয়ালে ঘর ঠান্ডা-গরম করা যন্ত্র । সেই বাড়ির ছেলে সুযোগ বুঝে মাঠের মধ্যে দিব্যি দোকান খুলে বসেছে । রাস্তা তৈরির কন্ট্র্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ারবাবুরা জানেন, চা-সিগ্রেট ছাড়াও আরেকটা জিনিস হোড়ের দোকানে দেদার পাওয়া যায় । অবশ্য লেনদেন হয় একটু গোপনে । আশপাশে পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে আর দোকান নেই, ফলে হোড়ের এখন পোয়াবারো । দু-হাতে টাকা কামাচ্ছে ।

ইঞ্জিনিয়ার অতীশ রায় চামড়ার ফুলহাতা জ্যাকেট সত্ত্বেও একটা শাল মুড়ি দিয়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল । দু-প্যাকেট সিগারেট কিনে একটা প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে হোড়ের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে । একটু পরে দুজনেই

দোকানের পিছনে চলে যায় । অতীশ টাকা বের করে দিয়ে কাগজে মোড়া বোতলটা হোড়ের হাত থেকে নিয়ে শাল চাপা দিয়ে তাঁবুতে ফেরে ।

শ্যামা তাঁবুর পিছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে । এতটা পথ দৌড়ে এসেছে । সময় নষ্ট না করে ফিরে যাবে কিনা ভাবছিল, অতীশকে দেখে হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, আমার দিদির খুব অসুখ । শিগগির ডাক্তার ডাকতে হবে । দশ-কুড়িটা টাকা দিন ।

— তুমি আজ আসবে না মন্দিরে?

— দিদি মুচ্ছো গেছে । ভাগাড়ের কাছে পড়েছিল ।

সন্ধেটা না মাটি হয়! অতীশ বিরক্তি চেপে দুটো দশ টাকার নোট ঝট করে শ্যামার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, ও কিছু না । অনেকেরই ও রকম একটু-আধটু মূর্ছা-টুর্ছা হয় । ঠিক সাতটায় চলে যেও ।

— বলছি না দিদি মরতে বসেছে ।

অতটা ঝেঁঝে ওঠা ঠিক হয়নি, শ্যামা গলা পালটে বলল, দিদি সুস্থ হলে দেখা করব ।

— টাকাটা বরং রেখে যাও, আমি যাবার সময় নিয়ে যাব ।

মানুষ না পশু । শ্যামার মতো মেয়েরও মাথায় আগুন ধরে যায় । তখনও হাঁপাচ্ছে, নোট দুটো অতীশের পায়ের কাছে ছুড়ে দিয়ে সে উলটো মুখে ছুটল ।

ভাগাড়পারের নবনীতাবৌদি উল বুনতে বুনতে টি ভি দেখছিলেন । বেল শুনে চাকরটা দরজা খুলে দিতেই তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে অসময়ে শ্যামাকে দেখে ভুরু কোঁচকালেন ।

শ্যামা অসম্ভব হাঁপাচ্ছে । তার মধ্যেই গলা তুলে বলল, দিদি মরে যাচ্ছে, গোটা কুড়ি টাকা দিতে পারেন? আপনার পায়ে পড়ি বৌদি!

— তুই তো সামনের মাসের পুরো মাইনে নিয়ে নিয়েছিস । কী করে দেব?

## নেভানো আগুন

বসন্ত কোমরের গেঁজে থেকে বের করে তার থেকে চারটে টাকা নিয়ে বার বার গুনছে । শীত তার সামনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উসখুস করে । উঠোনের দুটি আগুনই নিভে গিয়ে দুজনের পায়েই মশা কামড়াচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই ।

শ্যামা ছুটতে ছুটতে এসে উঠোনে দাঁড়াল । দাঁড়াবার শক্তি নেই, কোনওরকমে টাল সামলায় । এই শীতেও ঘামে তার কপালে-গালে চুল লেপটে আছে । গাল বেয়ে ঘাম নামছে ।

শীত-বসন্ত দুজনেই একসঙ্গে চমকে তার দিকে তাকাল ।

এত হাঁপাচ্ছে, শ্যামার মুখে কথা ফুটতে চায় না । দম নিয়ে নিয়ে বসন্তকে বলল, জামাইবাবু! শিগগির চলুন । দিদি মরতে বসেছে । ভাগাড়ের কাছে পড়েছিল । আমি ঘরে তুলে দে এইচি । এক্ষুনি ডাক্তার চাই ।

বসন্ত একটু ঝুঁকে চটাস করে পায়ের গোছায় একটা মশা মেরে বলল, তা ভাগাড়েই ফেলে দিতিস ।

শীত এক ঝটকায় বসন্তর হাত থেকে টাকাগুলো ছোঁ মেরে নিয়ে তিন লাফে উঠোন পেরিয়ে যেতে যেতে শ্যামাকে বলল, কই, কোনদিকে? শিগগির দৌড়ে আয়!

প্রথম প্রকাশ : যুগান্তর, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮

# বুকজলে

মাঝ রাতে ঘরে খলবল করে জল ঢোকার শব্দে সুধীন ঘুমের মধ্যেই ঝাঁকুনি খেয়ে উঠে বসল । ভয়ে তার চোখ বড় হয়ে গেছে । অন্ধকার ফুঁড়ে ঘরের মেঝে তন্ন-তন্ন করে দেখল । কোথায় জল? এতক্ষণ সে দম বন্ধ করে ছিল, এই প্রথম নিশ্বাস নিল ।

আচমকা ঘুম ভাঙলেই চ্চাং করে সুধীনের মাথা ধরে যায় । এখন তার সিগারেট না খেয়ে উপায় নেই । মশারি তুলতে গিয়ে অন্ধকারে প্রীতির বেণীর ওপর হাত পড়তেই সে দারুণ চমকে উঠল, সাপ! পরের মুহূর্তে ভুল বুঝতে পেরে ভয়ের বদলে তার রাগ চড়ে যায় । রোজ রোজ বেণী বেঁধে শোওয়া— ভালগার, বীভৎস অভ্যেস!

টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে, হঠাৎ কবরের দিকের বন্ধ জানলাটা খুট-খুট করে দুবার নড়ে উঠল । হাওয়ার জোর আবার বাড়ছে । সিগারেট না-ধরিয়ে সে প্রায় তিন মিনিট কান খাড়া করে রাখল । ফ্যানের শব্দে বোঝা যায় না, উঠে গিয়ে পাখা বন্ধ করে জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভালো করে শুনল, না বৃষ্টি আর হচ্ছে না । তিনদিন ধরে টানা বৃষ্টি আজই প্রথম থামতে দেখে সুধীন শুতে গিয়েছিল, এর মধ্যেই আবার শুরু হলে আর কথা ছিল না! কলকাতা প্লাবনের কিনারে । ঢেউয়ের সঙ্গে লড়ছে । গোটা পশ্চিমবাংলাই প্রায় জলের তলায় । বৃষ্টিতে সকলের মতোই সুধীন একদম মুষড়ে পড়েছে । সবচেয়ে ভয় তার নিজের বাড়ি নিয়ে । সবে দেওয়াল উঠছিল, এই বৃষ্টিতে গাঁথনি কি আর না-ধুয়ে গেছে! বালিগঞ্জ প্লেসে ওই একচিলতে জমির জন্য সে কী না করেছে! অফিসে সততা বলতে তার আর কিছুই রইল না । মনে পড়ে এই নিঃশব্দ রাতেও তার মাথার পিছন দিকে নতুন আরেকটা ব্যথা দপ-দপ করতে লাগল । বলতে গেলে, পুরোপুরি চরিত্র খুইয়ে সে নিজের বাড়ি তুলছে । যারা তাকে সাহস করে কোনওদিন ঘুষ দিতে পারেনি, বাড়ির জন্য তাদের কাছেও সুধীন নিজেই হাত পেতেছে । তার যৌবন প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, চিরকাল একটা কবরখানার পাশে ভাড়া বাড়িতে জীবন কাটবে নাকি! অধঃপতনের আরও জোরালো যুক্তি সে তৈরি করে নিয়েছিল, মাইনের টাকায় একটু ভালো এলাকায় বাড়ি বদলের কথা আজকাল ভাবাও যায় না । রাতে বৃষ্টি না থামলে সুধীন আজ ঘুমোতে পারত কিনা সন্দেহ ।

রাস্তার দিকের জানলা খুলে সুধীন জল দেখল । জলের ওপর ভাঙা-ভাঙা আলো । এলোমেলো দুলছে । নিজের পাড়া একদম অচেনা লাগে । দেওয়ালের গায়ে পুরনো ভোট

দিন লেখাটার মাথার দিকটা একটুখানি জেগেছে। তার মানে, এখনও অন্তত কোমরজল। সকালে আরেকটু কমবে নিশ্চয়ই। রোদের আশা আছে কিনা এখনই বোঝবার উপায় নেই। এই ধরনের অনিশ্চয়তায় বিরক্ত হয়ে ওঠা সুধীনের স্বভাব। সিগারেটের টুকরো রাস্তার জলে ছুড়ে দিয়ে ফ্যান চালিয়ে দিল। তারপর বাথরুমে। ঘাড়ে-মাথায় জল দেওয়া দরকার। পাম্প জলের তলায়, দুদিন ট্যাঙ্কে জল উঠছে না, পলিথিনের বালতিতে অল্প একটু জল ধরা আছে। হাত ভিজিয়ে মুখে-ঘাড়ে বুলিয়ে নিয়ে বাথরুমের আয়নায় অভ্যেসবশত মুখ দেখতে দেখতে সুধীন নিজের মনে ভাবল, আশ্চর্য, দুঃস্বপ্ন ঠেকাবার কোনও উপায় মানুষের হাতে নেই!

ঘরে এসে আলো নেভাবার আগে সে বিছানার কাছে ঝুঁকে প্রীতির বেণীটা তার বুকের ওপর তুলে দিল। 'আঃ সঞ্জয়!' বলে প্রীতি বিড়বিড় করে ছেলেকে একবার ধমক দিল। ঘুমের মধ্যেও তার ভুরু অবিকল কুঁচকে গেল।

বিছানায় শুয়ে, অন্ধকারে সুধীনকে ছেলের ভাবনা পেয়ে বসে। নরেন্দ্রপুরের জল নেমে যাচ্ছে, রেডিও শুনেছে, পরশুর কাগজেও পড়েছে। তাছাড়া স্কুল হোস্টেল উঁচু জমিতে। সঞ্জয়ের ঘর দোতলায়। টেলিফোন অচল না হলে সরাসরি কথাও বলা যেত। সব যুক্তি সাজিয়েও সুধীনের বুকটা খালি-খালি লাগে। ঠিক আছে, সে আজকাল ঘুষ-টুস নিচ্ছে, কিন্তু ছেলের ভবিষ্যতের ভাবনা তার হয়ে আর কে ভেবে দিচ্ছে? এই পৃথিবীতে ছেলেকে এক টুকরো জমি, একটা নিজস্ব মাথা গোঁজার জায়গা দিয়ে যাওয়া বাবার কর্তব্য নয়? ধর্ম নয়? বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে সুধীন কিন্তু চিরকাল থাকবে না, ও-বাড়ি ভোগ করবে সঞ্জয়। ছেলেকে সুধীনের স্নেহোপহার।

বালিশে কান চেপে শুয়েছিল, বৃষ্টির শব্দে এক ঝটকায় মাথা সোজা করল— না, ফ্যানের শব্দ! বার কয়েক বালিশে কান চেপে তারপর মাথা সোজা করে সুধীন স্পষ্ট বুঝতে পারল, কান চেপে শুলেই বৃষ্টির শব্দের মতো আওয়াজ হয়। ঠিক মনে হয়, শোঁ-শোঁ হাওয়া, সঙ্গে ঝমঝম বৃষ্টি।

প্রীতি পাশ ফিরল। আবার কী-একটা বলল বিড়বিড় করে। সুধীন শোনবার চেষ্টা করল না। চিৎ হয়ে শুয়ে তার বাড়ির বিষয়ে ভাবতে ভাবতে সবে একটু তন্দ্রা মতো এসেছে, হঠাৎ খুব স্পষ্ট বৃষ্টির শব্দ শুনে তার চোখ টান হয়ে খুলে গেল। সে উৎকর্ণ হয়ে খানিকক্ষণ শুনল। ঠিক মুষলধারে বৃষ্টি পড়ার শব্দ। শিয়রের দিকে ঘাড় উল্টিয়ে খোলা জানলায় চোখ রেখে সে অবাক। অনেকক্ষণ ওইভাবে তাকিয়ে থেকে তার ঘাড়ের ব্যথা বেড়ে গেল। আশ্চর্য, আকাশ থেকে এক ফোঁটা জলও পড়ছে না। অথচ শব্দটা ঠিকই শুনতে পাচ্ছে। খুব ঝমঝম বৃষ্টির টানা শব্দ।

বিছানা থেকে নেমে সে কবরের দিকের জানলা খুলে বাইরে তাকাল। ঝাপসা অন্ধকারে নারকেল গাছের পাতা অল্প-অল্প নড়ছে। একটা কুকুর বা শেয়াল জলের মধ্যে ছল-ছল শব্দ করে হেঁটে যাচ্ছে। বৃষ্টি তো নেই!

ড্রয়ার খুলে বাইনোকুলার বের করে সুধীন চোখে লাগাল। দূরের গাছপালার পাতা কাঁপছে। বাঁদিকে একটা গাছের ডালে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে ঝুপসি মেরে বসে আছে সারি-সারি কতগুলো শকুন। সুধীন নিজের প্রায় অজান্তে গুনে ফেলল, সতেরোটা। কিন্তু কোথাও সামান্য ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও তার চোখে পড়ল না। শব্দটা তখনও সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। একটানা, ঝমঝম।

শব্দ করে জানলা বন্ধ করে সে বিছানায় ফিরে এল। প্রীতিকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বলল, শোনো তো, কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছ?

হঠাৎ ঘুম ভেঙে প্রীতি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। আধ মিনিট ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থেকে সে প্রশ্নটা বুঝতে পেরে শোনবার চেষ্টা করে হালকা গলায় বলল, বৃষ্টি দেখছি থেমেছে।

প্রীতি যখন শুতে যায়, তখনও তিনদিনের বৃষ্টি থামেনি। সে উঠে বসে লম্বা হাই তুলল— কিসের শব্দ বলছিলে?

— তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ না?

— কই, না। তুমি স্বপ্ন দেখেছ।

প্রীতি বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে যাচ্ছে, সুধীন বলল, মাথা ধরার ট্যাবলেট আছে?

ট্যাবলেট আর আধ গেলাস জল দিয়ে প্রীতি বলল, কাল ছেলেটাকে বাড়ি নিয়ে আসা যায় না?

তারপর জানলা দিয়ে রাস্তার জল দেখে আবার বলল, এর মধ্যেও দুটো লোক গামছা দিয়ে মাছ ধরছে! বাব্বা, যা জল! বাড়িটার যে কী অবস্থা হয়েছে কে জানে। আবার নতুন করে না গাঁথতে হয়!

সুধীনের হাত থেকে গেলাস নামিয়ে রেখে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল— বাথরুমে যাচ্ছি, আলো নিভিয়ে দিই?

সুধীন হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ছিল, চোখ না খুলেই বলল, দাও।

খানিক পরে প্রীতি ফিরে এসে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, বাথরুমে যা গন্ধ হয়েছে, টেকা যায় না ।

ততক্ষণে সুধীনের নাক ডাকছে ।

পরদিন সকালে দশ টাকায় একটা রিকশাওলাকে রাজি করিয়ে আধ মাইল নদী ভেঙে সুধীন কোনওরকমে বালিগঞ্জ প্লেসে পৌঁছে দেখল, তার সাধের দেওয়াল বুক জলে মড়ার মতো ভেসে আছে । পাশেই ছোট একটা ঘর আগেভাগে ঢালাই করিয়েছিল, তার মধ্যে সিমেন্ট-টিমেন্ট রেখেছে, সেখানে ছ-সাত জন মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সংসার পেতে আছে । সুধীন উঁকি মেরে দেখল সিমেন্টের বস্তাগুলোর ওপর ভিজে কাঁথা-কাপড় স্তূপাকার । বড়-বড় কাঠের বারকোশ জলে ভাসিয়ে তার ওপর খিচুড়ির বালতি চাপিয়ে কয়েকজন যুবক সুধীনের বাড়ির কাছে আসতেই সুধীন রাগ চাপবার চেষ্টা করে বলল, সিমেন্টের বস্তাগুলো বাঁচানো যায় না? ওই কাঁথা-টাথাগুলো সরিয়ে—

কাছাকাছি আরও চার-পাঁচটা সদ্য ছাদ-ঢালাই বাড়িতে দলে দলে নিচু বস্তি এলাকার মানুষ মাথা গুঁজেছে । যুবকদল ব্যস্ত হয়ে জলের মধ্যে খিচুড়ির বালতি নিয়ে এবাড়ি-ওবাড়ি পরিবেশন করছে । সুধীনের দিকে ফিরে তাকাবার তাদের সময় নেই ।

দরজা বসানো হয়নি, সেই খাঁজে উঠে দাঁড়ালে জল কম । সুধীন সেখানে দাঁড়িয়ে তার ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করে । তার পায়ের কাছে অনেকক্ষণ থেকে একটা কুকুর খাঁজটায় ওঠবার চেষ্টা করে বার-বার পিছলে পড়ে গিয়ে কুঁই-কুঁই করছে । সুধীন খানিকক্ষণ হিসেব ভুলে কুকুরটার অধ্যবসায় লক্ষ করে । জল এখানে কম সেটা কুকুরেও বোঝে । কুকুরটার ঘোলাটে চোখে চোখ পড়ে সুধীনের বুকের মধ্যেটা অস্বস্তিতে শিরশির করে ওঠে ।

বেলার দিকে পাতলা একটু রোদ উঠেছিল, কিছুক্ষণ থেকে আবার মেঘলা । হঠাৎ ঝেঁপে বৃষ্টি এল ।

ঠান্ডা জলে দাঁড়িয়ে সুধীনের শীত-শীত করছিল, বৃষ্টিতে তার প্রচণ্ড কাঁপুনি ধরে গেল । সামান্য কুঁজো হয়ে কাঁপুনি সামলাতে সামলাতে সে ভাবল, এই ঘাতক পৃথিবীতে ছেলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা কার আছে? দাঁতে দাঁত ঠুকে যাচ্ছে, হাড়ের মধ্যে শীত ঢুকে পড়ে সুধীনের সারা শরীর তন্ন-তন্ন করে ঝাঁকাচ্ছে, ওই অবস্থায় যুবকদলের একটি ছেলেকে সে প্রাণপণে ডাকতে চেষ্টা করল । তার এখন একটাই ইচ্ছে, খুব প্রবলভাবে তার ইচ্ছে করছে, ছেলেদের কাউকে ডেকে বলে— সিমেন্টের বস্তাগুলো জলের মধ্যে পর-পর ফেলেও যদি একটু উঁচু জায়গা করা যায় অন্তত একজন বিপন্ন প্রাণে বাঁচবে ।

বৃষ্টির ঝমঝম তার মাথার মধ্যে ঢুকে পড়েছে । জলের মধ্যে কুঁজো হয়ে পুরোপুরি বসে পড়ে সুধীন বিড়বিড় করল, কী করে মানুষ বাঁচবে, উঃ, কী ভয়ানক! ভগবান!

এক টুকরো ত্রিপল মাথায় দিয়ে একটা ছেলে তার খুব কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, যাবেন কোথায়?

সুধীন কাঁপুনিতে কথা বলতে পারছে না! কোনওরকমে বলল, একটা রিকশা ।

ছেলেটি জল ভেঙে বেশ তাড়াতাড়ি রিকশা নিয়ে এল । কুড়ি টাকায় পৌঁছে দেবে ।

রিকশায় উঠে সুধীন জল থেকে কুকুরটাকে তুলে নিল । পায়ের কাছে এলিয়ে পড়ে কুকুর থেকে থেকে হিক্কা তুলছে ।

জলের তলায় রাস্তার খোয়া উঠে খানা-খন্দ গিজগিজ করছে । রিকশা টলমল করে । সুধীন ঝাঁকুনি খেতে খেতে বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখে, কুকুরটার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে । জলে আটকা-পড়া একটা গাড়ির মাথায় সে কুকুরটাকে নামিয়ে দিল ।

বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নেমেই সোজা ঘরের মধ্যে । কুকুর ধরেছিল, কাঁপতে কাঁপতে হাতে সাবান দিল । তারপর ভিজে জবজবে প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে ডেটল-জলে তোয়ালে ভিজিয়ে গা-মাথা মুছতে মুছতে প্রীতিকে বলল, রিকশাওলাকে দশটা টাকা দিয়ে দাও তো ।

প্রীতি গরম দুধ নিয়ে এসেছিল, দুধের গেলাস নামিয়ে রেখে টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল ।

জামা-কাপড় বদলে, বিছানার চাদরে গা-মাথা মুড়ি দিয়ে গরম দুধে চুমুক দিতে দিতে সুধীন রাস্তায় রিকশাওলার চেঁচামেচি শুনল । দুধ শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে জানালার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, এক টাকা ভাড়া, জলের মধ্যে দশ টাকা দিয়েছি, যা ভাগ! আঃ, দরজাটা বন্ধ করে দাও না ।

স্ত্রীর কাছে বাড়ির অবস্থা বর্ণনা করতে করতে সুধীন একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে ভাবল, ভাগ্যিস, ছেলেদের সিমেন্টের বস্তাগুলো দান করে আসিনি!

শীতে চাদরের সুখই আলাদা, সুধীন খুব আয়েস করে ধোঁয়া ছাড়ল । আজ না-হোক কাল তো রোদ উঠবেই । চিরকাল কিন্তু মেঘলা আর বৃষ্টি আর বন্যা থাকবে না!

প্রথম প্রকাশ: যুগান্তর, ৫ নভেম্বর ১৯৭৮

# ঘোড়াদহের মাঠে

বুদাই ঘোড়া নিয়ে বেরোতে যাচ্ছে, তার মা মুখের ওপর থেকে কাঁথা সরিয়ে ঠিক চিলের গলায় চেঁচিয়ে উঠল, মর, মর— ঘোড়ার নাতি খেয়ে মর!

শরীরের মধ্যে আছে বলতে এখন ওই এক গলা। বুদাই অন্য সময় হলে জ্বলে উঠত, তার জীবনটাই এমন যে দিনের মধ্যে ছত্রিশবার তার মাথায় আগুন ধরে যায়। কিন্তু এখন সে ঠাকুরের নাম নিয়ে একটা শুভকাজে বেরোচ্ছে, তার ওপর সকাল থেকে তার খুব ডানহাতের তেলো চুলকোচ্ছে, এক ধরনের ফুরফুরে আশার মধ্যে থেকে সে মায়ের গালি-গালাজ গায়ে মাখল না।

মাঠের মুখে দাঁড়িয়ে বুদাই বিড়ি ধরায়। ঘোড়াদহে যেতে মাঠের পথই সোজা পথ। দরকারে-অদরকারে বুদাই নিজে সে-পথেই যাওয়া-আসা করে। কিন্তু আজ সে ওই এবড়ো-খেবড়ো পথে ঘোড়াকে হাঁটাবে না।

মাঠ বাঁয়ে রেখে নতুন সরকারি রাস্তার দিকে যাচ্ছে, একটু এগিয়েই রেললাইনের পাশে থামতে হল। ট্রেন আসছে। সামনেই স্টেশন। সিগন্যাল পড়েনি। গতি কমিয়ে ঘন-ঘন হুইসেল দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। থামবে মনে হয়।

গতি আরেকটু কমতেই চোরা চালের মেয়েরা চালের পুঁটলি বুকে নিয়ে ঝুপ-ঝুপ লাফিয়ে পড়তে লাগল। কেউ কেউ আগে পুঁটলি ছুড়ে দিয়ে হ্যান্ডেল ধরে সরসর করে নেমে এল। কামরার মাথারও অনেকে বেশ কায়দা করে এখানে-ওখানে পা দিয়ে নেমে পড়ল। এরা এই গাঁয়েরই পুরুষ। গাঁয়ে কাজ নেই, ভোর হতেই রোজ দূরের টাউনে যায় জন খাটতে। যায় দল বেঁধে গাড়ির ছাদে চড়ে। কামরায় বসে গেলে চেকারবাবুরা আজকাল ছাড়তে চায় না। সে-যুগ আর নেই যে দু-চার পয়সা ঠেকালেই নিশ্চিন্ত। অল্পে এখন আর কারুরই খাঁই মেটে না। টিকিটের দাম যত বাড়ছে চেকারবাবুদের রেটও তত বাড়ছে।

ঘোড়াটা এই ফাঁকে ঘাস খেতে শুরু করেছে। দাউদ এখানে নামেনি, তার বাড়ি স্টেশনের ওপারে। ট্রেনের ছাদে বসেই সে বিড়ি ধরিয়েছিল। বুদাইকে দেখে যতটা পারে গলা তুলে বলল, আজ কতটা ছোলা খাইয়েছিস?

বুদাই কাল সন্ধেবেলা আধ সের ছোলা ভিজিয়েছিল, ভোরে উঠে দেখে, হাঁড়ি ফাঁকা। কাছেই ঘরের ভেজা মাটিতে মায়ের দু-পায়ের ছাপ। উবু হয়ে বসেছিল অন্ধকারে, খেতে খেতে হাঁড়ি কাত হয়ে নিশ্চয়ই জল পড়েছে।

বুদাইয়ের ডান হাতের তোলো ভীষণ সরসর করছে। ছোলার ব্যাপারে রাগ ভুলে সে নিজের খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে জোড়ে জোড়ে হাতের তেলো ঘষতে-ঘষতে ওই অবস্থায় যতটা পারল চেঁচাল, বাপকা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া, মুখকা কথা! পুরো একশো নিয়ে আজ ঘরে ফিরব। নইলে বাপের ব্যাটা না!

ট্রেন দাঁড়িয়ে পর-পর টানা হুইসিল দিচ্ছিল, দাউদ ছাদের ওপরেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গোছল করেই ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছি। দেখব আজ কে টাকা নেয়!

সরকারি রাস্তায় একটা বিড়ালছানা চ্যাপ্টা হয়ে আছে। নিশ্চয়ই লরি চাপা পড়েছে। রক্তমাখা এক টুকরো ন্যাকড়ার মতো রাস্তার সঙ্গে একদম সেঁটে আছে। বুদাইয়ের মুখ থুতুতে ভরে গেছে, থুতু ফেলে সে সাবধানে একটু দূর দিয়ে নতুন রাস্তায় উঠল।

বেশ খানিকটা এগিয়ে অঞ্জনা। সরু খাল, কিন্তু নাকি পনেরো-কুড়ি মাইল লম্বা। অনেক কালের পুরনো খাল। এখানকার লোকে বলে নদী। নাইলে রোগ-ব্যাধি সেরে যায়। মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

ব্রিজ পার হয়ে বুদাই ঘোড়া নিয়ে খালপাড়ে নামল। কোথাও শাঁখ বাজছে। উলু দিচ্ছে। বুদাই নিচু হয়ে খালের জল হাতে নিয়ে প্রথমে ঘোড়ার, তারপর নিজের মাথায় ভালো করে ছিটিয়ে দিল। উঠে আসতে আসতে দেখে, খালপাড়ে একটু দূরে কাদের বিয়ে হচ্ছে। খাল ঘেঁসে পর-পর কতগুলো হোগলার খুপরি। উদ্বাস্তুদের তৈরি। এরা আগে অন্য কোথাও ছিল, এখানে নতুন এসেছে। মেয়েরা খালে মাটির কলসি ভরে-ভরে জল নিচ্ছে, উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে কনেকে চান করাচ্ছে।

এখনও ঝকঝকে বিকেল। বুদাইয়ের হাতে খানিকটা সময় আছে। তার খুব ইচ্ছে হল সে ওই বিয়ের লোকজনদের আজকের ঘোড়দৌড়ে যেতে বলে। ঘোড়াদহের কাছাকাছি পৌঁছে বুদাই খরখরে দাড়িতে হাত ঘষতে-ঘষতে ভাবল, আজ একশো টাকা জিতলে কালই সে বিয়ে করবে।

ঘোড়াদহের মাঠে অনেক আগে থেকেই লোক আসতে শুরু করেছে। যাত্রাটাত্রা দেখার মতো আশপাশের গাঁয়ের লোক দুপুর থেকেই এসে মাঠের চারপাশে বসে পড়েছে। অনেকে এখানে-ওখানে জটলা করছে।

ঘোড়া মোট সাতটা। তার নিজেরটা ধরে। বুদাই প্রায় এক নজরে দেখে ফেলল। শম্ভু গড়াই, অনিল ভূইদাস, ঘোটে চিংড়ি, সুরফ-ফোজো দুভাই, পঞ্চা বারুই, বুড়ো কাদের আলি— এর মধ্যে কোঁদালিয়ার ঘোটে চিংড়িই যা নতুন। এই প্রথম ঘোড়া এনেছে। হাড়ভাঙির নদেরচাঁদ মিঞা এবার আসেনি। তার গুটি বেরিয়েছে। ওদিকটায় এবার বসন্তের শুরুতেই মায়ের দয়ার হাওয়া বইছে। সমর পদ্মরাজের ঘোড়াকে এ-মাঠের অনেকেই ভয় করে। ঘোড়া কিছু আহামরি পক্ষীরাজ নয়, আর সকলের মতোই হাড়-জিরজিরে, ঠেলা টেনে, ধানের বস্তা বয়ে বয়ে ঘাড়ে ঘা। কিন্তু সমরের ছোটাবার কায়দাই আলাদা। যাক, গত মাসে আসেনি, এ-মাসেও এখনও অব্দি দেখা নেই। ছেলেটার যক্ষা নিশ্চয়ই বাড়-বাড়ন্ত। না হলে পর-পর দুবার দৌড় ফেলে ঘরে বসে থাকবার বান্দাই সে নয়।

বুদাই সামনে পিছনে পালা করে রানের জায়গাগুলো মালিশ করতে করতে মাঝে মাঝে ঘোড়ার গায়েই ডানহাতের তেলো ঘষে। বড্ড হাড়। এবার জিতলে সে ঘোড়াকে রোজ তোয়াজ করবে। নতুন খড়ে ঘর ছাইবে। বিয়ে করবে।

আরে যা! হাতে যেন শোঁয়া লেগেছে। হাত চুলকোলে শুভ, কে না জানে! মাঠের চারদিকে ভিড়ের মধ্যে সে নোনাগাঁয়ের মালতীকে খোঁজে। ফি মাসে আসে, আসবেই। বলে ঘোড়া ছুটলে ঘরে থাকতে পারি না। বুক উথাল-পাতাল করে। বলে, স্বপ্নেও আমি ঘোড়া দেখি। পিছনের পায়ে ভর দিয়ে হুই আকাশ ফুঁড়ে চিঁহিঁহিঁ ডাক ছাড়ে। উ রে! কী সোন্দর! মালতী রহস্যময় হাসে।

বুদাই শরৎকালে মালতীর কাছ ঘেঁসতে চেষ্টা করে বলেছিল, আমার ঘোড়াটাকে কখুনো স্বপ্নে দেখোনি?

— তোমার ও হেরো ঘোড়া।

— তবে কার ঘোড়া?

মালতীর দাঁতে আঁচল। দূরে কাদের আলির সাদা দাড়ির দিকে আঙুল তুলে ঠোঁটটাকে সে অদ্ভুতভাবে নড়িয়েছিল, হুই বুড়োর!

কাকির সঙ্গে বসে আছে। খুব জমকালো শাড়ি। দূর থেকেও টকটকে ডুরে বুদাইয়ের চোখে পড়ল। মেয়েটা ফটফট চোখ ঘুরিয়ে এর-এর ঘোড়া দেখছে। কোলের কাছে গুচ্ছ-গুচ্ছ কলাই গাছ। আসার পথে কারও খেত থেকে উপড়ে এনেছে। চোখ ঘোড়ার গায়ে, হাত কোলের কাছে কলাই ছাড়াচ্ছে। না দেখেই ছুড়ে ছুড়ে মুখে ফেলছে।

নিমাই গায়েন জোরে জোরে সকলের নাম হাঁকছে, বুদাই শেষবারের মতো সামনের রান ডলে দিচ্ছে, হঠাৎ কাঁধে চাপড় খেয়ে পিছন ফেরে দাউদ! তার মানে আটটা ঘোড়া । ঠিক আছে, দেখা যাবে, কে জেতে! এবার সে মালতীকে বিয়ে করবেই । সমরও প্রথমবার দৌড়ে জিতে বিয়ে করেছিল ।

ফাল্গুন এখনও শেষ হয়নি, এর মধ্যেই চিড়চিড়ে গরম । বেশিরভাগ শিমুল ঝরে গেছে । হাওয়া নেই । বিকেলের রোদে মাঠ ঝমঝম করছে ।

নিমাই অকারণেই বারবার নাম ডাকছে । দাগ বরাবর আটটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে । আটজনই এখন ঘোড়ার পিঠে । ঘণ্টা বাজার অপেক্ষায় উসখুস করছে ।

নিমাই আরেকবার নাম ডাকা শুরু করতেই সুরফের ভাই ফোজো বলে উঠল, ধ্যাত্তেরি, ঘণ্টা মারতে পারো না! হাতে বাত হল নাকি!

দাউদ খিঁচিয়ে উঠল, মস্করা পেয়েছ! বিড়ি শেষ করতে দিল না, শালার নামের নিকুচি করি!

নিমাই গায়েনের হাতে কাঁসর ঘণ্টা । গম্ভীরভাবে ফোজো আর দাউদের দিকে একবারমাত্র তাকিয়ে সে তেমনই দাগ বরাবর প্রত্যেক ঘোড়ার খুরে চোখ রেখে রেখে নাম হাঁকতে লাগল । কারও ঘোড়া দাগের এপারে পা রেখেছে কিনা সেদিকে তার কড়া নজর । সওয়ার পিঠে নিয়ে সবার ঘোড়াই টলমল করছে । পিঠ বেঁকে গেছে । একে তো খাওয়া জোটে না, তার ওপর সওয়ার বওয়ার অভ্যেস নেই । মাসে এই একবারই, শুধু পূর্ণিমার দিন ঘোড়দৌড়ে সওয়ার নিতে হয় । আরও কষ্ট, পেটে গুঁতো খেয়ে ছুটতে হয় ।

নিমাই ডাক থামিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, অ্যাই বুদাই! দাগ ছাড়! ঘোড়া পিছনে নিয়ে যা —

বুদাইয়ের ঘোড়া খুব বেশিরকম এলোমেলো পা ঠুকছিল । পিছনের একটা পা বার-বার বেকায়দায় ছুড়ছে । বুদাই প্রাণপণে ঘোড়াকে দাগের ভেতরে রাখবার চেষ্টা করছিল । যত দেরি হচ্ছে ততই তার মাথায় রাগ চড়ছে । নিমাইয়ের হাঁক শুনে ফেটে পড়ল, মারব এক ঘোড়ার চাট । ঘণ্টা বাজাও!

নিমাই ভয় পেয়ে প্রায় নিজের অজান্তে ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল ।

শুরু হল ঘোড়দৌড় । বেশিরভাগই এপাশ-ওপাশ এলোমেলো দৌড়চ্ছে । বুড়ো কাদের আলির ঘোড়া একটু এগিয়েই সোজা বাঁদিকে গোরস্থানের জঙ্গলে ঢুকে গেল । পঞ্চা বারুই একবার দাউদের ঘোড়ার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে । তারপর থেকেই তার ঘোড়া আস্তে আস্তে,

প্রায় হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। মাঝমাঠে ঘোটে চিংড়িকে পিঠ থেকে ছিটকে ফেলে দিয়ে তার ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে মনে হয় নিমাইয়ের দিকেই ছুটে যাচ্ছে, তার নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠছে।

বুদাইয়ের মাথায় আগুন ধরে গেছে। হাজার গুঁতোতেও তার ঘোড়া দৌড়ই শুরু করছে না। দাগের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে শুধু পিছনের একটা পা অদ্ভুতভাবে ছুড়ছে আর পেটে গুঁতো খেয়ে চিঁহিঁহিঁ করে ডেকে উঠছে।

অনিলের ঘোড়া অনেক দূরে। প্রায় দিগন্তের কাছে। ওই ছুটে যাচ্ছে। মাঠের পুবদিকে চাষের জমিতে নাটবল্টুর কারখানা উঠছে, সেটাও ছাড়িয়ে গেল। তার পিছনেই দাউদের ঘোড়া। বুদাই তখনও পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে। ঘোড়াকে খিস্তি করে করে তার মুখে ফেনা উঠে গেছে। শম্ভুর ঘোড়াও টলমল করে মাঝমাঠ ছাড়িয়ে গেল দেখে বুদাই গলা চিরে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, ছোট শালা, ছুটতেই হবে!

বলে দু-পাশ থেকে দু-পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পেটে একসঙ্গে লাথি কষাল।

ঘোড়া লাফিয়ে উঠে জোরে চিঁহিঁহিঁ করে উঠতেই বুদাই ঘোড়ার পিঠে কোনওরকমে টাল সামলে নিয়ে বলল, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন!

বলেই আবার পেটের দু-পাশে লাথি। লাথির পর লাথি। ঘোড়া যতই লাফায় ততই আরও লাথি। একবার ছিটকে পড়ে যেতে যেতে বুদাই ঘোড়ার ঘাড়, কেশর ধরে ঝুলে পড়ে ঘোড়ার বুকে জোড়পায়ে প্রচণ্ড এক লাথি মারল।

অনিল দিগন্তে কালো একটা ফুটকি। তার পিছনে দাউদও ছোট্ট হয়ে আসছে। মাটিতে পড়ে গিয়ে বুদাই এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। পিছনে একটু দূরে ছেলেদের বাঁশের গোলপোস্ট। বুদাই হ্যাঁচকা টান দিতেই বাঁশ ভেঙে তার হাতে চলে এল।

বুদাই ঘোড়ার কাছে এসে দাঁড়ায়। তার দু-হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা বাঁশ। ঘোড়াটা মরিয়া হয়ে পিছনের একটা পা দুমড়ে-মুচড়ে এপাশ-ওপাশ টলমল করছে।

আকাশের একদিকে সূর্য ডুবছে। আরেকদিকে পূর্ণিমার গোল চাঁদ। একসঙ্গে দুটো। সূর্যটাকেও ঠিক চাঁদের মতোই দেখাচ্ছে।

কপালে মুহুর্মুহু বাড়ি খেয়ে বুদাইয়ের ঘোড়া মাঠের ওপর শুয়ে পড়েছে। চোখ উল্টোনো। থেকে থেকে হিক্কা তুলছে। হঠাৎ পিছনের বাঁপায়ের খুরে চোখ পড়তেই বুদাই বসে পড়ে। খুরের খাঁজে জোঁক! দু-আঙুল লম্বা। খুরের খাঁজ থেকে অনেকটা ওপর অব্দি পায়ের চামড়ার সঙ্গে সেঁটে আছে। রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল।

বুদাই এসময় কী ভেবে একবার চোখ তুলে আকাশের চাঁদ সূর্য দেখল। তারপর হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে সে ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, জোঁক না মেরে আমি তোকে মারলাম!

সূর্য একদম ডুবে গেছে। সব ফাঁকা। জ্যোৎস্নায় দুনিয়া খাঁ-খাঁ করছে।

বুদাই পাড়া থেকে পরমেশকে ডেকে দিয়ে সেই যে একা একা ঘুরতে গেছে, ফেরার আর নাম নেই। এক মাঠ থেকে আরেক মাঠ, সেখান থেকে একদম অচেনা একটা মাঠে সে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল। কাঁদতে কাঁদতে তার সর্দি ধরে গেছে।

অনেক রাতে সে যখন তার ঘোড়াটার কাছে ফিরে এল, পরমেশ তখনও ছুরি চালাচ্ছে। পরমেশ কশাই। খুব নিপুণ হাতে ছুরি চালাতে চালাতে সঙ্গের ছেলেটিকে একবার বলল, ফাল্গুন মাসে জোঁক, তাজ্জব!

বুদাই কথা বলল না। ততক্ষণে গোটা আকাশ তারায় ভরে গেছে। এবারের আকাশ আপনা-আপনি বুদাইয়ের চোখে পড়ল। সে তার ঘোড়ার মুণ্ডু থেকে চোখে সরাতে গিয়েছিল।

পরমেশ কাজ থামিয়ে ভিজে হাতেই একটা আধপোড়া বিড়ি ধরায়। কোমর সোজা করে। বিড়ি শেষ করে থলে থেকে ভারি দেখে অন্য একটা ছুরি বের করে। আঙুলে ধার পরখ করতে করতে সঙ্গের ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে, খাবি-খাওয়া ঘোড়া, দৌড়ের ধকল সইবে কেন!

বুদাই হঠাৎ রেগে ওঠে। তার মাথায় আগুন ধরে গেছে। পাগলা ঘোড়ার মতো প্রবল একটা লাফ মেরে পরমেশের প্রায় গায়ের ওপর পড়ে ঘাস থেকে সে একটা ছুরি তুলে নিল। তারপর হুঙ্কার দিয়ে বলল, আন শালা, কার কত তেজী ঘোড়া আছে, আন! আমি দৌড়বো, কোন শালার ঘোড়া আমার সঙ্গে লড়বি, আয়, চলে আয়!

জ্বলন্ত আকাশের নিচে তার চিৎকার এক মাঠ থেকে আরেক মাঠে ছুটে যায়। দিগন্তও তার চিৎকারে সাড়া দেয়।

এত বড় মাঠ, এত বড় আকাশ পেয়ে বুদাইয়ের বাঁধ ভেঙে গেছে। মাঠময় ছুটোছুটি করে সে শুধু চিৎকার করে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোড়াদের যুদ্ধে আহ্বান করতে থাকে।

ভীষণ জ্যোৎস্নায়, ঘোড়াদহের মাঠে, ঠিক একটা ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতো বুদাই চেঁচায়, দৌড়োয়। তার হ্রেস্বায় রাতের মাঠ চিরে যায়।

প্রথম প্রকাশ : অমৃত, শারদীয় সংখ্যা ১৯৭৯

# ঘুম

রাখালের মা দরজা খুলে দিয়েই রান্নাঘরের দিকে দৌড়ে গেল। কুকার সিটি দিচ্ছে।

ঘরে ঢুকে দেখি, বাবা ডিভানে বসে আছেন। কোলে দাবার ছক।

নিচু বেতের চেয়ারটায় বসে জুতো খুলতে খুলতে বললাম, কার সঙ্গে খেলছিলে? হঠাৎ দাবা যে?

হ্যাঁ অনেকদিন পর— একা একাই খেলছি। তা বছর বারো হল বোধহয়।

বেশি। শেষ খেলেছিলাম ১৯৬৮তে। আমার মনে আছে।

আমি, বাবা একসঙ্গে দেওয়ালে মায়ের ফটোর দিকে তাকালাম।

বাবার কথার সঙ্গে হাসি মিশে গিয়ে বাবাকে ভারি সুন্দর লাগে। হাসি নিয়েই বাবা বললেন, খেলাটা শেষ পর্যন্ত হলে তোকে চেকমেট করে দিতাম।

সে খেলাটা শেষ হয়নি, মা এসে বোর্ড তুলে নিয়েছিলেন। সেই আমাদের দাবা খেলার ইতি।

আমি বললাম, এই বোর্ড-ঘুঁটি তুমি পেলে কী করে? ছিল কোথায়?

তোর দিদির বিয়ের ডালা-কুলো থলের মধ্যে বাঁধা থাকে না? সেই থলের ভেতর পিঁড়ির তলায় লুকিয়ে রেখেছিল।

আমি চেয়ারটা বাবার সামনে টেনে এনে আধখেলা বোর্ডের ওপর ঝুঁকে বললাম, তুমি মনে হচ্ছে একটু সাদার দিকে টেনে খেলছ। কার চাল— সাদার, না কালোর?

কালোর!

আমি কালো নিচ্ছি।

খেলিস যদি বরং গোড়া থেকে—

দেখা যাক না। দাঁড়াও, একটু ভাবতে হবে।

চা-টা খেলি না। হাত-মুখ ধুয়ে খাবার-টাবার খেয়ে তারপর না হয়— রাখালের মাকে বল, তোকে চা করে দিক। আর যদি চা বাদ দিতে পারিস, ভালো কালোজাম আছে—

বোধহয় ফ্রিজে রেখে গেছে— চমৎকার জাম ।

ওই যাঃ! তোমার জন্য আমলকী কিনেছিলাম, গাড়িতে ফেলে এসেছি!

এখন আমলকী?

শিয়ালদার জ্যামে আটকে ছিলাম, হঠাৎ ফুটপাতে আমলকী দেখে, প্রথমটাতো চিনতে পারিনি, আমলকীর চেহারা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম—

তোর আর দোষ কী । কোথায় আর সেসব ফলমূল । এই যে আমাদের ফলমূল থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি এটা কিন্তু খুব ভয়ের কথা । কত ফল আর চোখেই দেখি না । তুই জাম-কটা খেয়ে আয় ।

আমি উঠতে উঠতে বললাম, আচ্ছা বাবা, ফলসা কোন সময়টায় পাওয়া যায়?

ফলসা আর কোথায় পাবি? ফলসা, গোলাপ জাম, দিশি খেজুর— এসব গ্রীষ্মের ফল ।

জামের বাটি নিয়ে এসে বাবার সামনেই আবার বসলাম । বাবা সিগারেট ধরিয়েছেন । এভাবে ফিরে আসব ভাবেননি । বাবার সিগারেট খাওয়া নিয়ে আমার কড়াকড়িতে আজকাল আমার সামনে খুব কমই সিগারেট ধরান । এখন ধরা পড়ে গিয়ে খুব সহজভাবে সিগারেটে টান দেবার চেষ্টা করছেন । যেন কোটার বাইরে যাননি ।

চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও— সোজা হয়ে বসেন, চশমা ছাড়া রোজ তিনটে কাগজ পড়েন, দু-বেলা দিব্যি তিনতলা সিঁড়ি ভাঙেন, হলে হবে কী, বাবা পঁচাত্তর ছাড়িয়েছেন তাও বছর তিনেক হল । বয়েসের কথা ভেবেই আমি সিগারেটের ব্যাপারে বাবাকে একটু শাসনে রাখতে চাই । বাবার সেটা মনঃপূত নয় । আমার ছেলেকে বলেন, তোর বাবা রোজ ক-প্যাকেট সিগারেট খায় একটু নজর রাখিস তো! আমার বলে আশি বছর বয়স হতে চলল—

আমার সিগারেট খাওয়া নিয়ে সরাসরি তো কিছু বলতে পারেন না, আমার ছেলেকে বলেন, বাবাকে বলিস অত সিগারেট খাওয়া ভালো না! আজকের হিন্দুতে একটা লেখা বেরিয়েছে, পেজ ফোরটিনে, আমি দাগ দিয়ে রেখেছি, তোর বাবাকে দেখাস ।

বাবা হয়ত সহজ হবার জন্যই বললেন, ভালো না? পাকা জামের স্বাদই আলাদা ।

আমি একটা আঁটি চুষতে চুষতে বললাম, তোমার এটা আজ ক-নম্বর?

বাবা একটু ক্ষুণ্ণ হলেন । ছাই ঝেড়ে বললেন, আজকাল আর পাঁচ-ছটার বেশি খাই কোথায়?—

একটু পরে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, কাগজে একটা বইয়ের বিষয়ে পড়লাম, বাংলার নানান ফলের খাদ্যগুণ নিয়ে ভালো লিখেছে নাকি— রুমাকে বলেছি যদি পায় নিয়ে আসে যেন।

এসে থেকে দেখছি না তো! গেছে কোথায়?

রঞ্জু-মঞ্জুকে নিয়ে বইমেলায় গেছে।

যাঃ! একটা তালিকা করে রেখেছিলাম—

রুমাকে বলে রাখলেই পারতি। ও জানে না?

উঁহু। তাছাড়া রঞ্জু-মঞ্জুকে এই সময় কয়েকটা অন্য ধরনের বই পড়াব ভেবেছিলাম।

তুই একদিন ঘুরে আয় না। মেলায় দেখবি মানসিক বিশ্রাম হয়ে যাবে।

আমি আর সময় পাচ্ছি কোথায়?

ওরই মধ্যে করে নিতে হবে। ব্যস্ততা তো থাকবেই, তোর এখন ব্যস্ত থাকারই বয়েস। তবে শ্রমের সঙ্গে বিশ্রামের অনুপাতটাও ঠিক রাখা চাই।

বাবা নতুন করে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন— কী নিবি? সাদা, না কালো?— ভালো কথা, কদিন ধরে আমার একটা ইচ্ছে হচ্ছে, এই ঘরে এই যত গাছ আছে তার কয়েকটা গাছের নাম-ধাম, ফল-ফুল, বংশপরিচয় কিছুই জানি না। প্রথম সারির মাঝেরটা। দ্বিতীয় সারির প্রথম দুটো। আর ওই রাবার প্ল্যান্টের ডানদিকে যেটা।

বাবা আঙুল তুলে জানলার পটীর গাছগুলো দেখালেন।

সব কটাই বিদেশি। ইন্ডোর প্ল্যান্টের ওপর ভালো বিদেশি বই পাস যদি একটু খোঁজ করিস। খুব জানতে ইচ্ছে করে।

বাবা বোর্ড সাজিয়ে তৈরি। সেই খেলাটায় তোর সাদা ছিল না?

আমি একটু আসছি।

টিভিটা চালিয়ে দিয়ে যা তো। যদি ভালো কিছু থাকে। ততক্ষণ দেখি—

কী ব্যাপার? এরকম বসে বসে কাউকে নির্দেশ দেবার লোক তো বাবা নয়! বৃষ্টির ছাঁট আসছে, জানলাটা বন্ধ করে দে— বাবা এরকম কখনও বলেন না। নিজে উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করাই বাবার স্বভাব।

আরও আশ্চর্য, এতক্ষণ আমার চোখে পড়েনি, বাবা আজ সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে, প্রায় কুঁজো হয়ে বসেছেন। সারা জীবন বাবাকে মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে দেখাই আমার অভ্যেস। এ তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার!

আমি বললাম, তোমার শরীর খারাপ নাকি? এরকম করে বসেছ?

শরীর ঠিক আছে। একটা সমস্যা হচ্ছে— দুপুর থেকে শুতে পারছি না। শুলেই বুকে কী রকম একটা অস্বস্তি হচ্ছে। এই যেভাবে বসে আছি— এতে আরাম পাচ্ছি।

এ তো ভালো কথা নয়। এতক্ষণ বলোনি, আশ্চর্য!

বাবা মৃদু হাসলেন— ভয়ের কিছু নেই। রাতে নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে যাবে।

বুকে কোনওরকম ব্যথা হচ্ছে না তো?

না না, সেসব কিছু নয়। এক ধরনের রেস্টলেসনেস বলতে পারিস। বসে আছি, এখন কিছু নেই।

বুকের বাঁদিকে কি?

মাঝখানে।

আমি ডাক্তারকে ফোন করছি—

না না, ডাক্তার ডাকার মতো ব্যাপার নয়। কোথায় যাচ্ছিলি, সেরে আয়, এক হাত খেলা যাক।

টিভিতে হাল্কা মিউজিকের সঙ্গে লেখা— অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় দুঃখিত।

বাবা সেদিকে তাকিয়ে হাসলেন— দুঃখ প্রকাশে আমাদের আর লজ্জা নেই।

আমার হঠাৎ মনে পড়ল, বাবা টিভিতে প্রথমে সাত নম্বর চ্যানেল ধরেন। ছেড়ে-আসা দেশের গাছপালাও বাবার ভারি প্রিয়।

আমি চ্যানেল ঘুরিয়ে বাংলাদেশ ধরলাম।

সিগারেট শেষ করে ফিরে এসে দেখি, বাংলাদেশের এক গ্রামে চাষীদের সঙ্গে এরশাদ কথা বলছেন— চারদিকের গাছপালা, খেত-খামার, খাল-বিলের ওপর দিয়ে মাঝে-মধ্যেই ক্যামেরা ঘুরে যাচ্ছে। বাবা তন্ময় হয়ে দেখছেন।

আমি টিভির দিকে তাকিয়ে বাবাকে বললাম, প্লেনে কলকাতা থেকে ঢাকা চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিটের পথ। তুমি দু-চার দিন বাংলাদেশে ঘুরে আসতে পারো! ছেলেবেলার

স্মৃতি বলে কথা! আমার তো মাঝে মাঝে বারুইপুরের জন্য মন কাঁদে। কলকাতা থেকে বোধহয় কুড়ি-বাইশ কিলোমিটার— তবু মনে হয় কত দূরে ফেলে এসেছি!

বাবা টিভিতে চোখ রেখেই বললেন, ছেলেবেলার দেশ কি আর বাইরে পাওয়া যায়? ও থাকে মনের মধ্যে। ঘরে বসে সিনেমার মতো দেখছি, এই বেশ।

আচ্ছা বাবা, তুমি দেশ ছেড়েছ কত বছর বয়েসে?

১৯৩০। তার মানে তখন আমার ঠিক তেইশ বছর বয়স।

তুমি একবার ঘুরে এসো। বলো তো আমি সব ব্যবস্থা করে দিই। তোমার ছেলেবেলার গ্রাম তোমার খুব ভালো লাগবে।

পারলে তুই একবার যাস।

আমার তো ওটা দেশ নয়। আমি গেলে বারুইপুরে যাব। গাছপালার মধ্যে দিয়ে কী আশ্চর্য রেললাইন! একটা চলে গেছে লক্ষ্মীকান্তপুরে, আরেকটা ডায়মন্ডহারবার। আমি বিকেল হলেই বেরিয়ে পড়তাম। বাঁদিকের রেললাইন ধরে যেতাম শাসন পর্যন্ত। ডানদিকে যেতাম কল্যাণপুর পর্যন্ত। তুমি অফিস থেকে ফেরার অনেক আগে আমি ফিরে আসতাম। তুমি টের পেতে না।

বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার গল্প শুনছিলেন। হেসে বললেন, টের পেতাম না? আবদুলকে তোর মনে আছে? আমাদের বাড়ির গাছ-টাছ দেখাশোনা করত— আবার নতুন ঘর-টর মেরামতির কাজে রাজমিস্ত্রির যোগাড়ের কাজও করত— তোকে গাছপালা চেনাবার ভারও আমি ওকেই দিয়েছিলাম— ওর বাড়ি ছিল শাসনে, তোকে একা একা রেললাইন ধরে ঘুরতে দেখে ওর খুব চিন্তা হত। এসে বলত, আপনি বাবু, অমরকে একটু বকে দেবেন। বর্ষাকালে সুতির বাদায় তুই সুরজ-ফোজোদের সঙ্গে তালের ডোঙা চড়তিস, ওর পছন্দ হত না।

আমি এসব করতুম তোমাকে-মাকে লুকিয়ে। তুমি তো এসব নিয়ে কখনও কিছু বলেছ বলে মনে পড়ছে না।

তোর মা খুব দুশ্চিন্তা করত, আমিই তাকে বোঝাতাম। ওই বয়েসে আমি যা নদী-নালা মাঠ-ঘাট ভেঙেছি তার কাছে এতো কিছুই না! বারুইপুরে সেসব আর তুই পাচ্ছিস কোথায়? ওই বর্ষাকালেই যা একটু— আর ওই রেললাইন।

বারুইপুরের কথায় মনে পড়ল— তখন তুমি শীতকালে উঠোনে রোদে বসে কাগজ পড়তে, আমি দাঁত ব্রাশ করতে করতে একদিন তোমার কাছে জানতে চাইলাম— ব্রাশ কি

জোরে জোরে চালাতে হয়? তুমি কাগজ পড়তে পড়তে শুধু হুঁ বললে। কাগজ নিয়ে বসলে তুমি আর সব ভুলে যাও, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে শুধু হুঁ-হাঁ-ই বলতে। সেদিন তোমার হুঁ শুনে আমার খুব অভিমান হয়েছিল। আমার সমস্যাটায় তুমি মোটেই মন দাওনি। 'জোরে জোরে' বলতে তুমি কি 'চেপে চেপে' বুঝেছ, না 'দ্রুত' বুঝেছ? 'হুঁ' বলে তুমি কোনটা বোঝালে? তোমার মোড়ার চারপাশের ঘাস শিশিরে চিক-চিক করছিল, আমার এখনও মনে আছে। বাবা হাসলেন, তোর তো বেশ প্রখর স্মৃতি। আমার কিছু মনে পড়ছে না।

তোমার শালের ওপর পেয়ারাগাছ থেকে এক ফোঁটা শিশির পড়েছিল।

বারুইপুর বাবার দ্বিতীয় দেশ। আমার প্রথম। বাবা অনেক খুঁজে-পেতে বারুইপুর পছন্দ করেছিলেন। তখনকার গাছপালায় ভরা, শান্ত, নির্জন বারুইপুরের স্মৃতিকথায় বাবার মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠেছে বোঝা যায়। উত্তেজনায় প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট পুরোপুরি বের করার পর হঠাৎই আমার উপস্থিতি খেয়াল করে সিগারেটটা প্যাকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

আমি বললাম, আমাদের সেই পেয়ারাগাছটা এখনও আছে কিনা কে জানে!

বাড়ি যারা কিনেছে তারাই জানে! গাছ বড় অসহায়। জমির মালিক রাখলে রাখে, কাটলে কাটে। এ এক দুঃসহ অবস্থা।

তোমার বুকে এখন আর কোনও অস্বস্তি নেই তো?

মনোযোগ দেবার মতো কিছু নয়। বিজ্ঞাপন শুরু হল। বাংলাদেশেও একই বিজ্ঞাপন! আয়, এক হাত খেলা যাক।

আমি রাজার সামনের বোড়ে দু-ঘর দিলাম। বাবা মারলেন না। ঘোড়া তুলে নিজের বোড়েটার পাহারার ব্যবস্থা করলেন।

আমি ঘোড়া তুলব, না গজ বার করব, ভাবতে ভাবতে বললাম, এক কাপ চা হলে কেমন হয়?

হ্যাঁ, এখন খেতে পারিস। রাখালের মা, দাদাকে এক পেয়ালা চা করে দাও। আমাকে আধ পেয়ালা।

চা বাবার অতি প্রিয়। পারলে সারাদিনই চা খান, কেবল অসুস্থ থাকলে চায়ে বাবার রুচি থাকে না। সুস্থতা পরীক্ষা করবার জন্যই আমি চায়ের কথা তুললাম।

বাবা অনেক সময় নিয়ে আস্তে আস্তে চা খাচ্ছেন। একটা করে চাল দিয়ে এক চুমুক। আমি চা শেষ করে বললাম, তুমি ভাব। আমি আসছি।

কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, বাবা ঠিকই বুঝেছেন। পাশের ঘরে এসে সিগারেট ধরিয়ে কান খাড়া করে রাখলাম— না বাবা আমার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সিগারেট ধরালেন না।

ফিরে এসে দেখি, মন্ত্রীর দিকের গজ ছুঁয়ে বাবা এক মনে চিন্তা করছেন।

চাল দাওনি?

এই দিই।

গজ এগিয়ে দিয়ে বাবা বললেন— দুপুরে শুইনি তো, বসে বসে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

একটু শুয়ে নাও না।

আরেকটু বসি। বোর্ডটা শেষ করা যাক।

এবার চালটা দিলাম খুব একটা না ভেবেই।

বাবা ভাবতে বসলেন। ভাবছেন তো ভাবছেন, চাল আর দেন না। হঠাৎ দেখলাম, বাবার চোখ ঘুমে বুজে আসছে।

খেলা থাক। একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি খাবার সময় ডেকে দেব।

বাবা চোখ খুলে কিছুটা লাজুক কিছুটা বিষণ্ণ হেসে বললেন, বড্ড ঘুম পেয়ে গেছে দেখছি। চাল দিইনি বুঝি? এই নে?— ঘোড়া সামলা!

আমি সোজা পাশের ঘরে গিয়ে আমাদের চেনা হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ফোন করলাম — একবার যদি আসেন। বাবার বুকে— না না ব্যথা-ট্যথা নেই। শুধু শুলে বুকে একটা অস্বস্তি হচ্ছে।

অস্বস্তিটা কি নিশ্বাসের কষ্ট?

জিজ্ঞেস করছি। ফোনের মুখ চেপে ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বললাম, বাবা, শুয়ে কি তোমার নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল?

বাবা সামনে বসে কথা বলার মতো বললেন, ওই আর কি।

আমার উত্তর শুনে ডাক্তার বললেন, বাড়িতে একোনাইট ২০০ আছে? এখনই এক ডোজ দিয়ে দিন। আর ডিজিটালিস ৩০ আনিয়ে রাখুন। আমি আসছি।

এ ঘরে আসতেই বাবা বললেন, তুই কি ডাক্তার ডাকছিস নাকি? তুই বড় অল্পে অধৈর্য হোস ।

আমার গলায় একটু হয়ত রাগ এসে গেছে, বললাম— তোমার মতো ধৈর্য তো আমার নেই । নিশ্বাসের কষ্ট— এতক্ষণ বলোনি কেন? দেখি, হাঁ করো ।

ওষুধটা খেয়ে নিয়ে বাবা হাসলেন— ধৈর্য তো জীবনে চাই-ই রে! একটা বয়েসে দেখবি ধৈর্য ছাড়া আর কিছুই শেখবার নেই ।

নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, অথচ তুমি গা-ই করছ না, এও তো এক ধরনের গ্রাম্যতা!

তুই রেগে যাচ্ছিস । রাগ আসে ক্ষতিবোধ থেকে । আমার এটা সে ধরনের কিছু নয় ।

আমি আর কিছু না বলে শুধু বললাম, আমি একটু আসছি ।

কোথায় যাচ্ছিস?

একটা ওষুধ এনে রাখি, শোবার সময় যদি দরকার হয়—

আমার মনে হয়, একটা সিগারেট খেয়ে দেখা যেতে পারে ।

না না, এ অবস্থায় আজ আর সিগারেট না খাওয়াই ভালো ।

যদি ডাক্তার আনিস, দাড়িটা একবার কামাতে হবে ।

আমি বাবার মুখের দিকে তাকালাম, দাড়ি তো আজ কামিয়েছ ।

সে কোন সকালে । এতক্ষণে আবার গজিয়ে গেছে ।

তোমার মুখ একদম পরিষ্কার ।

ওষুধ নিয়ে ফিরে এসে দেখি ডাক্তার ব্যানার্জির সঙ্গে বাবা দিব্যি গল্প জুড়েছেন ।

আমাকে দেখেই ডাক্তার বললেন, পিঠে কয়েকটা বালিশ এনে দিন । শুতে যখন পারছেন না, অন্তত আধশোয়া অবস্থায় থাকুন । ওঁর এখন শোওয়াটা খুব দরকার ।

'এভাবে শুলে অসুস্থের মতো দেখায় ।' বলতে বলতে আমাদের দুজনের পীড়াপীড়িতে, নিতান্ত অনিচ্ছায় বাবা বালিশ হেলান দিলেন ।

দুয়েক মিনিট কারও মুখেই কথা নেই । বাবার চোখ বোজা, বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন ।

হঠাৎ চোখ খুলে বললেন, আমি উঠে বসি । দুপুরের সেই অস্বস্তিটা ফিরে আসছে ।

ডাক্তার ব্যানার্জি আমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে বললেন, আরেকটু শুয়ে থাকুন। ওষুধ দিচ্ছি, ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

চেষ্টা করব কী, ঘুমে তো শরীর ভেঙে আসছে। এত ঘুম পেয়েছে— নিজেরই অবাক লাগছে। অথচ শুয়ে থাকতে পারছি না।

পারবেন। ওষুধটা চিবোবেন না, চুষে চুষে খান।

ডাক্তার চলে যাবার পর বাবা উঠে বসে বললেন, তোর মায়ের তো ইচ্ছে ছিল না আমরা দাবা খেলি। আজও শেষ হল না। তুলে রাখ। বড্ড ঘুম পেয়ে গেছে।

বোর্ড যেমন ছিল পড়ে রইল। আমি পাশের ঘরে এসে এমার্জেন্সি ডক্টর সার্ভিসে ফোন করে অক্সিজেন নিয়ে আসতে বললাম।

এ ঘরে এসে বাবাকে বললাম, দ্যাখো বাবা, যারা পাহাড়ে ওঠে, ওই যারা অভিযান-টভিযান করে আর কি, নিশ্বাসের কষ্টের জন্য পিঠে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে যায়, জানো তো? তোমারও শুলে নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, তোমাকেও অক্সিজেন দিয়ে দিই কী বলো? অক্সিজেন নিলে কষ্টটা কেটে যাবে, তুমিও আরামে ঘুমোতে পারবে।

বাবা তিন-চার সেকেন্ড আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, অক্সিজেন আজকাল বাড়িতে আনা যায় নাকি? খরচও নিশ্চয়ই কম না?

আমি বললাম, খরচ সামান্য। ফোন করে দিলেই বাড়িতে সিলিন্ডার নিয়ে চলে আসে। আমার কাছে ওদের ফোন নম্বর আছে।

এরপর মিথ্যে করে বললাম, দাঁড়াও ফোনটা আগে করে আসি।

ডিভানের পাশে ঝুঁকে অল্পবয়েসী ডাক্তার অক্সিজেনের সাজসরঞ্জাম ঠিক করতে করতে বাবাকে বললেন, আপনাকে যে এবার একটু চিৎ হয়ে শুতে হবে।

বাবা বললেন— কঠিন। দেখি চেষ্টা করে।

বাবা চিৎ হয়ে শুলেন। অক্সিজেনের নল নাকে নিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন— না, এতে হচ্ছে না। আচ্ছা আর একটু ধৈর্য ধরে দেখি, যদি ঘুমনো যায়।

বাবা উঠে বসলেন। ডাক্তার ও তাঁর সহযোগীরা সাজসরঞ্জাম নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটু ঘুমের জন্য এত উদ্যোগ আয়োজন— তোর নিশ্চয়ই তিন-চারশো খরচ হয়ে গেল!

বাবার মুখে সেই লাজুক হাসি। ওই হাসির মধ্যেই বললেন, কিন্তু আর তো না ঘুমিয়ে পারা যাচ্ছে না। একটু চেষ্টা করা যাক।

আশ্চর্য, বাবা এবার অনায়াসে, কারও সাহায্য ছাড়া, ডিভানে শুয়ে পড়লেন।

একটু পরেই বেল বাজার শব্দে আমি দরজা খুলে দেখি— আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে। তিনজনের হাতেই বড় বড় বইয়ের প্যাকেট।

রঞ্জু ঘরে ঢুকে ডিভানে দাদাকে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে দেখে ‘দাদা, দ্যাখো দ্যাখো’ বলে বইয়ের প্যাকেট হাতে এগিয়ে যাচ্ছিল, আমি ওকে ধরে ফেলে, আমার ঠোঁটে আঙুল রেখে খুব আস্তে আস্তে বললাম, চুপ, চুপ, দাদা ঘুমিয়েছে।

রুমা নিচু চেয়ারটায় বসে পড়ে কোলের ওপর নিজের প্যাকেটটা নিয়ে খুলতে খুলতে বলল, মানে? না খেয়ে ঘুমোলেন কী রকম?

আমি বললাম, ঘুমের জন্য একেবারে কাঙাল হয়ে পড়েছিলেন। খুব আস্তে কথা বলো।

সে কী!

আঃ, আস্তে!

দুঘণ্টা পর টেবিলে খাবার দিয়ে রুমা বাবার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আচমকা অদ্ভুত স্বরে কেঁদে উঠল।

দৌড়ে এসে দেখি বাবা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন।

প্রথম প্রকাশ : যুগান্তর, শারদীয় সংখ্যা ১৯৮৫

# মন্তুরোর মা অথবা রাজধানীর গল্প

মন্তুরোর মা লাঠি ঠুকে ঠুকে এসে আমাদের বারান্দায় বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কলকেতা থেকে নাতি আসবে বলেছেল, এলোনি, ইদিকে সাঁঝ নাগতে নেগেছে, ভাবলুম পাখি কটা তবে খোকাকেই দে'আসি । দাও বাবা, চার আনা পয়সা দাও ।

বলে চারটে তিতির পাখি আমার সামনে নামিয়ে রেখে মন্তুরোর মা হাত পাতল । পাখিগুলির একটার সঙ্গে আরেকটার পা সুতলি দিয়ে বাঁধা, সেই অবস্থায় তারা ডানা ফরফর করে মাঝে মাঝে ওড়ার চেষ্টা করছে, হাঁপিয়ে গিয়ে দম নেবার চেষ্টায় তাদের ছোট্ট পেট ফুলে ফুলে উঠছে ।

আমি বেশ মুশকিলে পড়লাম । একে তো, মন্তুরোর মা জানে না, বেশ কিছুদিন হল আমি আমিষ ছেড়ে দিয়েছি । তার ওপর যদিবা তিতিরগুলো কিনে নিয়ে পরে উড়িয়েও দিই, তার দাম মাত্র চার আনা?

জোর করে বেশি দাম দিতে গেলে সে কিছুতেই নেবে না । বোঝাতে গেলে বা বেশি জোর করলে সে এই বলে কাঁদতে বসবে— খোকাও আমায় ভিখিরি ভাবলি বাবা! এ আমি আগেও অনেকবার দেখেছি । বছর কয়েক আগে, যে-বছর ইন্দিরা গান্ধি নিহত হলেন, দিল্লি একেবারে অসহ্য লাগাতে সপ্তাহ কয়েকের ছুটি নিয়ে গ্রামে এসেছি, মন্তুরোর মা দুটো নারকেল নিয়ে এসে এক টাকা চাইল । বাজারে দুটো নারকেলের দাম তখনই সাত-আট টাকার কম নয়, কিন্তু সেকথা বোঝায় কে! শেষ পর্যন্ত তাকে সাহস করে একটা দু টাকার নোট দিলাম । চোখে তো প্রায় দ্যাখেই না, একটাকা আর দু-টাকার নোটে নিশ্চয়ই তফাত করতে পারবে না । মন্তুরোর মা নোটটার ওপর ঝুঁকে পড়ে আঙুল দিয়ে প্রথমে তার ধারগুলো ও পরে জমি ও তারপরে দুটোই একসঙ্গে পরীক্ষা করতে করতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল— তুমিও আমায় ভিখিরি ভাবলে বাবা! তোর দরজায় আমি কি ভিখিরি এয়েছি, খোকা!

আমার দিক থেকে সাড়া না পেয়ে মন্তুরোর মা অধৈর্য হয়ে বলল, দাও বাবা, চার আনা পয়সার জন্যি আর বোস থাকতি পারি না । অ্যাতটা আস্তা, ঘরে ফিরতি আত হয়ে যাবে ।

আমি একটু নির্দয় হয়ে বললুম, মাছ-মাংস আমি ছেড়ে দিয়েছি দাদিমা ।

আমি যখন এই বাড়িতে হামাগুড়ি দিই তখন থেকেই (পরে শুনেছি, তারও আগে থেকে) মন্তুরোর মা আমাদের বাড়িতে ডিম, দুধ, নারকেল এইসব দিয়ে যেত । কথা বলতে শিখে মন্তুরোর মাকে আমি দাদিমা বলে ডাকতাম । আমার মা কিংবা বাবাই শিখিয়েছিলেন ।

— তুমি কি নিমাই সন্নিসি হবে নাকি? কচি বয়েস, মাংস না খেলি চলে? এখনও বে-শাদিও করলে নি!

একথায় আমার সত্যিই হাসি পেয়ে গেল । চাকরি করে মাথার চুল প্রায় সাদা হয়ে এসেছে, বছর পাঁচেক পরে রিটায়ার করব— কচিই বটে! বে-শাদির বয়েসই বটে!

আসলে মন্তুরোর মার সঙ্গে আজকাল আমার বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ হয় না । থাকি দিল্লিতে, কালে-ভদ্রে ছুটি নিয়ে দু-চার দিন আসি, এবার একটু ঘন ঘন এলাম । তার কারণ, রিটায়ার করে শেষ অব্দি হয়তো এখানে এসেই থিতু হব । ছোটবেলা থেকেই গাছপালা আর লেখাপড়ার শখ, ওই দুটো নিয়ে থাকার ইচ্ছে । সেইভাবে এই বাড়িটা কোনদিকে কতটা অদল-বদল করা যায়, কিছুদিন ধরে নানাভাবে ভাবছি ।

— কই বাবা?

অগত্যা ঘর থেকে একটা সিকি এনে মন্তুরোর মার হাতে দিয়ে বললাম, তোমার কাজকম্ম কেমন চলছে, দাদিমা?

মন্তুরোর মা সিকিটা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে সামনের দিকে বৃথা খানিক চেয়ে থেকে বলল, দিন আর কাটে না বাবা । ওজ সূয্যি উঠতিছে, ওজ সূয্যি ডুবতিছে, কিন্তু মনি হয় ঝ্যানো সূয্যি উঠতিছেও না, ডুবতিছেও না ।

মন্তুরোর মার আসল নাম কী কেউ জানে না । আদপেই তার কোনও নাম আছে বা ছিল কিনা, জানার দরকারই হয় না । এ বিষয়ে কেউ কখনও কিছু ভাবেও না । পাড়ার কেউ মন্তুরোর মার উঠোনে দাঁড়িয়ে মন্তুরোকেই জিজ্ঞেস করে, মন্তুরোর মা মাঠ থেকে ফিরেছে রে, মন্তুরো?

দাঁত খোঁটা মন্তুরোর আযৌবন অভ্যেস, দাঁত খুঁটতে খুঁটতে সেও জবাব দেবে, মন্তুরোর মা কি তোমার ঝ্যামন-ত্যামন বংশের মেয়েছেলে নাকি গো, বেলা তিনটেতেও মাঠে-ঘাটে ঘুরে মরবে? কী, বিছের ওষুধ নিতে এয়েছো, না কাছিমের ডিম?

বা হয়তো বলে (বিশেষ করে সন্ধেবেলা কেউ এসে ডাকলে), মন্তুরোর মা কি তোমার জন্যি ডুমুরের মধু নিয়ে বসে ওয়েছে যে অ্যাগবারে হত্যে দিয়ে পড়লে?

শুধু মন্থুরোই না, মন্থুরোর মাও তার আব্বাকে লতায়-পাতায় মুর্শিদাবাদের নবাবের বংশধর বলে বিশ্বাস করে।

মন্থুরোর মা'র আব্বা ভাতের সন্ধানে মুর্শিদাবাদের পৈতৃক ভিটে আর পিতৃপুরুষের কবরের মায়া ত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে বারুইপুরের এই পশ্চিম সীমানায় এসে যখন ডেরা বাঁধে তখন এখানকার এইসব গ্রামে ছিল বলতে শুধু বন-জঙ্গল। জঙ্গলের শেষে জলা। মন্থুরোর মা'র আব্বা জঙ্গল কেটে প্রথমে নিজের চাষ-বাস ও পরে ক্রমশ আরও পাঁচজনের চাষ-বাসের ব্যবস্থা করে। তার শাদিও হয় এই নতুন বসতি করা ঘরের মেয়ের সঙ্গে। মাটিও নিল এখানেই। তারপর মন্থুরোর মা'র শাদি হল, সেও এই গাঁয়েরই ছেলের সঙ্গে। বছর চোদ্দ-পনেরো পরে সে-মানুষটাও মরে গেল। মন্থুরোর মা'র ছোট মেয়ে তখন পেটে। সেই থেকে মন্থুরোর মা-ই সংসার চালায়। সেই মেয়ের শাদি হল যেবারে, তখনও বারুইপুরে ইলেক্ট্রিক ট্রেন হয়নি। বছর কয়েক পর তার তালাকের সময় সবে ইলেক্ট্রিক ট্রেনের তার খাটানোর কাজ শুরু হয়েছে। তখনও এখানকার প্রবীণ হিন্দুরা বলাবলি করত, পশ্চিমের শুকনো খালটা আসলে আদিগঙ্গা। ভেলায় সাপে-কাটা লখিন্দরের শব নিয়ে বেউলা এখান দ্যেই গেছিল।

ডুমুরের মধু মানে অবশ্য চোলাই মদ। মন্থুরোর মা নিজে চোলাই করে না, শুধু ছাপ্লাই দেয়।

তা সেই এক-দেড় কুড়ি বয়েস থেকে আজ এই চার কুড়ি পেরনো বয়স অব্দি মন্থুরোর মাকে করতে হয়নি এমন কাজ পৃথিবীতে বোধহয় বেশি নেই। তাছাড়া উপায় কী, বাপ-মরা অতগুলো ছানাপোনা নিয়ে বিধবা হওয়া— উদয়-অস্তে তা ধরো গে তোমার এক কুড়ি পেট। মজার কথা, মন্থুরোও বুড়ো হত চলল, তবু আজও সে মাকে খাওয়ানো দূরের কথা, মা না হলে তাকেই আধপেটা খেয়ে থাকতে হত।

মন্থুরোর নিজের চার ছেলে সেয়ানা হয়ে কে কোথায় ছিটকে-ছড়িয়ে গেছে মন্থুরো জানে না। ছোট ছেলেটাও মাঝে মাঝে চলে যায়। রাজমিস্ত্রির সঙ্গে যোগাড় দেয়, জনমজুর খাটে, মাটি কাটে। তখন চুলে খুব তেল দিয়ে টেরি বাগায়। তারপর চুলে ধুলো পড়লে বাড়ি ফিরে আসে। তখন রোজ রোজ শাক ভাতে কি গুগলির ঝোলে বিরক্ত হয়ে কোনওদিন একমুঠো কাছিমের ডিম, কোনওদিন কয়েকটা পাখিটাখি খুঁজে আনে।

মন্থুরোর ছেলেরাই শুধু নয়, মন্থুরোর মার মেয়েদের ছেলেমেয়েরাও কে কোথায় আছে, কে কে বেঁচে আছে, কাদের শাদি হয়েছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে— এসব হিসাবও মন্থুরোর মা'র ভারি গোলমাল হয়ে যায়। একটা সময় ছিল যখন আশপাশের দু-চার গাঁয়ের সিকিভাগ ছেলেমেয়েই মন্থুরোর মা'র নাতিপুতি। তারাও বেশিরভাগ অন্তত বছরে কোনও

না কোনও সময় মন্থরোর মা'র বাড়িতে এসে থেকে যেত। মন্থরোর ছেলেরাও তখন বাড়িতেই থাকত। মন্থরোর মা তখন লোকের বাড়ি-বাড়ি দুধ বেচত, ডিম বেচত, ছালা ভরা নারকেল বয়ে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসত। তখনও যেটুকু জায়গা-জমি ছিল তাতে শশা ফলাত, বরবটি চিচিঙ্গী ফলাত। পালং মটর বুনত। কাজের তার শেষ ছিল না। তার কারণ মন্থরোর মা'র সারা জীবনে একটাই কাজ— যেভাবে হোক সংসারের দুটো ভাত যোগাড় করা।

কার্তিক মাস শেষ হতে চলল, সন্ধের মুখে এখনই ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। মন্থরোর মা এই বয়েসে, এই কুয়াশায়, ঝাপসা অন্ধকারে লাঠি ঠুকে ঠুকে চলে যাচ্ছে, কোমর থেকে শরীরটা ভেঙে রাস্তার হাত দুয়েক ওপরে প্রায় রাস্তার সমান্তরালে তার হেঁটে যাওয়া দেখতে দেখতে হঠাৎই মনের মধ্যে কী রকম একটা অস্পষ্ট বিষণ্ণতা টের পেলাম। মন্থরোটা একেবারে অপদার্থ। প্রথম থেকেই হাবা-গোবা তো ছিলই, তার ওপর বয়স হবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে যেন ক্রমশ আরও অপদার্থ হয়ে পড়েছে। মন্থরোর মা'র ছোট ছেলে দুটি বেঁচে থাকলে এই বয়সে তাকে হয়তো এত কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করতে হত না। মারা যাবার সময় ওদের কত আর বয়স। জন্মেছিল এক বছরের ব্যবধানে, মরল একই বছরে। তার মধ্যেই দুজনে নিজেদের সাধ্যমতো পয়সা এনে মাকে দিয়েছে। ফোজোর ছিল বন-জঙ্গল ঘুরে হরেক পাখি ধরে কলকাতায় নিয়ে বিক্রির ব্যবসা। পাখির বাসা থেকেও ছানা বের করে আনত। ঘরে রেখে তারপর খাইয়ে-দাইয়ে একটু বড় করে বিক্রি করে দিত। দু-তিন বছরেই এই কাজে সে দিব্যি হাত পাকিয়ে ফেলেছিল। একবার চৈত্রমাসে আমলকী গাছের কোটরে হাত গলিয়ে সাপের ছোবল খেয়ে গাছ থেকেই মাটিতে পড়ে যায়। মন্থরোর মা-ই প্রথম খবর পেয়ে দৌড়ে এসে ছেলেকে কোলে করে ঘরে নিয়ে যায়। উঠোনে মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে সে নাকি সারাদিন শুধু কেঁদেছে। সে তো তখন জানত না মাস কয়েক পরে তাকে আবার এভাবেই কাঁদতে হবে!

এই মর্মান্তিক ঘটনা আমাকে দেখতে হয়নি, মার চিঠিতে জেনেছিলাম। তখন আমি দিল্লিতে ছিলাম। এরই মাস কয়েক পরে, মনে আছে, ইন্দিরা গান্ধি সেবার প্রধানমন্ত্রী হলেন, আমি বোনের বিয়ের জন্য সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি নিয়ে গ্রামে এসে মন্থরোর মার বাড়ি গিয়ে দেখি সে উঠোনে বসে একমনে বেতের ঝুড়ি বুনছে।

ক'মাস আগে ফোজো মারা গেছে, কী বলা যায় ভেবে না পেয়ে খানিকক্ষণ রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে আমি বললাম, দাদিমা কি আজকাল বেতের কাজও করছ নাকি?

একটু দূরে, কোনাকুনি দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এতক্ষণ দেখতে পায়নি। গলার স্বর শুনে মন্থরোর মা মুখ তুলে আমাকে দেখে বলল, কবে এলে বাবা? ক'দিন আর তোমাদের

বাড়ি যাওয়া হয়নি । ফোজো নেই, পাখির ছানা ধরতে গে’— বলতে বলতে মন্থরোর মা মাথা নামিয়ে আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকা দিল ।

তারপর চোখ মুছে মাত্র মিনিটখানেক পরেই মুখ তুলে আবার হাতের কাজ করতে করতে বলল, দাউদ ফিরবে সাঁঝের বেলা ব্যাঙ নে’ । থলেয় ভরে নে’ আসে । তা ফড়েদের আসবার তো কোনও টাইম নেই । আতেও আসটি পারে, কাল ভোরেও আসটি পারে । থলের মধ্যি গাদাগাদি ব্যাঙ কি অতক্ষণ বাঁচে? ঝুড়ি চাপা দে রাখলি নিশ্চিন্দি । মরা ব্যাঙ ফড়েরা আঙুল দে তুলে হুই বাদায় ফেলে দেবে ।

কথা বলতে বলতে ওরই মধ্যে শক্ত দেখে একটা ঝুড়ি আমার সামনে উপুড় করে দিয়ে বলল, দ্যেঁইড়ে কেন বাবা, বোসো । এর উপরিই বোসো । হ্যাঁ বাবা, বিদেশ-বিভুঁয়ে চাকরি করো, সেখানকার সাহেবরা নাকি ব্যাঙের ঠ্যাং খেতে ভালোবাসে? ফড়েদের মহাজন নাকি বরফ চাপা দে সে-দেশে ওজ এলগাড়িতে ব্যাঙের ঠ্যাং পাঠাচ্ছে?

আমি হুঁ-হাঁ করে উত্তর দিয়ে বললাম, তোমার বড় ছেলে কাজকম্ম কিছু ধরেছে?

— ওই দ্যাখো না, কদমতলায় গামছা পেতে শুয়ে শুয়ে দাঁত খুঁটতিছে ।

সেবার আমি কর্মস্থলে ফিরে যাবার আগেই দাউদ মারা গেল ব্যাঙ ধরতে গিয়ে, সেও সাপের বিষে ।

কলকাতার নাতি মানে ফোজোর ছেলে । ফোজোর অপঘাত মৃত্যুর সময় একেবারে শিশু ছিল । ছেলেটা কিছুদিন আমাদের বাড়িতে মায়ের ফাইফরমাশ খেটেছিল । বাগানের কাজকর্ম করত । আমি দুয়েকবার ছুটিতে এসে ওকে একটু লেখাপড়াও শিখিয়েছিলাম । তারপর সেও একদিন গ্রাম ছেড়ে চলে গেল । এখন নাকি কলকাতায় কোন অফিসের গাড়ি চালায় । শুনেছি বিয়ে-টিয়ে করে সুখেই আছে ।

মন্থরোর মা তার জন্যেই আজ তিতির রাঁধবে ভেবেছিল । ছেলেটা নাকি তিতিরের মাংস খুব ভালোবাসে । নাতি না আসায় পাখিকটা আমাকে গছিয়ে গেল ।

মন্থরোর মা’র জীবন ছেলেবেলা থেকে আমি যতটুকু দেখেছি, মা-বাবার কাছে যতটুকু শুনেছি, তা হল দরিদ্র থেকে আরও দারিদ্র্যের মুখে ধাবমান একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা । এর মধ্যে যা কিনা চরম বিস্ময়ের, প্রায় অবিশ্বাস্য, তা হল তার অদ্ভুত সততা আর আত্মমর্যাদা বোধ । সে তার সংসারের দুমুঠো ভাতের জন্য কী না করে, তারপরও হয়তো উপোস করে, কিন্তু কখনও মুখ ফুটে দুটো পয়সা চাইবে না । কাউকে ঠকানো তার স্বভাবেই নেই, বরং নিজেই ঠকবার জন্য স্বভাবটিকে বাগিয়ে রেখেছে ।

আমার মা মারা যাবার পর মন্তুরোর মা দুধ ডিম নারকেলের দাম নেওয়া ছেড়ে দিল। মনে আছে, বাবা বহু চেষ্টাতেও ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত কিছুটা রেগে গিয়েছিলেন।

— শোনো মন্তুরোর মা, তুমি যখন দাম নেবে না, কাল থেকে আর আমাদের দুধ-ডিমও তুমি দেবে না।

— তা বললি হয়! তোমরা না নিলি, গরিব নোক, না খেতি পে মারা যাব বাবা!

— সে তো তুমি টাকা না নিলেও না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

— টাকা নিই কী করে বাবা! মা-নখ্যি গত মাসে দু'কুড়ি টাকা দেছেলো, বললি, দুখানা কম্বল কিনে নাও মন্তুরোর মা, যা শীত! — তিনি আর নেই, দুধ ডিম নারকেল দে সে টাকা শোধ করতি হবে না?

মা-নখ্যি মানে আমার মা। এই ছিল মন্তুরোর মা।

আমার চোখের সামনে সন্ধ্যা গাঢ় হতে হতে ক্রমশ রাত নামছে। বারান্দায় পায়চারি করতে করতে দেখতে পাচ্ছি লেবু গাছগুলোর মাথায় ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি। মহীবাবুদের বাড়ির পোষা তক্ষকের ডাকও কানে এল। তিতিরগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো, বিশেষ সাড়াশব্দ নেই। ঘর থেকে গোঁপ-ছাঁটা কাঁচি এনে পাখিগুলোর পায়ের সুতলি কাটার চেষ্টা করতেই একসঙ্গে চারটি পাখিই প্রবল ডানা ঝাপটাতে লাগল। বাঁধন কাটাও দেখছি বেশ কঠিন ব্যাপার। যার বাঁধন সে যদি নিজের ভালো না বোঝে তাহলে ভারি মুশকিল।

রিটায়ার করে আমার এই জন্মগাঁয়ে এসে যখন পাকাপাকিভাবে থাকব, তখন পুরো দক্ষিণ জুড়ে একটা পক্ষীরালয় করলে কেমন হয়? এখনই যা গাছ আছে তার সঙ্গে আরও কিছু গাছ লাগালে বাড়িতে বসেই চমৎকার একটা অরণ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। পাখির ডাকে রোজ ঘুম ভাঙবে, চেনা শিস শুনে দিন শুরু হবে, ভাবলে এই বয়েসেও আমার আনন্দ হয়। সত্যিকারের পাখির ডাকের চেয়ে ভালো ওয়েক-আপ কল আর আছে নাকি?

শনিবার ঘুম ভেঙেই মনে পড়ল, আজ রাজধানী এক্সপ্রেস ধরতে হবে। সোমবার থেকে আবার অফিস।

সকালে দিঘিতে স্নান করতে গেলাম। আসলে দিঘিটা দেখতেও ইচ্ছে হল। দিঘিতে যাবার পথে কিছুটা ঘুরে মন্তুরোর মার বাড়ি গেলাম। মন্তুরোর মা বাড়ি নেই। উঠোনেও নেই, ঘরেও নেই।

ফিরে আসতে আসতে ঝোপঝাড়ের এদিকে-ওদিকে তাকালাম, যদি কোথাও উবু হয়ে বসে শাকপাতা কাটে কী আর কিছু করে। চোখে পড়ল না।

আরও খানিক এগোতেই দেখা হল মন্থরোর সঙ্গে । কোত্থেকে ফিরছে । মাথায় কাপড়ের টুপি, হাতে একটা গাছের ডাল— লাঠির মতো ধরে আছে ।

আমাকে দেখেই বলল, ফিরি যাচ্ছ খোকা?

— মন্থরোর মাকে দেখলাম না —

— তার কি কাজের কামাই আছে? তার বসি থাকলি চলে?

আমি একটু বিরক্তি চাপবার চেষ্টা করে বললাম, তা বুড়ো মাকে এবার ছুটি দিয়ে নিজে কিছু করলেও তো পারো?

— আমি ফকির হয়িছি । বলে মন্থরো দাঁত বের করে একগাল হেসে হাত বাড়াল — একটা সিগ্রেট দাও দিকি খোকা ।

— চান করতে যাচ্ছি, সিগারেট কোথায় পাব? একটু বিরক্ত হয়েই বললাম ।

— তা'লি দশ নয়া দে যাও ।

মন্থরোর বয়েস এখন কত হবে? ঠিক ঠিক হিসেব করা আমার পক্ষে মুশকিল । আমার থেকে বোধহয় দশ-পনেরো বছরের বড়ই হবে । ছিল নিষ্কর্মা, হল ফকির!

দিঘিটা বছর-বছর ছোট হয়ে আসছে । জলও আগের মতো তেমন টলটলে নেই । তার ওপর কার্তিক-শেষের ঠান্ডা । তাছাড়া আমার সময়ও সংক্ষেপ । ১টা ২৩-এর বারুইপুর লোকালে না গেলে হাওড়া থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস ধরা কঠিন ।

স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম বারুইপুর লোকাল প্ল্যাটফর্ম বদলে শিয়ালদামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । ফাঁকা ট্রেন । জানলার ধারে বসে আরাম করে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছি, কানে এল — দুটো পয়সা দে যাও বাবা । আল্লা তোমার ভালো করবে, গরিবকে দুটো পয়সা দে যাও বাবা —

জানলা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে তাকিয়ে দেখি, মন্থরোর মা কোমর থেকে প্ল্যাটফর্মের সমান্তরালে ঝুঁকে লাঠিতে ভর দিয়ে কোনওক্রমে তার সাদা মাথা তুলে আশপাশের লোকেদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে ।

এক দম্পতি বোধহয় তাদের ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, ভদ্রলোকটি ভুরু কুঁচকে মন্থরোর মার বাড়ানো হাতে ছোট কোনও একটি মুদ্রা ফেলে দিল । মন্থরোর মা হাতের লাঠিটা গলা আর কাঁধের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে খুব যত্ন করে পয়সাটা আঁচলে বাঁধল ।

তারপর লাঠি ঠুকে ঠুকে আরেক দলের কাছে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল — দুটো পয়সা দে যাও বাবা —

ঢং ঢং করে ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বাজল ।

আমি পার্স থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে মন্থরোর মাকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেলাম । মন্থরোর মা যাদের কাছে ভিক্ষে চাইছিল সেখানে কিছু না পেয়ে পাশের লোকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি ডাকলাম — দাদিমা! এই নাও— এদিকে, এই যে, ট্রেনের জানলায় —

মন্থরোর মা মাথা এদিকে ওদিক ঘুরিয়েই আমাকে দেখতে পেল । অথবা আমার গলা শুনে আন্দাজে তাকাল ।

— এস তাড়াতাড়ি । ট্রেন ছেড়ে দেবে ।

মন্থরোর মা লাঠি ঠুকে এগিয়ে এল— খোকা! কবে এলি বাবা?

পাঁচ-ছদিন আগেই দেখা হয়েছে । এর মধ্যেই ভুলে গেল?

এলাম কী গো, যাচ্ছি । দিল্লি যাচ্ছি । তুমি তিতির দিয়ে এলে মনে নেই?

— তিতির ভালো নেগেছে তো খোকা? বর্ষায় এয়ো, কাছিমের ডিম দেব । ভাদ্দর অব্দি থাকলি তালের আঁটির ফোঁপরা দেব ।

শেষবার ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল । ঘণ্টাধ্বনির মধ্যেই আমি একটু চেঁচিয়ে বললাম, গোটাকতক গন্ধলেবুর গাছ রেখো আমার জন্য, এবার এসে লাগাব ।

বলে আমি নোট-সুদ্ধু হাতটা জানলা দিয়ে বাড়িয়ে দিলাম ।

মন্থরোর মা নোটটা দেখে নিমেষের জন্য থমকে গেল, আমি জানলার বাইরে আরও ঝুঁকে টাকাটা তার হাতে গুঁজে দিলাম— ধরো, ধরো ।

মন্থরোর মা টাকাটা নিয়ে আমার দিকে মুখ তুলে (ট্রেন ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে, আমি পিছনদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম) অদ্ভুত এক হাসিতে সারা মুখ ঢেকে ফেলেছে ।

হাসির মধ্যে একসঙ্গে মানুষের মুখে কতরকম ভাব ফোটে, কত পরস্পর-বিরোধী ভাবও নিমেষে আনাগোনা করে, মন্থরোর মার হাসিটি না দেখলে আমার জানা হত না ।

প্রথম প্রকাশ : শারদীয় আজকাল, ১৩৯৬

# ভাঙন

দুর্গাপদ হাত বাড়িয়ে মায়ের ফটো ছুঁয়ে, হাতটা নিজের কপালে ঠেকাল। তারপর বউয়ের ফটো ছুঁয়ে হাতটা ঠোঁটের কাছে এনে চুমুর মতো একটা শব্দ করল। তারপর ফোম লেদারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই একেবারে সুষমার মুখোমুখি। দুর্গাপদ একনজর দেখেই বুঝে গেছে তাকে ধরবে বলেই সুষমা আগে থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

সুষমা যেন সবে রান্নাঘর থেকে বেরিয়েছে, শব্দ করে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বলল, দাদা কি তবে একেবারে মামলা মিটিয়ে ফিরবেন?

মামলার কথা কে বলতে পারে! বলে সে পকেট থেকে চাবি বের করল।

দুর্গাপদ তার এই ভাইয়ের বউটিকে বিশেষ পছন্দ করে না। আজ কী মতলবে কে জানে!

সে নিচু হয়ে নিজের দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে কান খাড়া করে অপেক্ষা করছে, সুষমা বলল, দিদির সেলাইকলটা ক'দিনের জন্য আমাকে দিয়ে যাবেন?

দুর্গাপদ পিঠ টান করে ফট করে বলে দিল, ও মেশিন তো কবে থেকে ছুঁচ ভেঙে পড়ে আছে।

—তাই বুঝি! ইস, অত ভালো মেশিনটা!

—তা আর কী করা যাবে! হরি উঠেছে? একবার ডাকো দেখি।

বলে দুর্গাপদ নিজেই হরিপদর ঘরের দিকে এগিয়ে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ল, হরি, এই হরি। আর কত ঘুমোবি রে! ওঠ, ওঠ, উঠে পড়! উঠলি?

হরিপদ ধুতিতে গিঁট দিতে দিতে বাইরে এসে দাঁড়াল, তার দুচোখ এখনও কোঁচকান। ওইভাবেই বলল, এখনই চললে?

—সুবলকে রিকশা আনতে পাঠিয়েছি। শোন হরি, ফিরতে আমার ক'দিন দেরি হতে পারে। কোর্ট-কাছারির ব্যাপার। এদিকে একটু নজর রাখিস। দিনকাল তো ভালো না।

—সুবলকেও নিয়ে যাচ্ছ নাকি?

—ওর বড় মামা তো সেই রকমই লিখেছেন । অনেক সময় ছোটদের সাক্ষীতে বেশি কাজ হয় । ওর একটু দেখে-শুনে আসাও হবে ।

হরিপদ রকের ধারে বসে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে বলল, সব ঠিকমতো হয়ে গেলে, ওখানে দুয়েকখানা ঘর যদি পাও, মানে বৌদির অংশটা তো তুমিই পাবে, তাহলে কি ওখানেই থাকবে নাকি তুমি?

—পাওয়া-পাওয়ি অনেক পরের কথা । অতবড় মানি লোকের বাড়ি, আগে তো শ্মশানের কাঠ বেচা বন্ধ হোক— তারপর ধর, এই কোর্টে হারলে আবার হয়তো ওপরের কোর্টে যাবে, ওই বাড়ির ছেলে হলে হবে কী, শুনি তো একেবারে চণ্ডাল!

—না, ধরো, তোমার শালারা ছোট ভাইয়ের হাত থেকে বাড়িটা উদ্ধার করল, তখন তো তার ও-বাড়িতে বসে রাত-বিরেতে আর কাঠ বেচা চলবে না, তখন বাড়ি নিশ্চয়ই ভাগ হবে— ভাগ হলে এক ভাগ তো বৌদিরই প্রাপ্য—

—বুদ্ধিটা তোর বরাবর মোটাই রয়ে গেল । পৈতৃক ভিটে ছেড়ে আমি যাব বিদেশে! শ্রীরামপুর আমাদের কাছে বিদেশ ছাড়া আর কী!

হরিপদ গেঞ্জি আনতে ঘরে ঢুকেছিল, বাইরে এসে গেঞ্জিতে মাথা গলিয়ে বলল, বৌদির ভাগটা তাহলে ছেড়ে দেবে?

বাইরে রিকশার শব্দ । দুর্গাপদ উঠোনে নামতে নামতে বলল, সম্পত্তি-টম্পত্তি বাজে কথা । আমাকে যেতে হচ্ছে শ্বশুরমশায়ের বাড়ি রাহুমুক্ত করতে । যতদিন বেঁচেছিলেন, লোকের প্রণাম কুড়িয়েছেন । সেই লোকের বাড়ির এই অবস্থা! অরূপদা তো লিখেছে, এবার একটা ডিসিশান হবার নাকি খুব সম্ভাবনা । চলি রে ।

## ২

মেঘলা আকাশেও এক ধরনের মৃদু আভা আছে । তাতেই গঙ্গায় বাড়িটার ঘোলাটে ছায়া পড়েছে । দুর্গাপদ হাতের সিগারেট জলে ছুড়ে দিয়ে বলল, বৃষ্টি হলে কিন্তু এ-ছায়া আর দেখা যাবে না ।

সুবল এতক্ষণ গঙ্গার জলে মামাবাড়ির আবছা ছায়ার দিকে চেয়ে ছিল, বাবার চোখ এড়ায়নি । নৌকো চড়া তার জীবনে এই প্রথম । এতদিন সে শুধু বাবার ছেলেবেলায় ভোররাতে চুঁচুড়ো থেকে শ্রীরামপুর নৌকোযাত্রার গল্প শুনেছে, আজকাল যখন হাওড়া

থেকে আধ ঘণ্টায় ইলেক্ট্রিক ট্রেনে শ্রীরামপুর যাওয়া যায় তখন আচমকা নৌকো চড়ার সুযোগ পেয়ে তার প্রায় রোমাঞ্চ লাগছে। ভাগ্যিস, বালিতে ট্রেন বিগড়েছিল!

বাবার চেষ্টা ছিল, বালি থেকে বাস ধরবে। বাসে অস্বাভাবিক ভিড়, একটার পর একটা বাস ছেড়ে দিয়েও সুবিধে করা যাচ্ছে না। বাবা হঠাৎ বললেন, চ' সুবল, আমরা নৌকোয় যাই। না হয় সন্ধেই হবে, তাই বলে এই গা-বমি করা ভিড়ে যাওয়া যায় না। তাছাড়া তোরও একটা অভিজ্ঞতা হবে। জলের ওপর ভাসতে ভাসতে যাওয়া— তার স্বাদই আলাদা। চিরকাল তো মাটির ওপর দিয়েই যাওয়া-আসা করলি!

সুবলের একটু খটকা ছিল, বলল, গঙ্গায় নৌকো ডুবে যাবে না তো?

—তোর জলে ডোবার ফাঁড়া ছিল, কেটে গেছে। ভয় কী!

দিনের আভা মুছে গিয়ে চারদিক ক্রমশ খয়েরি হয়ে আসছে। সজল, মলিন আকাশ। ঘোলাটে জল ছুঁয়ে সব সময় একটা শিরশিরে হাওয়া বইছে। সুবল দু-হাতের বেড়ে দু-হাঁটু জাপটে গুটিসুটি মেরে বসে গঙ্গার ডানদিকে বারাকপুর, বাঁদিকে শ্রীরামপুর দেখছিল। বাঁদিকে কিছু দূরে, জলের ওপর মামাবাড়ির ময়লা ছায়া তিরতির করছে।

একটু পরে মামার বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সুবল নৌকো থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে বাড়িটা দেখে অবাক— এই বাড়িতে নাকি মানুষ থাকে! এ তো একেবারে গল্পের বইয়ের পোড়োবাড়ি!

সুবল মুখ ফিরিয়ে এনে দেখল, বাবার চোখে ঘোর। বলল, আচ্ছা বাবা, তুমি ছোটবেলায় এখানে এদের সঙ্গে থাকতে কেন?

দুর্গাপদ দু-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে যেন প্রশ্নটা বোঝবার চেষ্টা করল। তারপর মৃদু হেসে বলল, তোর ঠাকুরদা একটু নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কারণে-অকারণে বড্ড প্রহার করতেন। মারের ভয়ে আমি প্রায়ই চুঁচুড়োয় আমার মামার বাড়ি পালিয়ে আসতাম। তাঁদের সঙ্গে আবার তোর দাদুর কীরকম জানাশোনা ছিল। একদিন তোর দাদু আমার মার খাওয়ার কথা শুনে বাবাকে চিঠি লিখে আমাকে নিজের কাছে এনে রাখলেন। খুব যত্ন করে পড়াতেন। ছেলেবেলাটা এই শ্রীরামপুরের বাড়িতেই কেটে গেল। তোর মা তখন ছ-সাত বছরের।

কথা বলতে বলতে দুর্গাপদ তার শৈশবের শ্রীরামপুরে ঢুকে পড়েছে— একটু আগে কালীবাবুর ঘাট দেখলি না? এখন তো গঙ্গাও শীর্ণ, ঘাটও ভাঙা। ছোটবেলায় ওই ঘাটে দাঁড়িয়ে ওপারে বারাকপুর দেখতাম— ঘরবাড়ি, গাছপালা এই এতটুকু-টুকু। লোকজনকে দেখাত ঠিক যেন গালিভার্স ট্র্যাভেলস-এর ছোট্ট ছোট্ট মানুষের মতো। বিজয়া দশমীর দিন

বেলা থাকতে থাকতে আমরা চট বিছিয়ে কালীবাবুর ঘাটের সিঁড়িতে জায়গা দখল করতাম — সন্ধে হলেই ঝাঁক ঝাঁক জোড়া-নৌকোয় আলো-ঝলমল দুর্গাঠাকুরে গঙ্গা একেবারে ভরে যেত। ঘাটের পাশেই শ্মশান। শ্রীরামপুরে ওই একটা আমার ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল— মড়া পোড়ানোর গন্ধ জীবনে আর ভুলতে পারলাম না।

দুর্গাপদ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল— তোর চণ্ডালমামা শুনি এখন এই শ্মশানে মড়া পোড়াবার কাঠ সাপ্লাই করে। তোর দাদু ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। সেই মানুষের বাড়িতে যখন-তখন শ্মশানযাত্রীরা দরজার কড়া নেড়ে হাঁক দেয়— ভটচাজমশাই, দু-মণ কাঠ দাও গো! এরকম দেখতে হবে ভাবিনি!

সুবল হাঁটুতে থুতনি রেখে বাবার কথা শুনছিল। মুখ না তুলেই সে কী ভেবে বলল, শোনা কথা আর ঘটনা সব সময় এক হয় না।

—তুই কী বলছিস, কী! মামারা সবাই মিথ্যে বলছে?

—তা বলছি না। ভুলও তো হতে পারে। আর এক ভাই-ই শুধু কালো, আর ন-ভাইয়ের আটজনই একদম ধবধবে সাদা ঠিক বিশ্বাস হয় না।

বলতে বলতে সুবল হঠাৎ চাপা রাগে ঝেঁঝে উঠল— চণ্ডাল কখনও ছোটদের পেট ভরে জিলিপি খাওয়ায়? ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দিয়ে দেয়? ছোটবেলায় একবার জামাইষষ্ঠীতে বড় মামি পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল, বাড়িতে রান্না হল না, তখন ছোট মামা আমাকে দাশুবাবুর দোকানে নিয়ে গিয়ে একঝুড়ি জিলিপি খাইয়েছিল। পৌষ সংক্রান্তির আগে কতবার আমার সুতোয় মাঞ্জা দিয়ে দিয়েছে। সবুজ বোতল যোগাড় করে কাচ গুঁড়িয়ে দিয়েছে, শিরীষের আঠা কেনবার পয়সা দিয়েছে— ছোট মামা আমাকে খুবই ভালোবাসত। মা যদি এখন বেঁচে থাকত, মা ঠিক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছোট মামাকে ভালো করে দিতে পারত। মা বেঁচে থাকলে ছোট মামা কক্ষনো খারাপ হতে পারত না। মাকে প্রণাম করবার সময় ছোট মামা কতক্ষণ মা'র পা ছুঁয়ে থাকত তুমি তো দেখোনি।

ছইয়ের আড়ালে মাঝি গুড়ুক গুড়ুক শব্দে হুকো টানছে। দুর্গাপদ অনেকক্ষণ কথা না বলে ওই শব্দ শুনতে লাগল। তারপর একটু ঝিমনো গলায় বলল, তোর মা পুণ্যাত্মা মানুষ, তাকে এসব দেখতে হল না।

দুর্গাপদ গঙ্গার হাওয়া বাঁচিয়ে সস্তার সিগারেট ধরাল। একটু দামি সিগারেটের প্যাকেটটা বেশ খানিকটা খরচ হয়ে গেছে, সেটা আলাদা করে সরিয়ে রাখল। শ্বশুরবাড়িতে তো আর খুব সস্তার সিগারেট বার করা চলে না। ধীরে-সুস্থে ধোঁয়া ছেড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোকে যদি সাক্ষী-টাক্ষী দিতে হয়, ছোট মামার স্নেহ-

প্রেমের কথা যেন বলতে যাস না। যখনকার কথা বললি, তখনও ওর চাকরি ছিল। আপিসে টাকা-পয়সার গোলমাল করে চাকরিটা গেল, তারপর থেকেই আপিসের মামলার ভয়ে বছর দুয়েক কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াল। ফিরল যখন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তোরা তখন খুবই ছোট। এসব তোদের জানার কথাও না। ও যে এতদূর নামবে, কেউ ভাবেনি।

সুবলের এমনিতেই শীত-শীত করছিল। এবার দুই হাঁটুতে কপাল রেখে চোখ-মুখ সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলল।

ব্যাপারটা দুর্গাপদর চোখে এড়ায়নি। সে কৈফিয়ত দেবার মতো করে বলল, তোর অন্য মামারা তো ওকে বাড়িছাড়া করতে চায়নি। তারাই বরং যে যার সুবিধে মতো আলাদা আলাদা বাড়ি করে উঠে গেছে। তাদের ইচ্ছে ছিল বাড়িটাকে একটা অবৈতনিক স্কুল-টুল করে দেবে। তা ছোটটা তখন কষ্টে পড়েছে, ও আর কোথায় যাবে! ঠিক হল, যদ্দিন কিছু সুবিধে করতে না পারে এখানেই থাকুক। একা মানুষ, বিয়ে-থা করেনি। তাছাড়া বাড়িটাও একটু দেখাশোনা হবে। তা দেখাশোনা তো দূরের কথা। নৌকো থেকেও যতটুকু দেখলি, ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কী? তাও না হয় বোঝা গেল, তাই বলে বাড়ির মধ্যে চিতাকাষ্ঠের গুদাম! শুনি তো গোড়ায় গোড়ায় দরজা-জানলার কাঠও নাকি খুলে খুলে বেচেছে।

## ৩

ভদ্রেশ্বরে অরূপকুমার ভট্টাচার্যের প্রকাণ্ড বাড়িতে সুন্দরীদের মেলা বসেছে। অরূপকুমার বড় ভাই, তাঁর অনূঢ়া তিন কন্যা তো আছেই, বিবাহিতা দুজনও এসেছে। একজন শান্তিনিকেতন, একজন সাতনা থেকে। জয়পুর থেকে মেজো ভাই স্বরূপকুমারের দুই কন্যা তাদের বাবার সঙ্গে চলে এসেছে। সেজো ভাই অভিরূপ থাকে কল্যাণীতে, তার কোনও সন্তান নেই, সে সস্ত্রীক এসেছে। ন-ভাইয়ের বাড়ি কলকাতায়, এখন আপিসের ট্যুরে বাইরে, খুব শিগগিরই ফেরার সম্ভাবনা নেই, তার স্ত্রী ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে ছেলে আর ননদকে নিয়ে এসেছে। গুয়াহাটি থেকে এসেছে সস্ত্রীক রাঙাভাই। তার পরের ভাই অশোককুমার এসেছে রাউরকেল্লা থেকে। ভটচাজ পরিবারের সব মেয়ে-বউদের মধ্যে কেবল এরই স্ত্রী ততটা চোখে পড়ার মতো সুন্দরী নয়। অন্য তিন ভাই থাকে কাছাকাছি, একজন বৈদ্যবাটি, একজন রিষড়ায়, আরেকজন হরিপালে। তাদের বউয়েরা সকালে স্বামীদের অফিসের ভাত দিয়ে সোজা বড় ভাশুরের বাড়ি চলে এসেছে। স্বামীরা যে যার অফিস ফেরত এসে যাবে। এই তিন বউ মাঝে মাঝে পরস্পরকে পোস্টকার্ড লিখে

শেওড়াফুলির উদয়নে বা শ্রীরামপুরের মানসীতে মিলিত হয়ে একসঙ্গে ম্যাটিনি দেখে সন্ধের আগে যে যার বাড়ি ফিরে যায় ।

কাল থেকে প্রায় সারাদিনই চা হচ্ছে । একেক দল এসে পৌঁছচ্ছে আর নতুন করে চায়ের জল চড়ছে । অরূপকুমার বিলিতি কোম্পানির টি-টেস্টার । বাড়িতে অঢেল চায়ের স্যাম্পেল । ভাইয়েরাও কেউ চানাচুর, কেউ মিষ্টি, কেউ পেস্ট্রি এনেছে । মেজো ভাই এনেছে জয়পুরের পাঁপড় । সাত ভাইয়ের জন্য সাত কেজি ছাড়াও বাড়তি তিন কেজি । অতএব চায়ের সঙ্গে খাবারও অফুরান । রাতে মাংস হবে, রান্নাঘরে শিবের মা দুপুর থেকে বাটনা বাটছে ।

বাড়িময় মজলিশী আবহাওয়া । কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে জোর আড্ডা চলছে । ভাইয়েরা রাজনীতি, আপিস, আপিসের রাজনীতি নিয়ে তর্ক জুড়েছে । বউয়েদের মধ্যে শাড়ি, গয়না, স্বচ্ছলতা, সন্তানের প্রতিভা, যে যেখানে থাকে সেখানকার গুণাগুণ, লোডশেডিং কম না বেশি ইত্যাদি নিয়ে সূক্ষ্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমশ রূপটান, কেশচর্চা, ত্বকপরিচর্যার ভালো-মন্দে এসে দিব্যি জমে উঠেছে । কম-বয়েসীরা নিজেদের মধ্যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বিনিময় ও হৈ হুল্লোড় নিয়ে মেতে আছে ।

অরূপকুমার অবেলায় আহার সেরে একটু বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলেন, এখন রাঙাভাইয়ের বউয়ের হাত থেকে চা নিয়ে ভাইদের মধ্যে এসে তার নিজস্ব আরামকেদারায় আধশোয়া হয়ে বললেন, দুর্গা এখনও এসে পৌঁছল না, ভাববার কথা ।

মেজ স্বরূপকুমার দাদাকে আসতে দেখেই সদ্য-ধরানো সিগারেটটা অ্যাশ-ট্রের ওপর নামিয়ে রেখেছিল । সেদিকে একবারও না তাকিয়ে দাদাকে বলল, তুমি কি চিঠি দিয়েছিলে, না টেলিগ্রাম করেছ?

টেলিগ্রামও করেছি, আবার চিঠিও দিয়েছি । এ তো বেশ মুশকিল হল । সাড়ে সাতটায় উকিল এসে যাবে । দুর্গাকে খানিকটা রিহার্স করা দরকার ।

আরেকটু দেখা যাক ।

বলে স্বরূপকুমার দাদার সামনেই অ্যাশ-ট্রে থেকে সিগারেটটা তুলে বেরিয়ে গেল ।

অন্যান্য ভাইয়েরা সকলে সকলের সামনে সিগারেট খায় । এমনকি পরস্পরের কাছ থেকে চেয়েও নেয় । কিন্তু বড়দার ঠিক সামনে কেউ সিগারেট খায় না ।

স্বরূপকুমার দাদার চেয়ে আট বছরের ছোট । দাদার পর তিন বোন । তিনজনের কেউই বেঁচে নেই । দুজন জামাইবাবু আসলে দুই ভাই । তাঁরা ওপার বাংলার বাসিন্দা ।

অনেক কাল আগেই তাঁরাস্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিয়েছেন— তাঁদের স্ত্রীদের পৈতৃক বাড়িতে তাঁদের কোনও রকম দাবি নেই। শ্যালকদের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগাযোগও আর নেই।

বাইরের গেটে রিকশার শব্দ শোনা গেল। অরূপকুমার ভাইদের দিকে তাকিয়ে বললেন, দ্যাখ তো, দুর্গা কিনা।

দুর্গাপদ নয়, ঘরে ঢুকল অতুল, যে বৈদ্যবাটিতে থাকে। সোজা অফিস থেকে চলে এসেছে। সকলের ওপর এক পলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, বাব্বা, এ যে একেবারে ফ্যামিলি রি-ইউনিয়ন!

অশোককুমার বাঁ হাতের তালুতে বাঁ কান চেপে ডান হাতের তালু মুখের পাশে এনে বাড়ির ভেতরের দিকে হাঁক পড়ল অতুল এসেছে! চা—

অরূপকুমার সোজা হয়ে বসে অতুলকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি পাঁচটা আঠারোয় এলি?

—চারটে একচল্লিশের ট্রেন ছাড়ল পাঁচটা পঁচিশে। দুপুরে মাঝে কোথাও ট্রেন আটকে ছিল। তারপর থেকে সব ট্রেনই কিছু না কিছু লেট। দুর্গাদাকে দেখছি না!

—বড়দা সেটা নিয়েই ভাবছে। ন-ভাইয়ের উত্তর।

দুই বউ দুটো প্লেট ভরে মোচার চপ নিয়ে এসেছে। পিছনে নতুন ভাইয়ের বউয়ের হাতে মাস্টার্ড সসের শিশি। আর এক কাপ চা। কাপ-শিশি টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, বড়দি বললেন— অশোকদা তো মাংস খান না, রাতে কী খাবেন?

অরূপকুমার যদিও মুখে এক ধরনের হাসি ফোটালেন, কিন্তু মনে মনে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত হয়ে বললেন, বউমা আজ কি আমার শ্রাদ্ধের ভোজ? খাওয়া নিয়ে অত কী ভাবছ তোমরা?

অশোক চট করে বলল, রাতে আমার একটু দুধ-মুড়ি হলেই চলবে। বড়বৌদিকে বল, কাল ভালোয়-ভালোয় কোর্ট থেকে ফিরে গঙ্গার ইলিশ দিয়ে ভুরিভোজ করব।

স্বরূপকুমার ফুঁ দিয়ে দিয়ে গরম মোচার চপ খাচ্ছিল, ওই অবস্থায়ই বলল, কাল কি তুই বাড়ি উদ্ধার করে ফিরবি নাকি? কাল আমাদের উকিল দুর্গাদা আর দুর্গাদার ছেলেকে সাক্ষী হাজির করবে। তারপর আমাদের সকলকে হাজিরা দিতে হবে। তবে, তেইশ তারিখের মধ্যে ফয়সালা না হলে মুশকিল। টুয়েন্টি ফিফথ আমাকে জয়পুরে ফিরতেই হবে।

অরূপ এবারও গেটে রিকশার শব্দ শুনে অপেক্ষা করছিলেন, না দুর্গা না, ন্যাপা অর্থাৎ অনুপ এল, দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বললেন, এসব ঝামেলা হতই না, বাবা কী বুদ্ধিতে যে ওরকম একটা উইল করতে গেলেন— না হলে কে এসব মামলা-মোকদ্দমায় যেত- মাড়োয়ারি-টাড়োয়ারি দেখে বাড়িটা বেচে দিলেই ল্যাটা চুকে যেত, দেখতাম তখন বাড়ি কেমন আগলে রাখে। শ্মশানের কাঠ বেচাও বন্ধ হত। আসলে বাবার মাথায় কে ঢুকিয়েছিল, বাড়ির কোনও অংশ বিক্রি করার অধিকার দিলে ছেলেরা যে যার অংশ বেচে আলাদা হয়ে যাবে।

আমার মনে হয় বড়দা, অনুপ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, দুর্গাজামাইবাবুকে একবার ও বাড়িতে পাঠালে হয় না? শেষবারের মতো একবার বোঝাবার চেষ্টা করা যেত।

অরূপকুমারের অধৈর্য ও উদ্বেগ বাড়ছিল। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, তোরা কি আবার গোড়া থেকে শুরু করতে চাস নাকি? ওসব ছাড়। শোন, উকিল বলছিল— আমাদের একটা উইক পয়েন্ট আছে। অনল দাবি করছে আমরা সব ভায়েরা স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে এসেছি। ও বলছে— নিজেদের সুবিধের কথা ভেবে, নিজেদের স্বার্থে আমরা ও-বাড়ি ছেড়েছি। আমরা ফিরে গেলে ও কোনও আপত্তি করবে না বা বাধা দেবে না। বাড়ি তো আর বিক্রি করা যাবে না! তাহলে ওকে উচ্ছেদ করা যাবে কোন আইনে? ও বলছে, ও তো ও বাড়ির ভাড়াটে নয়?

ফিরে যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

ও বাড়িতে কে গিয়ে থাকবে?

স্বরূপ ও অভিরূপ কিছুটা উত্তেজিত হয়ে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যটি বলল।

অশোক বলল, থাকা না থাকার কথা না, বাবার স্মৃতি হিসেবে বাড়িটাতে ভালো কিছু হোক— শুধু এইটুকু চাইছি। আইনের চোখে এটা কোনও ন্যায্য দাবি নয়?

অরূপকুমার ডানহাত বাড়িয়ে দিলেন, যেন সকলকে একটা পথ দেখাবেন। বললেন, উকিলের কাছে এটা শোনা থেকে আমি এই পয়েন্টটা নিয়ে ভেবেছি। আমি যে-বছর ও-বাড়ি ছেড়ে আসি—

কথার মাঝখানে ছোটরা এসে হঠাৎ টিভি খুলে দেওয়ায় অরূপকুমার বিরক্ত হয়ে তাদের ধমকে ওঠেন— আঃ। বন্ধ কর তো!

অরূপকুমারের ছোট মেয়ে নিজেরই বাড়িতে অন্যদের সামনে হঠাৎ বাবার ধমক খেয়ে রীতিমতো আহত ও অপমানিত বোধ করল। সে-ই সকলকে টিভি দেখতে নিয়ে এসেছে

। সে খানিকটা জেদীভাবে বলল, আমরা এখন খেলা দেখব!

—এখান থেকে নিয়ে গিয়ে যত খুশি খেলা দ্যাখ!

—এত বড় টিভি কে বয়ে নিয়ে যাবে! তাছাড়া এ ঘরে সকলে মিলে দেখবার সুবিধে। স্বরূপকুমারের বড় মেয়ে বলল, তোমরা কথা বল না, আমরা সাউন্ড কমিয়ে খেলা দেখব।

বলে সে টিভি প্রায় নিঃশব্দ করে দিল।

বড়দের সিরিয়াস কথার মধ্যে ছোটদের উপস্থিতি নিয়ে স্বরূপ কিছু বলতে যাচ্ছিল, অরূপ তাকে হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে আগের কথার জের ধরলেন— আমি যে বছর চলে এলাম, আমাদের বলতে হবে, সে বছর আমি ওখানে থাকতে থাকতেই অনল আমাদের তাড়াবার ষড়যন্ত্র করে। রীতিমতো অত্যাচার শুরু করে। আমি ওর অত্যাচারের একটা নমুনা ভেবেছি। আমরা বলব, একদিন রাতে আমরা যখন ঘুমোচ্ছি, অনল আমাদের পায়খানার ময়লা-ভরা গামলাটা আমাদের রান্নাঘরে টেনে এনে মেঝের ওপর উল্টে দেয়। ওর এইসব অত্যাচার দিনে দিনে বাড়তে থাকে। অসহ্য হওয়ায় আমরা বাধ্য হয়ে একে একে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে আসি।

অভিরূপ বলল, শ্রীরামপুরে কি খাটা পায়খানা আছে?

—তখন ছিল। তাহলে বলি, গত মাসে কোর্ট যখন কমিশন বসায় তখন এটা কমিশনের কাছে রেকর্ড করানো হয়নি। গত হপ্তায় আমাদের উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে কমিশনের উকিলকে আর অনলের উকিলকে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে এই কমপ্লেনটা ইনসার্ট করিয়ে দিয়েছি। অত্যাচারের ঘটনার সাক্ষী হিসেবে দুর্গার ছেলেটার নামও দিয়ে দিয়েছি। আমি বাড়ি ছাড়বার আগে সুবল কিছুদিন তোদের বৌদির কাছে এসে ছিল। ওর তখন আট-ন'বছর বয়েস।

স্বরূপের ছোট মেয়ে নন্দিনীর বয়েস পনেরো। সে মোটেই খেলা দেখছে না, কেউ লক্ষ করেনি। হঠাৎ প্রায় একটা আশ্চর্য সুন্দর সারসের মতো সে বড় জেঠুর কাছে এগিয়ে গিলে বলল, জেঠু, উইল ইউ প্লিজ টেল মি হোয়াই ছোটকা টেক্স অল দা ট্রাবল— তোমরা একবার ভেবে দেখেছ— ছোটকা কেন একটা অ্যাবানডান্ট হাউসে পড়ে থাকে? কেন রাত জেগে বসে বসে বার্নিং ঘাটের লোকদের কাছে কাঠ বিক্রি করে? জাস্ট টু আর্ন হিজ ব্রেড! ইজ নট ইট?

ঘরসুদ্ধ বড়রা বোবা। দু-এক মুহূর্ত কেউ কিছু বলে উঠতে পারল না। সেই সুযোগে নন্দিনী আবার বলল, অল অব ইউ আর হিজ এল্ডার ব্রাদার্স। হি ইজ দ্য ইয়াংগেস্ট অব অল। ওকে তোমরা তাহলে কেন প্রত্যেকে ফিফটি রুপিজ পার মানথ দাও না? ইভন

হোয়াই নট হান্ড্রেড রুপিজ ইচ? দেখবে ছোটকা তখন তোমাদের কত ভালোবাসবে। বাড়িতেও আর ওই সব খারাপ কাজ করবে না। আমি বলছি— দেখো—

অরূপকুমারের হতভম্ব ভাব পুরো কেটে গেছে, তিনি বোধহয় রাগে ফেটে পড়তে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই গেটে উকিলবাবুর মরিস মাইনরের আওয়াজে তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে কেবল বাড়ির ভেতরের উদ্দেশে একটি হাঁক ছাড়লেন— মেজবউমা!

মেজবউ পাশের ঘরে বোধহয় খুব হাসি-ঠাট্টার মধ্যে ছিলেন, মুখের হাসি প্রাণপণে মুছতে মুছতে তিনি দৌড়ে এলেন।

অরূপ নন্দিনীর দিকে আঙুল তুলে খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, একে নিয়ে যাও।

উকিলবাবু ঘরে ঢুকতেই অরূপকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন, আসুন। বসুন।

উকিলবাবু একবার সকলের মুখে চোখ বুলিয়ে সোফায় বসতে বসতে বললেন, এঁদের মধ্যে কোনজন আপনার ব্রাদার-ইন-ল?

অরূপকুমার বললেন, ট্রেনের গোলমালে দুর্গার একটু দেরি হচ্ছে, এবার এসে যাবে। এদের আমি আপনার সেই পয়েন্টটা বোঝাচ্ছিলাম। এরা সব আমার ভাই।

## ৪

গঙ্গায়, গঙ্গার ঘাটে দুই পারে পুরোপুরি সন্ধে নেমেছে। আকাশে তারা নেই।

সুবল হাঁটুতে মুখগুঁজে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটানা মেঘলা সন্ধ্যার মধ্যে নিমাইতীর্থ ঘাট ঝাঁক ঝাঁক জোনাকির মতো আলোয় সেজে দূর থেকে কাছে এসে আবার পিছনে চলে গেল। সুবল জানতে পারল না।

—নিমাইতীর্থ ঘাটে লোকেরা বাঁক সাজাচ্ছে, তুই তো কিছুই দেখছিস না, এবার সব পায়ে হেঁটে তারকেশ্বর যাবে।

সুবলের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে দুর্গাপদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ রেগে উঠল সুবলের ওপর। না নিজের ওপর কে জানে? বলল, নৌকোয় এত সময় লাগবে আমি জানতাম নাকি? তোর কথা ভেবেই আমি নৌকোয় যাওয়া ঠিক করলাম। কোথায় তর-তর করে এগিয়ে যাবে, তা না, যেন গরুর গাড়ি চলেছে! এ গঙ্গা সে গঙ্গাই না! একটা শিক্ষা হল বটে! মাঝি ব্যাটারাও তেমনই! দাঁড় মারছে, না হাতা দিয়ে পায়েস রাঁধছে!

বাবার চড়া গলার কথায় সুবলের তন্দ্রা ভেঙে গেল । সে মাথা তুলে এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে বলল, ভদ্রেশ্বর যেতে আমার ইচ্ছে করছে না ।

—তা বললে হয়? তোর মামারা সব এসেছেন । বড়মামা অত করে লিখেছেন!

—আমাকে ফেরার ট্রেনে তুলে দিয়ে তুমি যাও ।

দুর্গাপদ প্রায় ধমকে ওঠে— তোর হল কী বল তো?

সুবল আবার হাঁটুতে মুখ গুঁজল ।

লোকালয় ছাড়িয়ে নদী এবার একটু চওড়া । বাঁ দিকের তীর ঘেঁসে অন্ধকার গাছপালা । ঘরবাড়ি থাকলেও চোখে পড়ে না । দাঁড়ের শব্দ আর নদীর ছলছলানি ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই ।

দুর্গাপদর সস্তা, দামী-দুরকম সিগারেটই শেষ । এতটা সময় লাগবে সে ভাবেনি । মাঝিদের কাছ থেকে একটা বিড়ি চেয়ে নিলে হয় । হালের মাঝি একটু আগেই বিড়ি খেয়েছে, দুর্গাপদ গন্ধ পেয়েছিল । কিন্তু সুবলের সামনে ঠিক হবে না । সে সামনের মাঝিকে রাগ চেপে নরম গলায় বলল, কী রে, রাত যে কাবার করে ফেললি! আর পনেরো মিনিটে পৌঁছে দে তো দেখি!

নৌকো অনেকটা বাঁ দিকের তীর ঘেঁসে চলেছে । দুর্গাপদর মনে নানা চিন্তা । হরির বউ চাবিঅলা ডেকে ডুপ্লিকেট চাবি বানাচ্ছে না তো? একটু আগে কিছুটা অন্যমনস্কভাবে সামনের অন্ধকার স্রোতে সে একটা জোর পতনের শব্দ শুনেছে, দ্বিতীয়বার একই রকম শব্দ শুনে মাঝিকে জিজ্ঞেস করল, কিসের শব্দ রে?

মাঝি তাল মিলিয়ে দাঁড় বাইতে বাইতে বাইতে বলল, গঙ্গার পাড় ভাঙছে । ভাঙনের শব্দ কখনও শোনেননি নাকি?

দুর্গাপদ এই সামান্য কথায় প্রায় খেঁকিয়ে উঠল— তোকে আর শেখাতে হবে না! জোরে জোরে দাঁড় টান । চ'রে সুবল, এসে গেলাম বলে ।

মাঝিকে বকা সুবলের ভালো লাগেনি । বাবার বিরুদ্ধে তার মনে কী রকম একটা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে । এক ধরনের প্রতিবাদ থেকে সুবল মনে মনে ভাবল নদীর বিষয়ে মাঝি জানে না তো কে জানে!

নৌকো ঝাঁকুনি খাচ্ছে, ডাঙা ছুঁতে আর অল্পই বাকি ।

প্রথম প্রকাশ: শারদীয় যুগান্তর, ১৯৯৩